দক্ষিণ চব্বিশপরগনার

পুরাকথা

কৃষ্ণকালী মণ্ডল

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ২০০২

প্রচ্ছদপট
কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তিস্তা
অঙ্কন : মণি সেন
(শিল্পীর কন্যা শ্রীমতী নীলিমা রায়ের সৌজন্যে)
বিন্যাস : পূর্ণেন্দু রায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. এম. বাগচী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯ গুলু
ওস্তাগর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬ হইতে জয়ন্ত বাগচী কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

বাংলার অগ্রগণ্য বর্ষীয়ান

পুঁথি গবেষক

ও

বিশিষ্ট লোক-সাহিত্যিক

পণ্ডিত অক্ষয়কুমার কয়াল

মহাশয়ের

করকমলে

বিনম্র

শ্রদ্ধার্ঘ্য

গ্রন্থকার

বিষয়-সূচী

বিষয়

উপস্থাপনা

আমাদের দেশে রাজা মহারাজা বাদশাহ আমীর ওমরাহদের উত্থান পতন, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যজয়, ক্ষমতালিপ্সা, নৃশংসতা, বিলাস-ব্যসনই ইতিহাস হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে দীর্ঘদিন। বিংশ শতকের গোড়া থেকেই অবশ্য আস্তে আস্তে অন্য ধারায় মানুষের ইতিহাস তৈরীর প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় প্রধানত ইউরোপীয় রেনেসাঁর ঢেউয়ে উথাল পাতাল এদেশের কিছু শিক্ষিত স্বচ্ছ চিন্তার মানুষের হাত ধরে। অবিভক্ত বাংলার অবহেলিত চব্বিশপরগনার প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হলেন এ-জেলার কৃতি সন্তান কালিদাস দত্ত মহাশয়। তথাকথিত প্রথাগত প্রত্নতাত্ত্বিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও শুধুমাত্র দেশপ্রেম, ঐকান্তিকতা আর নিষ্ঠায় চব্বিশপরগনার প্রত্নচর্চাকে তিনি যে উচ্চতায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন তাতে অবলীলায় তিনি পথিকৃত বলে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণের পর এ-জেলার প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, এমনকি প্রত্নতত্ত্বের আলোকে লোকসংস্কৃতির বিচার বিশ্লেষণ করে নতুন উপকরণ সংযোজনকারী হিসাবে অনেকের মধ্যে কৃষ্ণকালী মণ্ডল আজ একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের তাঁর জন্ম। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই এক অসম সামাজিক পারিবারিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর দৃঢ়চেতা, আপস-বিমুখ পিতার ইস্পাত-কঠিন উচ্চ মানসিকতা এবং স্নেহময়ী, পরদুঃখ কাতর অথচ শৃঙ্খলায় কঠোর মায়ের সমস্ত প্রভাবটুকু আত্মস্থ করেই তিলে তিলে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন। পরিবারকে অসহনীয় দারিদ্রের হাত থেকে যেমন নিষ্কৃতির পথ তৈরি করেছেন তেমনি একই সঙ্গে এ-অঞ্চলের তৎকালীন শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির শোচনীয় অন্ধকার থেকে উদ্ধারের কথা সক্রিয়ভাবে চিন্তা করেছেন। একই সঙ্গে চলেছে লেখাপড়া ও সংস্কৃতি চর্চা। দৃঢ়চেতা, আপসহীন, কর্তব্যপরায়ণ, কঠিন পরিশ্রমী, মানুষটি নিজ কর্মদ্বারা সারাজীবন নিজের গ্রামে পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে একান্ত আপন জনের স্থান পেয়েছেন। আজও তিনি সেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। এই চৌষট্টি বছর বয়সেও তিনি সদা কর্মচঞ্চল; প্রত্ন-ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতি গবেষণায় নিজেকে তিনি সদাব্যস্ত রেখেছেন। প্রগাঢ় দেশপ্রেমে শিকড়ের সন্ধানে নিরন্তন ছুটে চলা এই মানুষটি তাঁর অপরিসীম জ্ঞানস্পৃহা, জানা আর জানানোর অদম্য আগ্রহে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক আর ক্ষেত্রগবেষণা মূলক কাজের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ও পাঠক মহলে এ- -জেলার বিস্মৃত অধ্যায়কে সমুজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর এই কাজের ধারায় যেমন লেখালিখি চালিয়ে যাচ্ছেন তেমনি সেমিনারে, আলোচনায় তিনি তথ্যবহুল এবং মনোজ্ঞ ভাষণে অভ্যস্ত। গত কয়েক দশকে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির উপর নিরন্তর চর্চা ও ব্যাপকভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষায়-নিয়োজিত থাকার ফলে 'দক্ষিণ চব্বিশপরগনা ঃ আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ'', ''দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বিস্মৃত অধ্যায়,'' ''দক্ষিণ চব্বিশপরগনার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তি ভাবনা'' এবং ''দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল'' নামক চারখানি অমূল্য আকর গ্রন্থ ইতিমধ্যেই আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি। স্বীকৃতি স্বরূপ অনেক সংস্থাই তাঁকে সশ্রদ্ধ সম্বর্দ্ধনা ও স্মারকে ভূষিত করেছেন। এঁদের মধ্যে আছে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ্, গড়িয়া, দক্ষিণ চব্বিশপরগনা; কলকাতা টেলিফোন রিক্রিয়েশন ক্লাব, দক্ষিণ শাখা, কলকাতা - ১৯; বঙ্গীয় সংস্কৃতি অন্বেষা পরিষদ্, বেগমপুর, বারুইপুর ইত্যাদি।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনা সংস্কৃতি পরিষদ্ তাঁকে ঋষি বঙ্কিম স্মারকে সম্মানিত করেছেন । ডায়মণ্ডহারবারের শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম তাঁকে 'ভাস্কর ভারতী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। সম্প্রতি তিনি ২০০৩ সালের গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র পুরস্কার ও মেডেলে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর এই সম্মান প্রাপ্তিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি। কামনা করি তিনি সুস্থ শরীরে আরো বহুদিন তাঁর বিরামহীন ক্ষেত্রগবেষণার মাধ্যমে আমাদের এই জেলাকে সুউচ্চ গৌরবে আসীন করুন।

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর সেগুলিকে একত্র করে কয়েকটি সংকলন গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করার তাড়া আসতে থাকে বিভিন্ন মহল থেকে। কিন্তু গত দেড়বছর ধরে বহু কাঠ খড় পুড়িয়েও অমরা লেখককে রাজী করাতে পারিনি; প্রথমত তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবং দ্বিতীয়ত আমাদের অস্থির অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে। অবশেষে আনন্দের কথা এই যে, তাঁর সম্মতিতে প্রথমে এই সংকলনটি দ্রুত প্রকাশের আয়োজন করা গেল। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হওয়ায় সেগুলি সংকলিত করে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। একই তথ্যের অবতারণা কোথাও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে পরিমার্জন ও পরিবর্জন করে সেই ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর যেহেতু এগুলো কোন ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখেনি তাই প্রবন্ধগুলিকে জেলার প্রত্ন ইতিহাসের কয়েকটি চিত্রের সারি হিসাবেই আমরা গুণী পাঠক সমাজ ও ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব অনুরাগীদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছি। আশা করি এই সীমাবদ্ধতাকে তাঁরা সেই চোখেই দেখবেন।

প্রুফদেখা, কপিকরা, ফটোগ্রাফি, মুদ্রণ ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই আমাদের প্রত্ন-ইতিহাস সংস্কৃতিকেন্দ্রের সমস্ত সদস্যের এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। সহযোগিতার জন্য তাঁরা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। পরিশেষে গ্রন্থটি বিশেষজ্ঞ, প্রত্ন-ইতিহাস গবেষক, অনুরাগী পাঠক -পাঠিকার ভাল লাগলে নিজেদের ধন্য মনে করব। সর্বতোভাবে চেষ্টা করেও হয়ত ভুলত্রুটি কিছু রয়ে গেল। সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পাঠক সমাজের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব।

কয়েকটি জরুরী কথা

দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলার সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার সব উপাদান এখনো আমাদের করায়ত্ত হয়নি। এজন্য আরও গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। প্রত্নসম্পদই এখন ইতিহাস রচনার একমাত্র উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে – অন্তত দক্ষিণ চব্বিশপরগনার ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলির 'কাল' বিচার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু 'কাল' বিচারে বেশ কিছু সমস্যা অবশ্যই রয়েছে। এই সমস্যা পুরাবস্তুটি প্রাপ্তির নয় – অবস্থানগত ও পারিপার্শ্বিক সমস্যার দিক অর্থাৎ উৎখনন থেকে পাওয়া কিনা এবং একইসঙ্গে আর কিছু নির্দেশাত্মক সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা জানা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, এ-জেলায় এখনও কোন বৈজ্ঞানিক উৎখনন হয়নি। ফলে সমস্যা রয়েই গেছে। কিন্তু প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শনের আকৃতিগত দিক, অন্যত্র অনুরূপ জিনিসের (উৎখনিত) যুগ বিচারের ফলাফল, স্বাভাবিক উৎপাদন স্থল ও ব্যবহার এবং শিল্পদক্ষতার চূড়ান্ত সীমা জানা থাকলে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে অবশ্যই আসা যায়। পেশাদারী সিদ্ধান্তেও অনেক অনুমান ও সম্ভাবনার সাহায্য নিতে হয়। কাজেই তুলামূলকভাবে ক্ষেত্রগবেষকদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি প্রগাঢ় চর্চা ও ভারসাম্যযুক্ত তুল্যমূল্য বিচারবিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহলে তার ফলাফল পেশাদারদের তুলনায ১০ - ১৫ শতাংশ এদিক ওদিক হতে পারে। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্তেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রত্ন সম্পদের প্রতি একশ্রেণীর পেশাদারী গবেষকের অবজ্ঞা, উপেক্ষা এবং আজন্ম লালিত পণ্ডিতম্মন্যতার অভিমান রয়ে গেছে। যদিও এগুলিকে উপেক্ষা করেই কয়েকজন দেশপ্রেমী ক্ষেত্রানুসন্ধানীকে কাজ করে যেতে হচ্ছে। আর একটি বিপদও আছে। এঁদের মধ্যে ছদ্মবেশী ক্ষেত্রানুসন্ধানী কয়েকজন রয়েছেন, যাঁরা ছদ্মদেশপ্রেমী হিসাবে মুখোশের আড়ালে সংগৃহীত মূল্যবান প্রত্ননিদর্শনগুলির সিংহভাগ পাচার করছেন অর্থের বিনিময়ে। এইভাবে ইতিহাসের সাক্ষ্য মহামূল্যবান উপাদানগুলি চলে যাচ্ছে গভীর অন্ধকার রাজত্বে। এঁরা লোভের ফাঁদে পা দিয়েছেন। ফলে, ইতিহাস উদ্ধারের প্রচেষ্টা ক্রমশ গভীরতর অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। প্রধানত এই সব অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে বলে সত্যিকারের ইতিহাস উদ্ধারের কাজ খুবই শ্লথ গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। আর যেটুকু হচ্ছে তার মূল্যায়ন করার সময় এখনো আসেনি।

একদিকে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার লিখিত সঠিক কোন ইতিহাস যেমন নেই তেমনি সে চর্চার অভাবও যথেষ্টই। কিন্তু ইতিহাসের একটি বিশেষ উপাদান হিসাবে প্রত্ননিদর্শন ও প্রত্নতত্ত্বকে ব্যবহার করা যায় এবং একই সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক ও লোক-সংস্কৃতি নিদর্শনগুলিকেও যদি বিচার বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে কিছু অগ্রগতি আসতে পারে। এই সঙ্গে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমী এবং আত্মত্যাগী কিছু বিশেষজ্ঞ মানুষের এগিয়ে আসা দরকার যাঁরা হবেন নৃ-বিজ্ঞানী, ভূ-বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী, ভূমি, কৃষি ও নদী বিশেষজ্ঞ, ম্যানগ্রোভ ও বনভূমি বিশেষজ্ঞ, প্যালিওগ্রাফিস্ট বা (ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী ও প্রাক্‌বঙ্গ) লিপি-বিশারদ প্রমুখ। আর প্রয়োজন প্রাপ্ত–প্রত্নসামগ্রীগুলির যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সুলভ সুযোগ, বৈজ্ঞানিক উৎখনন এবং তার রিপোর্ট প্রকাশ। এছাড়া যে কাজটি এখনই প্রয়োজন তা হল দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বিভিন্ন প্রত্নসংগ্রহশালায় সংগৃহীত

কয়েকটি প্রস্তর নির্মিত ও কয়েকশত টেরাকোটা সীলে খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার। লিখিত ইতিহাসের মত অনেক ঐতিহাসিক তথ্য তাহলে উদ্ধার করা কিছুটা সম্ভব হবে।

আশার কথা এই যে, স্বর্গত কালিদাস দত্ত থেকে আরম্ভ করে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকদের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধাদি এবং আঞ্চলিক ইতিহাস সমৃদ্ধ পুস্তকগুলি প্রকাশের ফলে জনমানসে, প্রত্নতাত্ত্বিক জগতে ও বিশেষজ্ঞ মহলে এ-জেলা সম্বন্ধে একটি বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। জানা যায় যে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিবিভাগের বিশেষজ্ঞগণ এবং প্রত্নতত্ত্ব শাখার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণ উচ্চতর প্রত্ন-ইতিহাস গবেষণার (ডক্টরেট) জন্য 'দক্ষিণ চব্বিশপরগনাকে' বিষয় হিসাবে গ্রহণ করার জন্য যোগ্য অনেককেই উৎসাহ দিচ্ছেন। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ মহলে এবং সাধারণের মধ্যে একটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঔৎসুক্য এবং সচেতনতার বিকাশ ঘটাকে লক্ষ্য করার মত অগ্রগতি বলে মনে করা যেতে পারে। সংবাদ মাধ্যম এবং প্রচার মাধ্যমগুলি এতদিন এ–জেলাকে অবহেলা করে এলেও তারাই এখন দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রত্নইতিহাস ও প্রত্নসংগ্রহশালাগুলি নিয়ে টেলিভিশনে যেমন প্রতিবেদন সম্প্রচার করছেন তেমনি সংবাদপত্রগুলি ছবিসহ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রতিবেদন উপস্থাপিত করছেন। বর্তমানের প্রচার সর্বস্ব যুগের প্রেক্ষাপটে প্রত্ন-ইতিহাস সচেতনতার এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। সম্প্রতি সোনারপুর কলেজের উদ্যোগে ক্ষেত্রগবেষক এবং বিশেষজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিয়ে সেমিনারের পরে 'চব্বিশ পরগনার স্থানিক ইতিহাস' নামের একটি মূল্যবান স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং একইভাবে প্রাচীন শিল্পসংস্কৃতি, মঠ-মন্দির নিয়ে আরও একটি বই প্রকাশিত হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রচেষ্টায় ২০০২ সালে বেহালার রাজ্য প্রত্নসংগ্রশালার তত্ত্বাবধানে প্রায় একবছর ধরে প্রতিমাসে একজন করে আমন্ত্রিত বক্তার বক্তৃতায় মাধ্যমে 'কালিদাস দত্ত স্মৃতি বক্তৃতামালা' আয়োজিত হয়েছিল। প্রায় সবজেলার প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা তথ্য আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে কাকদ্বীপে অনুষ্ঠিত হল প্রত্ন-ইতিহাস আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রত্নসংগ্রাহক,লেখক ও শিল্পীদের নিয়ে 'দক্ষিণ চব্বিশপরগনা প্রত্ন-ইতিহাস চর্চা সমিতি' নামে একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে। গত বছর তাঁরা দুদিন ব্যাপী (৭– ৮ই ডিসেম্বর, ২০০২) একটি উন্নতমানের প্রত্ন-ইতিহাস সেমিনার করেন সরকারী ও জেলার সদস্যদের সার্বিক সহযোগিতায়। এই সেমিনার, উপলক্ষ্যে দুই চব্বিশপরগনার প্রত্ন-ইতিহাস-সংস্কৃতির বিশিষ্ট গুণীজন কর্তৃক লিখিত মূল্যবান প্রবন্ধ-সমৃদ্ধ একটি স্মবণিকাও প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য তথ্য দপ্তর 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রচুর তথ্য সমৃদ্ধ বৃহদাকৃতির 'দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলা সংখ্যা, ১৪০৬' সার্থকভাবে প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট সবাইয়ের প্রশংসাধন্য হয়েছেন। Anthropology বিভাগ সমীক্ষার ভিত্তিতে বারুইপুর পৌরাঞ্চলের উপর একটি সার্বিক Report ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে। এছাড়াও গত দশ বছরে এজেলার ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদানগুলিতে সমৃদ্ধ হয়ে অনেকগুলি আকরগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জেলার ইতিহাস রচনার সুসংবদ্ধ উপকরণাদি সংগ্রহের জন্য কয়েকটি ইতিহাস সম্মেলনও হয়েছে। এসমস্ত তথ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে উপকরণাদি আহরিত হয়ে জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

কালিদাসবাবুর সংগ্রহের পর অনেকগুলি সংগ্রহশালা দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় গড়ে উঠেছে, কিন্তু প্রত্নবস্তুগুলির উন্নত বিজ্ঞান ভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি রচনার মত অনিসন্ধিৎসু ক্ষেত্রগবেষক বেশী নেই। প্রত্নবস্তুগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণের পাশাপাশিই আসে সেগুলির সঠিক বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ, 'কাল' নির্ণয় এবং তার মাধ্যমেই পুরোনো ধারণার পরিবর্তন করে ইতিহাসের অগ্রগতিকে তরান্বিত করা। মূল্যবান প্রত্নবস্তুগুলির সংরক্ষণ যেমন জরুরী তেমনি নিরপেক্ষবিজ্ঞানমনস্ক ক্ষেত্রানুসন্ধানীদের বিশ্লেষণধর্মী প্রত্ন-ইতিহাসের তথ্য পরিবেশনের কাজটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ফলে পরবর্তীকালের লেখক-গবেষকগণ সেইসব তথ্যের ভিত্তিতে সঠিকভাবে সম্পূর্ণতার দিকে ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। অবশ্য বিজ্ঞান ভিত্তিক উৎখননের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

বর্তমান সংকলন গ্রন্থটিতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা গেল। এগুলি সমস্তই এ-জেলায় প্রাপ্ত তাম্রলিপি, অসংখ্য প্রত্নদ্রব্য, নানান গ্রন্থসূত্র এবং ব্যাপক ক্ষেত্রানুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে লেখা। এই সংকলন এ-জেলার সকলস্থানের পুরাকথার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নির্দেশ করে না। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রত্নতাত্বিক ইতিহাসের একটি খণ্ডিত রেখাচিত্র এর দ্বারা তুলে ধরার চেষ্টা করা গেল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে প্রবন্ধগুলি সংকলনের ফলে একই কথা অনেক প্রবন্ধেই এসেছে। ফলে একসঙ্গে পাঠের সময় এই বিষয়টি ত্রুটি হিসাবে অনেকের কাছে দেখা দিতে পারে। কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন অন্যত্র প্রকাশিত একক স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রবন্ধগুলির সংকলন করতে গেলে এই সীমাবদ্ধতা অনেক সময় এসে যায়। তাছাড়া আরো একটি কথা সবিনয়ে জানাই। বেশীরভাগ প্রবন্ধ যেহেতু দক্ষিণ চব্বিশপরগনার ছোট ছোট পত্রপত্রিকাগুলির দাবী নিয়ে লেখা তাই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধগুলির কোন কোনটি যে আশানুরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করেনি সে বিষয়ে লেখক সজাগ; কিন্তু পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন যে ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার প্রতি দায়বদ্ধতা ও ভালবাসার কথা মনে রেখেই লেখককে একাজ করতে হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও বর্তমান সংকলন গ্রন্থটিকে মননশীল পাঠক সমাজ সহানুভূতি সুলভ ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন বলে আশা করি।

বর্তমান প্রবন্ধ সংকলনটিতে যে কয়েকটি প্রত্নবিবরণ পরিবেশিত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের ভাল লাগবে এবং তাঁদের অনেকের কাজে লাগবে এই আশা নিয়ে আমরা সংকলনটি প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছি।
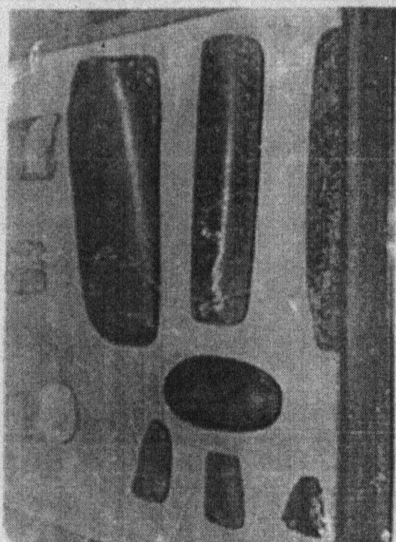
প্রস্তরায়ুধ, কালিদাস দত্ত সংগ্রহ
বেহালা, রাজ্যপ্রত্ন সংগ্রহশালার সৌজন্যে

প্রস্তরায়ুধ, গোবর্দ্ধনপুর
বিমল সাহুর সংগ্রহ, পাথরপ্রতিমা
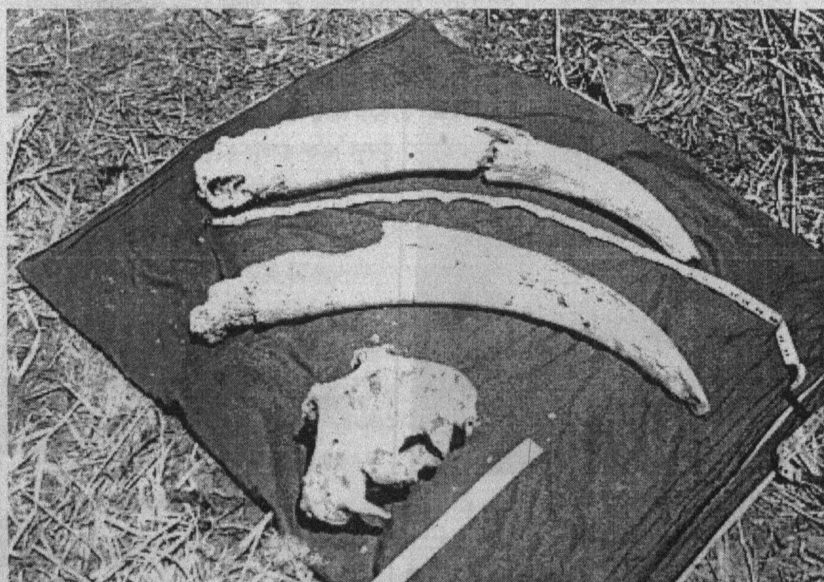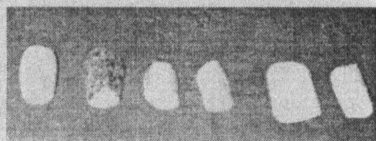
গজমুণ্ডসহ গজদন্ত (অর্দ্ধফসিলীভূত)
গোবর্দ্ধনপুর, পাথরপ্রতিমা, বিমল সাহুর সংগ্রহ
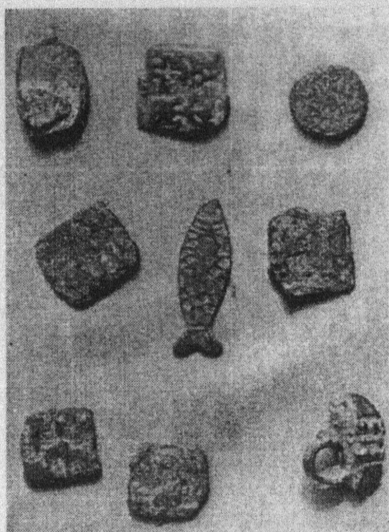
তাম্র ও মিশ্রধাতুর পাঞ্চমার্ক, কাস্ট কয়েন ইত্যাদি, খাড়ি সংগ্রহশালার সৌজন্যে

টেরাকোটা বানরমূর্তি
গোবর্দ্ধনপুর, পাথরপ্রতিমা

টেরাকোটা বুদ্ধ (কার্লিং হেয়ার, সিমেটিক টাইপ) গোবর্দ্ধনপুর, পাথরপ্রতিমা

টেরাকোটা বুদ্ধ (উভয়দিকে কার্লিং হেয়ার)
গোবর্দ্ধনপুর, পাথরপ্রতিমা

স্লেটপাথরের
বিষ্ণু/(গুপ্ত)
গোবর্দ্ধনপুর.

লাল বেলে পাথরের বিষ্ণু/(গুপ্ত)
বাইশহাটা, নির্মলেন্দু মুখার্জীর সৌজন্যে

অপূর্ব ত্রিচূড়যক্ষিণীমূর্তি, গোবর্দ্ধনপুর

ব্রোঞ্জের শিখরমন্দির
বিশালাক্ষীতলা
প্রসাদপুর, সাগর

অরুণসহ সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যমূর্তি, কাশীপুর, দক্ষিণ চব্বিশপরগনা, আশুতোষ মিউজিয়ামের সৌজন্যে
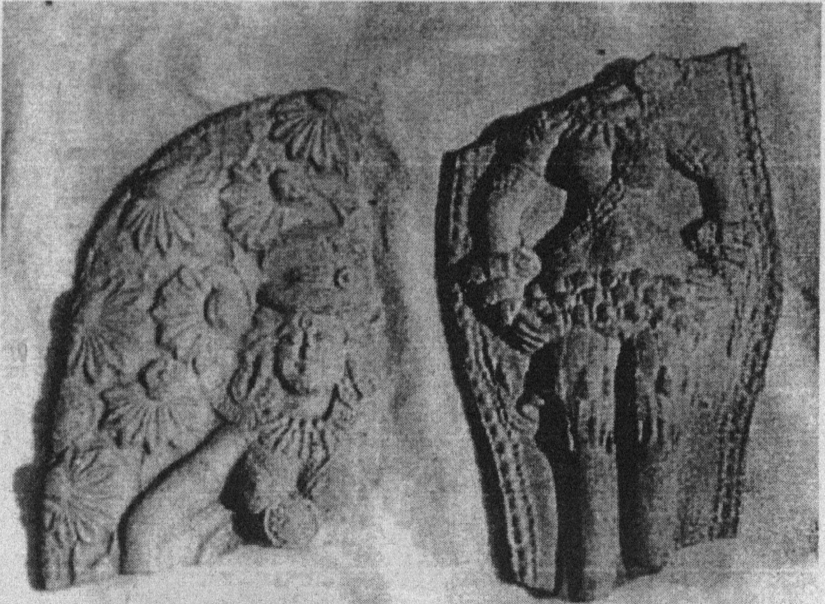
টেরাকোটা, যক্ষিণীমূর্তি, তিলপী, খাড়ি-ছত্রভোগ সংগ্রহশালার সৌজন্যে
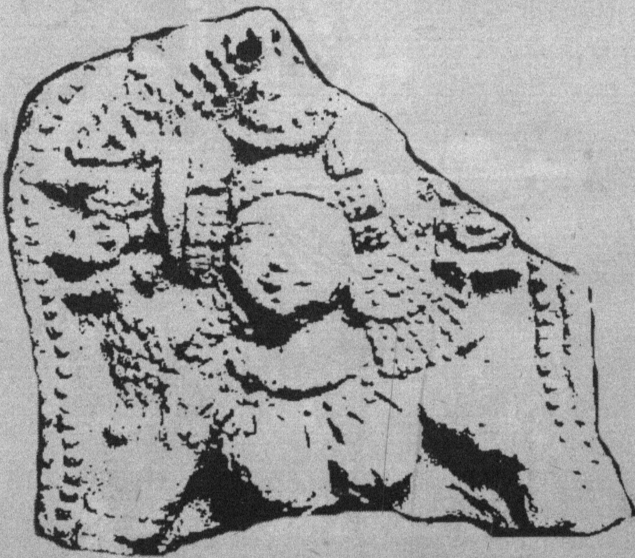
টেরাকোটা দশচূড় যক্ষিণীমূর্তি (শুঙ্গ যুগ)/তিলপী
দেবীশংকর মিদ্যার সৌজন্যে

টেরাকোটা মিথুনমূর্তি (তান্ত্রিক)/কঙ্কনদীঘি
মজিলপুর কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালার সৌজন্যে

চতুর্মুখ শক্তি
শিবলিঙ্গ,
পুরকাইত চক
রায়দীঘি

বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ, আশুরালি
ডায়মণ্ডহারবার

বিষ্ণুমূর্তি, বারুইপুর
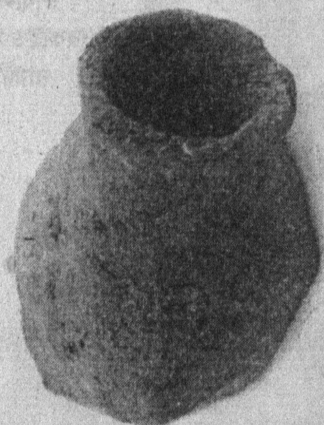
হাতে তৈরী কাঁচামাটি রঙের মৃন্ময়ঘট
বিমল সাহুর সংগ্রহ
গোবর্দ্ধনপুর, পাথরপ্রতিমা

টেরাকোটা বিভিন্নপ্রকার মুণ্ডমূর্তি
কাকদ্বীপ গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্রের সৌজন্যে

প্রায় ফসিলীভূত গবাদিপশুর চর্বনদন্ত, গোবর্ধনপুর
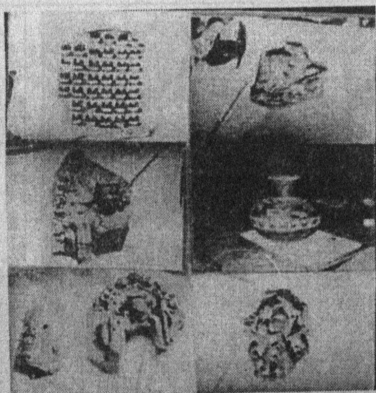
তটেরবাজার ও নিকটস্থ পুষ্করিণী থেকে পাওয়া
পেন্টেড পটারি ও প্রস্তরনির্মিত দেবদেবীর মূর্তি

প্রায় ফসিলীভূত সামুদ্রিক কাঁকড়ার দাড়া, গোবর্ধনপুর

জটারদেউল
সুন্দরবন

হাউড়ি হাটের
জোড়া শিবমন্দির
মন্দিরবাজার

নরহরিপুরের
রেখশীর্ষ
শিবমন্দির
সাগরদ্বীপ

মন্দিরতলার ভগ্নমন্দিরগাত্রে
অপূর্ব মন্দির শিল্প (ইটের গাঁথুনিতে)
সাগরদ্বীপ

বাওয়ালী মণ্ডলবাড়ীর পঞ্চরত্ন মন্দির

জলটুঙ্গি বাওয়ালী মণ্ডলবাড়ী

টেরাকোটা শিল্পসমৃদ্ধ আটচালা দ্বাদশ শিবমন্দিরের একটি, মিত্রগঙ্গা, জয়নগর

কেশবেশ্বর মন্দিরগাত্রে শিল্পকর্ম

মিত্রগঙ্গা জয়নগরের
টেরাকোটা শিল্পসমৃদ্ধ
শিবমন্দির
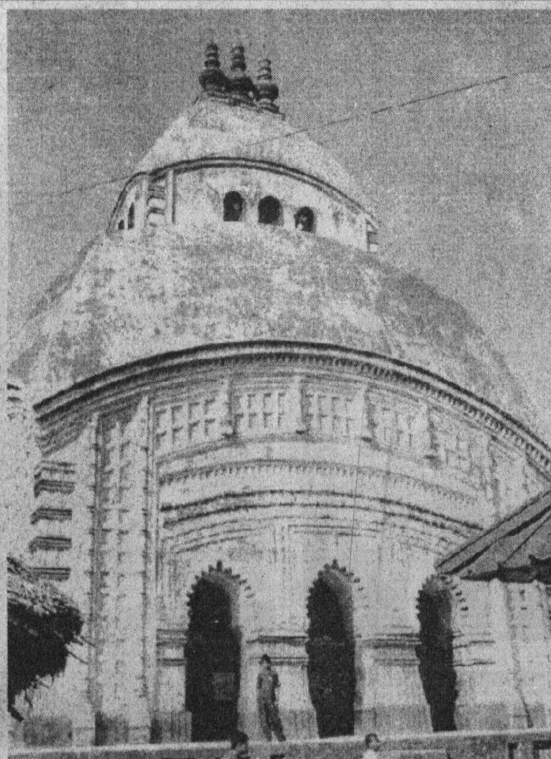
শিল্পসমৃদ্ধ
কেশবেশ্বর
শিবমন্দির
(আটচালা)
মন্দিরবাজার
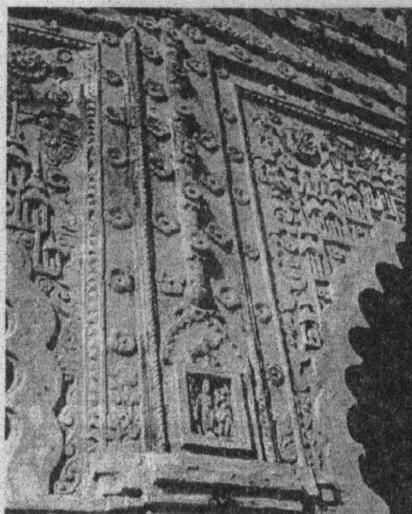
পদ্মপুরের বিশালাক্ষী দেবীর নবরত্নমন্দির, ফলতা

কেশবেশ্বর মন্দিরে টেরাকোটা-দেবমূর্তি ও মন্দিরশিল্প, মন্দিরবাজার
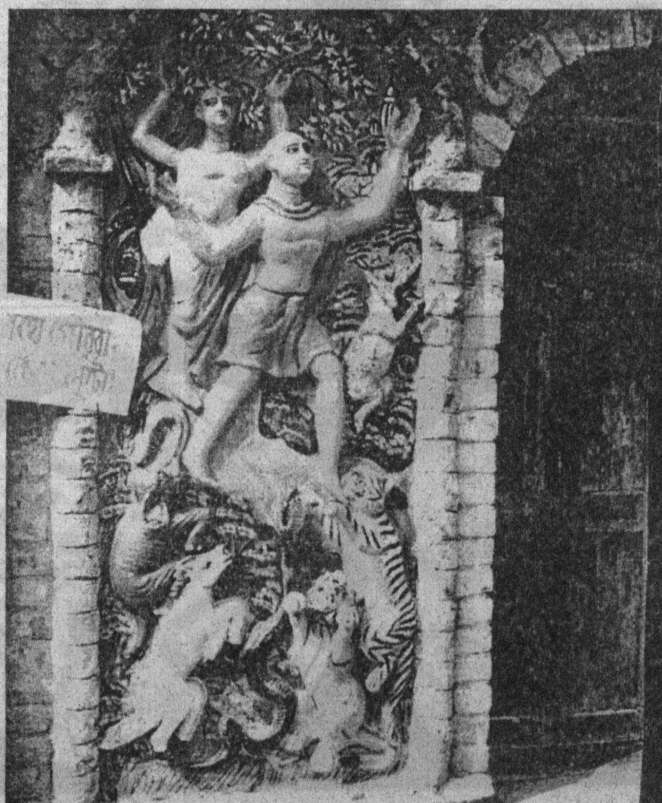
বারুইপুরের মহাপ্রভুতলার নবনির্মিত মহাপ্রভু মন্দিরের মন্দিরশিল্প

১
শশাঙ্কের
রৌপ্যমুদ্রা
২

১
শশাঙ্কের
স্বর্ণমুদ্রা
২

১
সমুদ্রগুপ্তের
স্বর্ণমুদ্রা
২

অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে
উৎসর্গীকৃত
'দক্ষিণবাংলার নতুন প্রত্নস্থল'
গ্রন্থটি তাঁকে প্রদান করছেন
লেখক নিজেই।

টলেমির মানচিত্র

(প্রকাশ ১৪৯০)

DISTRIBUTION OF ARCHAEOLOGICAL
SITES IN COASTAL WEST BENGAL
N
Sites
NOT TO SCALE
HOWRAH
MIDNAPUR
24 PARGANAS
BANGLADESH
TAMLUK
TILDA
DEULPOTA
DAKSHIN
BARASAT

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সপ্তর্ষি মণ্ডল

প্রত্ন-ইতিহাস-সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র

অনিমা ভবন

ধোপাগাছি, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগনা

পিন- ৭৪৩৬১০

দক্ষিণ চব্বিশপরগনা
উঃ
হা ও ড়া
কলিকাতা
ভাঙড়
সোনারপুর
বিষ্ণুপুর
বারুইপুর
ক্যানিং
মগরাহাট
জয়নগর
বাসন্তী
গোসাবা
মন্দিরবাজার
কুলপী
মথুরাপুর
কুলতলী
রায়দীঘি
কাকদ্বীপ
পাথরপ্রতিমা
সাগর
নামখানা
মেদিনীপুর
ব ঙ্গো প সা গ র
রাজর্ষি মণ্ডল
প্রত্ন-ইতিহাস-সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র
অনিমা ভবন
ধোপাগাছি, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগনা
পিন-৭৪৩৬১০

জয়নাগের মলয়া (বপ্যঘোষবাট) তাম্রশাসন

লক্ষ্মণ সেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসন

ডোম্মনপালের রাক্ষসখালি তাম্রশাসন

প্রসঙ্গ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

চব্বিশপরগনা স্থান নাম কথা ঃ

ফারসী 'পরগনা' কথাটি মোগল অমল থেকেই পরিচিতি পেয়ে আসছে। সম্রাট আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডরমলের 'আসলী জমা' (১৫৮২ খৃঃ) এবং আইন-ই-আকবরীতে (১৫৯৬ খৃঃ) 'সরকার সাতগাঁ'র একটি মহল ছিল মেদনমল্ল ("Mednimall" - Hunter) পরগনা এবং আর একটি ছিল হাতিয়াগড় পরগনা। প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালেও (১৫৮৭-১৬১০ খৃঃ) এই নামটি ছিল। দেশাবলী বিবৃতিতে (ষোড়শ শতাব্দী) অবশ্য দেখা যায় যে যাঁদের সাহায্যে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন তাঁদের এক জনকে 'চব্বিশ পরগনার ' শাসনভার দেওয়া হয়েছিল।

চব্বিশপরগনা জেলা ঃ

চব্বিশ পরগনা স্থান নাম থেকে 'চব্বিশ পরগনা জেলা' নামের উৎপত্তিও একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। পলাশী যুদ্ধের পর, ১৭৫৭ সালের ১৫ই জুলাই ইংরেজদের সঙ্গে নবাব মীরজাফরের সন্ধিপত্রের ৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল – "All the land lying to the south of Calcutta, as far as Kulpi shall be under the Zamindary of the English Company, and all the Officers of those parts shall be under their jurisdiction. The revenue to be paid by them (The Company) in the same manner with other Zamindars." সে সময় কুলপী রাজস্ব-থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা; কাকদ্বীপ থানা ও সাগর থানার উৎপত্তি তার অনেক পরে। হাতিয়াগড়, গড় ও দক্ষিণসাগর পরগনা ছিল তৎকালীন কুলপী থানার অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান কুলপী থানার সর্বদক্ষিণাংশ এবং বর্তমান কাকদ্বীপ থানা এলাকায় পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত কালনাগিনী (আদিগঙ্গা) নদীর উত্তরকূল এলাকায় বিস্তৃত ছিল 'হাতিয়াগড়' এবং এটি ছিল প্রাচীন খাড়ি পরগনার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত পরগনা। বর্তমান ঘোড়ামারা ও সাগরদ্বীপ ভূখণ্ডের উত্তরাংশ ছিল 'গড়' পরগনার অর্ন্তগত এবং সাগরদ্বীপের দক্ষিণাংশ 'দক্ষিণ-সাগর' পরগনার অর্ন্তভুক্ত ছিল। ইংরেজদের জমিদারি অধিগ্রহণকালে এসব স্থানে জনবসতি ছিল। ইংরেজ কোম্পানিকে প্রথমে কেবলমাত্র এই জেলার জমিদারি-সত্ত্ব দেওয়া হয়েছিল; অর্থাৎ এই জেলাবাসী কৃষকদের কাছ থেকে কেবলমাত্র খাজনা আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ইংরেজদের সে জন্য নবাবকে বার্ষিক রাজস্ব বা খাজনা দিতে হত 'দু লক্ষ বাইশ হাজার নশ আটান্ন টাকা দশ আনা এক পাই'। তারপর ১৭৫৯ সালের একটি সনদের মাধ্যমে নবাব মীরজাফর লর্ড ক্লাইভকে তৎকালীন চব্বিশ পরগনার সার্বভৌম মালিকানা প্রদান করেন। এভাবে কলকাতা - পরগনা এবং বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার তেইশটি পরগনা নিয়ে তৎকালীন 'চব্বিশ পরগনা জেলা'র পত্তন হয়েছিল। সেজন্য, ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলার গুরুত্ব অপরিসীম। আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাই হল মূল চব্বিশ পরগনা।

তৎকালীন সুন্দরবনের গভীর অরণ্য মূল-চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং নদীবাঁধ সংরক্ষার কোন ব্যবস্থা না রাখায় সদ্যপ্রাপ্ত ইংরেজ জমিদারির অন্তর্গত হাতিয়াগড় পরগনার

দক্ষিণাংশ এবং গড় ও দক্ষিণসাগর পরগনাকে সর্বশেষে গ্রাস করেছিল পূর্বপার্শ্ববর্তী সুন্দরবনের শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্য। উত্তরকালে এই স্থানগুলি 'সুন্দরবন পরগনা'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এখনও সরকারী রেকর্ড ও দলিলপত্রে পরগনার নাম 'সুন্দরবন' লেখা হয়। কিন্তু এছাড়াও জেলার অন্যত্র 'হাতিয়াগড়' ও 'Ghur' (গড়) নামক পরগনার অস্তিত্ব রয়েছে।

কলকাতাসহ দক্ষিণের মোট চব্বিশটি পরগনা নিয়ে প্রথম গঠিত হয়েছিল 'চব্বিশপরগনা জেলা'। সুতরাং কলকাতা সহ দক্ষিণ চব্বিশপরগনার একাংশ ছিল সেই 'মূল চব্বিশপরগনা জেলা'। এই জেলা থেকে উদ্ভূত রাজধানী শহর কলকাতা উত্তরকালে আলাদা জেলার মর্যাদা লাভ করেছে। মূল জেলার চব্বিশটি পরগনা ছিল ঃ আজিমাবাদ, আকবরপুর, আমিরপুর, আমিরাবাদ (মতান্তরে ' উত্তরপরগনা'), বালিয়া, বারিদহাটি, বসনধারী বা বাসুন্দী, কলিকাতা, দক্ষিণসাগর, গড়, হাতিয়াগড়, ইখতিয়ারপুর, খাড়ি, খাসপুর, মাগুরা, মানপুর, ময়দা, মেদনমল্ল, মেলাংমহল বা মঙ্গলমহল (মতান্তরে সতল), মুড়াগাছা, পাইকান, পেঁচাকুলি, শা নগর ও শাহপুর। এই চব্বিশটিপরগনার আয়তন ছিল ৮৮২ বর্গমাইল। ক্রমান্বয়ে এই জেলার আয়তন বাড়তে বাড়তে ৫২৯২.৫ বর্গমাইলে দাঁড়িয়েছে এবং পরগনার সংখ্যা পঁচাত্তর পেরিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু জেলার নাম সেই চব্বিশপরগনাই থেকে গিয়েছিল, 'পঁচাত্তর-পরগনা' হয়নি।

ইংরেজ আমলের রাজস্বজরীপ, জেলাজরীপ ও বিভিন্ন সূত্র থেকে অন্যান্য পরগনাগুলির নাম জানা যায় —আগড়পাড়া, আগড়পাড়া-বালিয়া, আনোয়ারপুর, আড়সা, বাজিৎপুর, বালান্দা, বালিয়া-কাটুলিয়া, বালিয়া-মাইহাটি, বরাহনগর, বুড়ান, চৌরাশী, দাতিয়া, ধরসা, ধুলিয়াগড়, গুণতালকাটি, হালদা, হাভেলিশহর, হাসনাবাদ, হিলকি, হোগলাবাদ, জামিরা, কলারোওয়া, কলারোওয়া-হোসেনপুর, কাটশালি, কাটুলিয়া, কুশদহ, খাসপুর, মহম্মদ আমিরপুর, মাইহাটি, মূলঘর, মুরাগড়, নারায়ণগড়, নূরনগর, পাইঘাটি, পাঁচনুর, পঞ্চান্নগ্রাম, পুরসুলিয়া, পারধুরিয়াপুর, রাজপুর, রামচন্দ্রপুর, সৈয়দপুর, সেলিমবাদ, শায়েস্তানগর, সরফরাজপুর, সরফরাজপুর-আমিরপুর, সতল, সুন্দরবন, উখড়া-চৌরাশী, উখড়া-হাভেলিশহর, উখড়া-কুশদহ ও উত্তর পরগনা। এরপরেও যুক্ত হয়েছে বনগাঁ মহকুমা।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনা ঃ

চব্বিশপরগনা ছিল পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা। প্রশাসনিক কারণে এই জেলাকে দুইভাগে ভাগ করা হয় এবং তার ফলে ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ সরকারী গেজেটের মাধ্যমে উত্তর চব্বিশপরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশপরগনা নামে দুটি আলাদা জেলার সৃষ্টি হয় (The Calcutta Gazette, Extraordinary 18.2.1986 Notification No. 212-1. R/6-M-15--83 -- 17 Feb.,1986.) ।

অবস্থান ঃ

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার অবস্থান হল ঃ ২১° ২৫' – ২২° ৩৮' উত্তর অক্ষাংশ (N-Lat) এবং ৮৭° ৫৭' – ৮৯° ০৯' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে (E-Long) মধ্যে ।

সীমানা ঃ

এই জেলার উত্তরে কলকাতা ও উত্তর চব্বিশপরগনা; পূর্বে উত্তর চব্বিশপরগনার মিনাখাঁ, সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জ থানা এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা অর্থাৎ কালিন্দী, রায়-

— মঙ্গল ও হাঁড়িয়াভাঙা নদী, পশ্চিমে হাওড়ার দক্ষিণাংশ ও মেদিনীপুর অর্থাৎ হুগলী নদীর জলবিভাজিকা; জেলার দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে পৃথিবী বিখ্যাত সুবিশাল ম্যানগ্রোভ বা লবণাম্বু বনভূমি সুন্দরবন — পৃথিবীর নবম বায়োস্ফিয়ার বা জীবপরিমণ্ডল। সর্বদক্ষিণে গঙ্গানদীর মোহনা এবং বঙ্গোপসাগর।

ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা উত্তুঙ্গ হিমালয়ের গোমুখের এক বিশেষ হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার থেকে নির্গত হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সময় স্রোতের আবেগে যে পলল রাশি বয়ে নিয়ে চলেছিল, সাগর সঙ্গমে মেশার আগে নিম্ন অববাহিকায় সেই পলিমাটি স্রোতের তীব্রতার অভাবে নানাস্থানে জমে জমে তৈরী করেছিল ছোট বড় নানা আকৃতির ব-দ্বীপ।

গঙ্গার যে শাখা মূল ভাগীরথী নাম নিয়ে সাগরে পড়েছিল দক্ষিণবঙ্গে গঙ্গার সেই শাখা বিধৌত অঞ্চলই হল বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশপরগনা। মাথার উপর কলকাতা থেকে হুগলী নদীকে পশ্চিম সীমানায় রেখে উত্তর থেকে দক্ষিণে গার্ডেনরীচ, বেহালা, বজবজ, ফলতা, দেউলপোতা, ডায়মণ্ডহারবার, হরিনারায়ণপুর, সাগর, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, জম্বুদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা আর অপরদিকে পূর্বপ্রান্তে বিদ্যাধরীকে রেখে ধাপা-বানতলা, ভাঙড়, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, সাতজেলিয়া, ছোট মোল্লাখালি থেকে পূর্ব-দক্ষিণে রায়মঙ্গল নদী বরাবর সুন্দরবনের নদীনালা, বাদাবন অধ্যুষিত এই বৃহত্তম দ্বীপ অঞ্চলই দক্ষিণ চব্বিশপরগনা। মাঝখানে আদিগঙ্গা-পিয়ালী মাতলার অববাহিকা অঞ্চল।

ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ ঃ

সমুদ্র সান্নিধ্য ও লবণাক্ত জলের জোয়ার ভাঁটা, লবণাক্ত বনভূমি, বাদাবন, ভূমিস্তরে নমনীয়তা, গঙ্গা, ভাগীরথী ও তার শাখানদীগুলি বাহিত নরম বালুকার প্রাচুর্য, স্তরবিন্যাসের উপরিভাগে কাদামাটি ও পীট এই জেলার ভূমিস্তর গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে ব-দ্বীপ অঞ্চলের ভূমি গঠনের সব উপাদানই এখানে বিদ্যমান। জেলার ভূমিস্তরের ভাঙা গড়া এবং নতুন নতুন দ্বীপের আবির্ভাব এবং পুরাতন দ্বীপের ক্রমঃ অবলুপ্তি এখনো সমানভাবে চলছে মোহনা ও সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে।

ভূমির তারতম্য অনুযায়ী ভূ-প্রকৃতিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। দক্ষিণের সমুদ্র সান্নিধ্যের বাদাবন বা বারভাঁটির লবণাক্ত, আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে নিম্ন অংশের বিস্তৃত ভূভাগ বা সুন্দরবন অঞ্চল এবং অপেক্ষাকৃত উত্তরের লবণহীন পলিমাটি অঞ্চল। কৃষি, জীবন জীবিকা, যাতায়াত, আর্থিক অবস্থা এবং উন্নয়ন দুটি অঞ্চলে যে পৃথক তা সহজেই বোঝা যায়। গঙ্গা-ভাগীরথী বাহিত পলল ও মিঠে জল আদিগঙ্গা, বিদ্যাধরী, মাতলা, গুমোর, পিয়ালী ইত্যাদি মিঠে জলের নদীগুলি উত্তরের ধারায় পুষ্ট হয়ে নিম্নাভিমুখী হয়ে কিছুটা পূর্বঢালে প্রবাহিত এবং অনেকগুলি এখনো সজীব। অন্যদিকে সমুদ্রের মোহনা হওয়ায় নিম্নাংশে এই নদীগুলি বা তার থেকে প্রবাহিত জালের আকারের শাখাপ্রশাখাগুলি এবং উত্তরে অবরুদ্ধ দোয়ানিয়া নদীনালা বিধৌত ভূ-ভাগ লবণাক্ত, বালুকাময় এবং সুন্দরবনের বনভূমি ও বাদাবন অঞ্চল। এ অঞ্চলে চাষ বাস খুবই কম এবং বাঁধ দিয়ে নোনা জলকে প্রতিহত করে কোন কোন অঞ্চলে একফসলী ধান চাষ করা হয়। নদীবক্ষে প্রচুর পলি ও বালুকা জমা হওয়ায় নদী খালগুলি বাঁধ দিয়ে তৈরী করা চাষজমির

চেয়ে উঁচু হয়ে যায় বহু ক্ষেত্রেই। নিম্নাংশের অর্থাৎ সুন্দরবনের ১০২টি দ্বীপের ৫৪টি দ্বীপে মনুষ্যবসতি আছে এবং এই দ্বীপগুলির মধ্যে সাগরদ্বীপ বৃহত্তম।

অন্যদিকে জেলার উত্তরের বেহালা, গার্ডেনরীচ, বজবজ, বিষ্ণুপুর, ফলতা, বারুইপুর, সোনারপুর, যাদবপুর, তিলজলা, জয়নগর, ভাঙড় প্রভৃতি অঞ্চলের বৃহদংশেই কৃষিকার্য, শাকসব্জী, ফল ইত্যাদি উৎপাদনে এবং শিল্প, যাতায়াত ইত্যাদিতে অনেকাংশেই উন্নত। ভূ-গঠন জনিত কারণেই এ বি-সম অবস্থা। অবশ্য অন্যান্য কারণও আছে। তবে একটা কথা বলে রাখা দরকার তা হল অনেক ভূ-তাত্ত্বিকের মতে এ জেলার ভূ-নিম্নে প্রাচীন গণ্ডোয়ানা রেঞ্জের ক্ষয়িত প্রস্তরময় কিছু শিরা উপশিরা রয়ে গেছে। টিউবওয়েল এবং O.N.G.C -র তেল অনুসন্ধান কূপ খননের সময় প্রস্তরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আর একটি কথা হল তথাকথিত এই উচ্চভূমি বা উত্তরাংশ সহ কলকাতা এককালে বৃহত্তর সুন্দরবনের অংশ ছিল।

নদনদী ঃ

জেলার দক্ষিণাংশ নদনদীর নিম্নভূমি, জলাশয়, সুন্দরবনের ম্যালগ্রোভ বনভূমি কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত ও লবণাক্ত। বাঁধ দিয়ে একফসলী চাষ, মাছচাষ ও বনসম্পদই প্রধান। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার নদীপ্রবাহের মূল সূত্র হল ভাগীরথী বা হিমালয় আগতা গঙ্গা নদীর বিপুল জলধারা। দক্ষিণ বাংলার সমগ্র অঞ্চলটি বিভিন্ন ছোট বড় নদী বিধৌত অঞ্চলের সমষ্টি মাত্র। এখানকার আরো বিশেষত্ব হচ্ছে এককালে নদীগুলি বহুল পরিমাণে যে পলিমাটি বয়ে নিয়ে এসেছিল সেগুলিই মোহনাতে জমে গিয়ে নদীগুলির গতিপথ রুদ্ধ করে ফেলেছে। হুগলী, দামোদর, আদিগঙ্গা, বিদ্যাধরী, বিদ্যা, মাতলা, বিদ্যাধরীর বিভিন্ন শাখানদী, পিয়ালী, রায়দীঘি, সপ্তমুখী, জগদ্দল, কার্জনক্রীক, মণিনদী, ছাটুয়া, গোসাবা, গুমোর, ঠাকুরাণ, কালনাগিনী, ঘৃতবতী, বারাতলা প্রভৃতি নামের অগুনতি নদী এবং তাদের বহুতর শাখাপ্রশাখা এবং খাড়ি ও সরু সরু সোতাগুলি জালের মত সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশপরগনার দক্ষিণ দিকে এবং নদী সংলগ্ন বাদাবন অঞ্চল প্রবাহিত হয়ে সাগরে পড়ত। ঠিক ঠিক বলতে হলে বলা উচিত যে সাগর মোহনা থেকে এই সমস্ত নদী ও তাদের শাখাপ্রশাখাগুলি বৃহদাকারে ভীষণ স্রোতের তীব্রতায় বাদাবন ভেঙে

বনের গহন অরণ্য ছাড়িয়ে যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। পথ না পেয়ে রুদ্ধ হয়ে গেছে। শুধু কঙ্কালের মত জলাভূমি, মাঠ, ধানক্ষেত, মজা নদীর খাড়ীর ধূ ধূ বালিয়াড়ী, জনবসতিহীন অঞ্চল। সমুদ্রের লোনা জলের জোয়ারে এককালে পুষ্ট হয়ে এরা নদী হয়ে দেখা দেয় আবার ভাঁটায় শীর্ণ নদীরেখা মাত্র হয়ে শুয়ে থাকে কোথাও — আজ প্রায় সবই নীরব। ভৌগোলিক দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে এ অঞ্চলের জনবসতি প্রায়শই নদী তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে গড়ে উঠেছে। উত্তরে কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চল, বেহালা-বড়িশা, সরশুনা, ধাপা, কালিকাপুর, যাদবপুর, গড়িয়া, সোনারপুর, খেয়াদা, আড়াপাঁচ, তাড়দহ, ভাঙড়, চাম্পাহাটি, বাঁশড়া, নারায়ণপুর, তালদি প্রভৃতি সমগ্র অঞ্চলটাই এককালে নদী বাহিত অঞ্চল ছিল। নদী তীরবর্তী অঞ্চল দ্বীপে দ্বীপে এখানে ওখানে কিছু কিছু লোকবসতি ছিল। দক্ষিণ-বঙ্গে সরস্বতী, হুগলী, আদিগঙ্গা, মাতলা, পিয়ালী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি নদী জালের মত তাদের শাখানদীগুলি বাহিত মৃত্তিকারাশি নিজ নিজ প্রবাহপথকে অবরুদ্ধ করে তোলায় পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য

জলাভূমি বা দহ। শিয়ালদহ, তাড়দহ, তুলোরবাদা, গঙ্গার বাদা, ঘোড়দহ প্রভৃতি নামগুলি স্পষ্টতই নদীনালাগুলি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে সৃষ্ট। এই জলাভূমিতে ও দহগুলিতে বর্তমানে কোথাও স্থান নামে বা মাঠের আকৃতি নিয়ে বিদ্যামান। একই সঙ্গে একথা বলাও প্রয়োজন যে অসংখ্য গ্রামের নাম রয়েছে 'গাছি','খালি', 'হাট','পুর', 'নগর' নাম দিয়ে। 'দীঘি' বা 'দীঘির পাড়' নাম নিয়ে বহু গ্রাম-নগর বিদ্যমান। সবই প্রায় নদীতীরবর্তী অঞ্চল। উন্নতগ্রাম, নগর, বন্দর বা শহর, হাট, বাণিজ্য কেন্দ্র।

সুন্দরবন ঃ

ভূ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এককালে কলকাতাসহ নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ স্থলই আদি সুন্দরবন জঙ্গলের অন্তর্গত ছিল। এই অঞ্চলকে যেমন একধারে ভাটির দেশ বলা হয়েছে তেমনি এই অঞ্চলই পৃথিবীর নবম বায়োস্ফিয়ার বলে চিহ্নিত। এখানেই আছে পৃথিবীর বিখ্যাত লবণাক্ত বনভূমি ও জীব পরিমণ্ডল। এই জীব পরিমণ্ডল আজ নানা কারণে ক্ষীয়মান। এর বহু অঞ্চলে মানুষ জীবিকার তাড়নায় প্রতিকূল আচরণ করছে। স্বাধীনতা লাভের পরেও সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডলের উন্নয়নের নামে দেশী বিদেশী নানা টাকার খেলা চললেও স্থানীয় লোকায়ত জীবনের খুব একটা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সুন্দরবনের মানুষের শ্রম আর প্রাকৃতিক সম্পদ ডলারে রূপান্তরিত হয়ে সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য একেবারে তছনছ করে দিচ্ছে।

প্রশাসনিক বিভাগ ও জনসংখ্যা ঃ

বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশপরগনা নিম্নলিখিত পাঁচটি মহকুমা ও তাদের অধীনস্ত ৩২টি থানা নিয়ে গঠিত ঃ

ক) আলিপুর মহকুমা ঃ গার্ডেনরীচ, বেহালা, মেটিয়াবুরুজ, মহেশতলা, নোদাখালি, ঠাকুরপুকুর, বজবজ, বিষ্ণুপুর, যাদবপুর, রিজেন্টপার্ক, কসবা, তিলজলা। মোট ১২টি থানা।

খ) বারুইপুর মহকুমা ঃ বারুইপুর, ভাঙড়, জয়নগর, কুলতলী, সোনারপুর। মোট ৫টি থানা। ভাঙড় থানা ভেঙে আর একটি নতুন থানা হয়েছে।

গ) ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ঃ ডায়মণ্ডহারবার, মগরাহাট, উস্তি, ফলতা, কুলপী, মন্দিরবাজার, রায়দীঘি, মথুরাপুর। মোট ৮টি থানা।

ঘ) কাকদ্বীপ মহকুমা ঃ কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা। মোট ৪টি থানা।

ঙ) ক্যানিং মহকুমা ঃ ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা। মোট ৩টি থানা।

বর্তমানে আরও কয়েকটি থানা ভেঙে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি থানা তৈরী হচ্ছে। বারুইপুরকে জেলা হেড কোয়ার্টারে (সদর) হিসাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

থানা এলাকা ৩২টি হলেও মূল এলাকার বেশ কিছু অংশ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন বা K.M.C. এলাকার মধ্যে অবস্থিত। এই থানাগুলি হল ঃ

গার্ডেনরীচ (জনসংখ্যা ১,৯১,১০৭ জন, ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে), রিজেন্ট পার্ক, যাদবপুর, কসবা ও তিলজলা (বর্তমানে এই থানাগুলি কসবা থানার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাদবপুর থানা হিসাবে K.M.C -র অন্তর্গত। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে জনসংখ্যা ২,৫১,৯৬৮ জন)। অর্থাৎ এই পাঁচটি থানা প্রকৃতপক্ষে কলকাতায় হয়েও এক অদ্ভুত প্রশাসনিক কায়দায়

এখনো দক্ষিণ চব্বিশপরগনার অংশ বলে পরিগণিত হচ্ছে।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় মোট সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের সংখ্যা ৩০টি। জেলার মোট আয়তন ৯,৯৫৯.৯১ বর্গকিমি এবং মোট লোকসংখ্যা ৫৭,১৫,০৩০ জন (১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে); এদের মধ্যে গ্রামে বাস করেন ৪৯,৫৪,৬৫৩ জন। সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে পৌণ্ড্র, বাগদী, রাজবংশী ইত্যাদি তপশিলী জাতির লোকসংখ্যা ১৯,৬৮,৮১৪ জন এবং তপশিলী উপজাতির সংখ্যা ৭০,৪৯৯ জন। এই তপশিলী জাতি উপজাতির লোকসাধারণের বেশীর ভাগই বাস করেন গ্রামে গঞ্জে আর সুন্দরবন এলাকায়। এই জনগণ নানা সংস্কারের বশবর্তী। শিক্ষাহীনতাই এদের সংস্কারাধীন করেছে। এরাই এই অঞ্চলের লোকায়ত জীবনের প্রতীক এবং এখানকার প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক। ২০০১ সালে জনগণনা অনুসারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মোট জনসংখ্যা ৬৯,০৯,০১৫ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ৩৫,৬৪,২৪১ এবং স্ত্রীলোক ৩৩,৪৪,৭৭৪ জন; শিক্ষিতের হার ৭০.১৬ (পুং ৭৯.৮৯, স্ত্রী ৫৯.৭৩) শতাংশ।

জনবসতি ও জনবিন্যাস ঃ

ভূ-প্রকৃতির বিন্যাস বৈচিত্র্যের ফলে জনবিন্যাস ও জনবসতির বৈচিত্র্য ঘটেছে। বিশেষত বর্তমান শিল্পউন্নয়নের যুগে জেলার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশের জনবৈচিত্র্যের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। শহর ঘেঁষা অঞ্চলে শিক্ষা দীক্ষায় অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অগ্রণী। একটিমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তাহল শতকরা হিসাবে শিক্ষিতের হার (শহর অঞ্চল বাদে) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সাগরদ্বীপে সবচেয়ে বেশী। শহরাঞ্চলের সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত ঠাকুরপুকুর, সারা দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় প্রথম। ২০০১ খৃঃ এই হারের পরিবর্তন ঘটেছে দেখা যায়।

কিন্তু জনবিন্যাস ও জনবৈচিত্র্যের বর্তমান ধারায় দক্ষিণ চব্বিশপরগনার আদি জনগোষ্ঠীগুলির পরিচয় পাওয়া যায় না। আদি গোষ্ঠী যুগ পার হয়ে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় সভ্যতার সংমিশ্রণে এবং কপিল পরবর্তীকালে আর্যরক্ত মিশ্রণের ফলে এখানে এক মিশ্রজাতি গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল। রামায়ণ মহাভারতে যাদের ম্লেচ্ছ, অসুর, নাগ, পক্ষী ইত্যাদি বলা হয়েছিল – ভাগীরথীর আবির্ভাবের ফলে তাদের সঙ্গেই সম্প্রীতির সূত্রে একত্রিত হয়ে তাদের বসবাস করতে হয়েছিল এবং আস্তে আস্তে মিশ্রণটা হয়েছিল যুগপোযোগীভাবে। এখান থেকেও আবার নানা বিভাগ উপবিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। মহাভারতে দেখা যায় সমুদ্রতীরবর্তী এ অঞ্চলের ম্লেচ্ছজাতিকে পরাজিত করে ভীম যুধিষ্ঠিরের দরবারে প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকনও নিয়ে গিয়েছিলেন। এঅঞ্চলের নৃপতি পুণ্ড্রবাসুদেব কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। মেগাস্থিনিস, ডিওডোরাস, প্লিনী, টলেমি প্রভৃতি গ্রীক ও রোমান লেখকদের সূত্রে গঙ্গারিডি নামক এক যোদ্ধাজাতির কথা জানা যায়; যারা গঙ্গানদীর মোহনায় বাস করত এবং গঙ্গা অববাহিকার এই অংশে তাদের রাজ্য ছিল, তাদের গঞ্জ-বাজার ছিল 'গঙ্গে' এবং রাজধানীও ছিল 'গঙ্গারাজিয়া'। মৌর্য আমলে দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় যে উন্নতজনপদ ছিল তার প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে আটঘরা, হরিনারায়ণপুর, গোবর্দ্ধনপুর, সাগর, তিলপী ইত্যাদি স্থানে। রঘুবংশেও আমরা সমুদ্রতীরবর্ত্তী বঙ্গের রাজাকে রঘু কর্তৃক উৎখাত এবং পুন স্থাপনের কথা জানতে পারি। অশোকের রাজত্বকাল থেকে শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও সেন আমলের জনপদের প্রচুর প্রত্ন নিদর্শন রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার

বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র থেকে পাওয়া প্রত্ননিদর্শন, অট্টালিকা, দেবদেবীর মূর্তি, ব্যবহৃত হাঁড়িকুড়ি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রত্নবস্তুগুলি থেকে এবং তাম্রলিপি ও প্রাক্‌বঙ্গাক্ষরে লেখা পোড়ামাটির লিপি-সীল গুলি থেকে।

তুর্কী আমল থেকে জনজীবনে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে একটা নিরাপত্তাহীনতার মানসিকতা গড়ে ওঠে। অবশ্য সব রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময় এই অস্থিরতা থাকে। হিন্দুরাজত্বকালে জৈন ও বৌদ্ধধর্মীয় বিপ্লবে লোকায়ত জনসমাজে একপ্রকার মুক্তির উন্মাদনা কাজ করেছিল–পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীতে পরিবর্তন এসেছিল। একইভাবে রাজনৈতিক কারণে তুর্কী আমলে জনবিন্যাসে পরিবর্তন আসে। চৈতন্যদেব সেই পরিবর্তনকে কাটিয়ে উঠতে বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে অন্য একটি সহজতর পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এইভাবে জনবিন্যাসের পরিবর্তন হতে হতে ইংরেজ আমল পর্যন্ত নানা উত্থান পতন ঘটে। প্রতাপাদিত্যের পর সমগ্র সুন্দরবন ও দক্ষিণাঞ্চল পর্তুগীজ, মগ ও আরাকানী জলদস্যুদের (এবং বর্গীর) আক্রমণে, অত্যাচারে, লুটপাটে গ্রাম বাংলার বহুস্থান শ্মশানে পরিণত হয়ে জনবিন্যাসের ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটায়।

মূল বাসিন্দা ঃ

এ জেলার মূল বাসিন্দা পৌণ্ড্র, বাগদি, কাওরা, হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত (মাহিষ্য), রাজবংশী ইত্যাদি। জেলায় পৌন্ড্ররা সংখ্যাগুরু ছিল বহুদিন। বর্তমানে জলে জঙ্গলে ভরা সুন্দরবনের জনবসতি এবং জনবিন্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। সাগরদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, কুলপী ও ডায়মণ্ডহারবারের কোন কোন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মেদিনীপুরের অধিবাসীরা বসবাস আরম্ভ করেছে ইংরেজ আমলের জমিদারী বিলি, লাট পত্তন ও জঙ্গল হাসিলের সঙ্গে সঙ্গে। ঝড়খালি, গোসাবা, বাসন্তি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বসতি তৈরী করেছে পূর্ব বাংলা (বাংলাদেশ) থেকে আগত জনগোষ্ঠী। ইংরেজ আমলে জমিদারগণ তাঁদেরই দেশ থেকে বা সস্তায় দেশী, কঠোরশ্রমে অভ্যস্ত মানুষদের নিয়ে এসেছিলেন জমি আবাদী করতে। আড়কাঠিরাও ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা ইত্যাদি স্থান থেকে সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে এনেছে একই উদ্দেশ্যে – আর পূর্ববঙ্গীয় লোকেরা রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে এবং জীবিকার টানে চলে এসেছে। জঙ্গল কাটা, নাবাল জমি চাষ, মাছধরাকে সম্বল করে বসতির বিস্তার ঘটিয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে মূল অস্ট্রিক, অস্ট্রোলয়েড ও দ্রাবিড়িয়ানরা অতি প্রাচীনকালে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল।

অপরদিকে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর জয়নগর মজিলপুরে, রাজপুরে প্রত্যাপাদিত্যের কর্মচারী ও আত্মিয়জনেরা এ অঞ্চলে চলে এসে তাদের আলাদা সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই সময়ের আশেপাশে বেহালা, বোড়াল, লাঙ্গলবেড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বাইরের জমিদারশ্রেণী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আগমণ ঘটে এবং জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে। ভাঙড়, বারুইপুর, খাড়ি, ডায়মণ্ডহারবার, বজবজ, আলিপুরে ব্যবসাকেন্দ্র ও নগরায়ণ হওয়ার পথে নানা জনসমাবেশ ঘটে – ফলে মূল জন বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও কুটির শিল্প - প্রধান অঞ্চলগুলিতে শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটে। ফলে সামগ্রিকভাবে জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে আজকের পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছায়। সুদূর সুন্দরবন থেকে জেলার

অন্যত্র আর্থ সামাজিক অবস্থার এবং পরিবেশের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষা, যোগাযোগ, পরিবেশ ও পরিকাঠামোর অভাবই এজন্য দায়ী। হাজার হাজার বছরের শোষণও এজন্য দায়ী।

জীবন ও জীবিকা ঃ

জেলার জীবন ও জীবিকার মূল ভিত্তি হল কৃষি। পলিমাটি, দোঁয়াশ ও কোন কোন স্থলে কিছুটা কাদামাটি থাকায় কৃষিতেই নিয়োজিত বেশীরভাগ মানুষ। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান। বিভিন্ন প্রকার কড়াই (ডাল), গম, সরিষা, শাকসব্জী, আলু, কপি বেগুন ইত্যাদি তরিতরকারির প্রচুর চাষ হয়। প্রচুর ফল-ফলাদির চাষ হয় এই জেলায়। পেয়ারা, লিচু, আঁশফল, আম, জাম, কাঁঠাল, সবেদা, জামরুল, খেঁজুর, বাতবীলেবু, আনারস, তাল, প্রভৃতি সব ঋতুর নানা প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। জেলার পেয়ারা এবং লিচু খুবই বিখ্যাত। বারুইপুর অঞ্চল এইসব ফল উৎপাদনের মূলকেন্দ্র বলা যায়। এছাড়া সমগ্র পূর্বভারতে একমাত্র বারুইপুরেই 'লকেট' নামক সুস্বাদু ফলটি পাওয়া যায়। অবশ্য এই 'লকেট ফল' চাষের বাগান কমে এসেছে; হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এই চাষই বিলুপ্ত হবে। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে এক সময় এখানে বিখ্যাত ডালিম বাগান ছিল। আজ আর সেভাবে ডালিম চাষ হয় না – যদিও নিজ নিজ বাড়ীতে খাবার জন্য কিছু কিছু ডালিম চাষ হয়। অর্থকরী তৈলবীজ হিসাবে নারিকেল ও সরিষা চাষ হয়। পান চাষকে প্রধান অর্থকরী ফসল হিসাবে কোন কোন অঞ্চলে চাষ করা হয়। এককালে বারুইপুর ছিল পান চাষের প্রদান কেন্দ্র। এছাড়াও সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল এখন পান চাষের প্রধান কেন্দ্র।

বর্তমানে চাষবাসে আধুনিকীকরণ হয়েছে – সেচের আওতায় এসেছে বহু জমি, পতিত জমি উদ্ধার এবং ভূমিহীন কৃষককে ভূমিবিলির ফলে চাষবাসে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। অনেক জমি দোফসলী হয়েছে। অল্প সময়ের উন্নতজাতের ধানের বীজ, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, হাইব্রীড সব্জী ও অন্যান্য ফল-ফলাদির বীজ ব্যবহার করে চাষ বাসে প্রভূত উন্নতি ঘটানো হয়েছে। ফল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণের ফলেও চাষীরা কিছুটা বেশী দাম পাচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অর্থকরী ফসলের মধ্যে করমচা এবং পেয়ারা এমন কি শশা, আম ইত্যাদি ফলেরও সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে এবং এর উপর নির্ভর করে কিছু কিছু শিল্পও গড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় প্রধান জীবিকা হল মৎস্যচাষ এবং নদী খাড়ী সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে নদীতে বা সাগরে মাছধরা। আগে বাগদি, জেলে কৈবর্ত, তিয়োর, রাজবংশীরাই এ-ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। বর্তমানে মাছচাষ এবং মৎস্যব্যবসায় লাভজনক হওয়ায় সবসম্প্রদায়ের লোকই ব্যবসা হিসাবে একে গণ্য করছে। মাছ ধরার জাল, নৌকা এবং ট্রলার ব্যবসায় মৎস্যজীবীদের অপেক্ষা এদেরই প্রতিপত্তি বেশী। প্রধান প্রধান মৎস্যকেন্দ্রগুলি হল ফলতা, ডায়মণ্ডহারবার, কুলপী, সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, রায়দীঘি, ক্যানিং, কুলতলী, গোসাবা, বাসন্তী, ভাঙড়, ঝানতলা, তিলজলা ও গড়িয়া-সোনারপুরের ভেড়ী অঞ্চল। তাছাড়া জেলার প্রায় সর্বত্রই পুকুর, খানাডোবা থেকে এবং বর্ষায় মাঠ থেকে বেশ কিছু মাছের সরবরাহ পাওয়া যায়।

সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা জঙ্গলের কাঠ ও মধু সংগ্রহ করে; নদীতে মাছ ধরে, চিংড়ীর

পোনা (বাগদা) বা মীন ধ'রে জীবিকা অর্জন করে। একাজ করতে গিয়ে বহু লোক বাঘ ও কুমীরের পেটে যায় বা সাপের কামড়ে মরে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনভূমিতে সুন্দরী, বাইন, পশুর, কেওড়া, গেঁয়ো, ধুন্দুল, কাঁকড়া, হেতাল, গরাণ প্রভৃতি বহু মূল্যবান গাছ জন্মায়। কিন্তু বসতি বিস্তারের ফলে, অবৈধ বৃক্ষছেদনের কারণে এবং চোরাকারবারের ফলে সুন্দরী গাছ প্রায় নিশ্চিহ্ন (অবশ্য প্রাকৃতিক কারণে মিঠাজলের অভাবও একটি কারণ) হয়ে গেছে এবং অন্যান্য বনভূমিও ধ্বংস হচ্ছে। বীজ থেকে এবং কলম চারা করে (বর্ত্তমান লেখক সুন্দরী গাছের কলম-চারার উদ্ভাবক) সুন্দরীগাছ বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। সংরক্ষিত এলাকা এবং ব্যাঘ্রপ্রকল্পাধীন এলাকায় কিছু কিছু বিধি নিষেধ থাকলেও জীবিকার টানে অনেক মানুষকেই এই বনভূমির উপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমানে ভেড়ীতে মাছ চাষ কাঁকড়া ও চিংড়ি চাষ করে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

নানা প্রকার শিল্পে, পরিবহনের কাজে বহুলোক নিযুক্ত। নির্মাণশিল্পে ও ঘরবাড়ী তৈরীর কাজে ইত্যাদি রাজমিস্ত্রী, জোগাড়ে রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য জীবিকায় রয়েছে স্বর্ণকার, কর্মকার, কুমোর চর্মকার ইত্যাদি লোক। হাঁস-মুরগী পালন, গরু মহিষ ছাগল পালন আর একটি সহায়ক জীবিকা এ জেলায়। ছোট বড় নানা শিল্প রয়েছে এ জেলায়। সেখানেও প্রচুর লোক জীবিকার্জন করে। পোল্ট্রীতে মুরগীপালন এখন একটি প্রধান উপজীবিকা। ট্রাকটর চালানো ও ধানভাঙানোতে অনেক লোক নিযুক্ত রয়েছে।

হস্তশিল্প, এমব্রয়ডারী কাজ, মোজা শিল্প, চর্মশিল্প, শোলাশিল্প, পালকের কাজ, ঝাড়ু তৈরী ইত্যাদি কাজে বহুলোক নিযুক্ত। ফল-ফুল বিক্রয়, সব্জী বিক্রয়, ফেরীওয়ালা, চারা গাছ বিক্রয়, চারা পোনা বিক্রয় ইত্যাদি কাজেও বহুলোক নিযুক্ত রয়েছে। বারুইপুর অঞ্চলে রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত সার্জিক্যাল কারখানগুলি। এ-শিল্পে বহু লোক নিযুক্ত থাকলেও শিল্পটির এখন নাভিশ্বাস উঠছে যথাযথ বিপনণের অভাবে। কিছু লোক দোকানদারী ও ডেকরেশনের কাজে নিযুক্ত আছে।

পরিবহন ঃ

সড়কপরিবহনে বাস, ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, লাক্সারীবাস, মিনিবাস, সাইকেল, ভ্যান, রিক্সাই প্রধান। গরুর গাড়ী নেই বললেই চলে। ঘোড়ার গাড়ী উঠে গেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামে গ্রামে রাস্তাঘাট হওয়ায় ভ্যান ও অটো চলছে। শিয়ালদহ থেকে ট্রেন চলছে ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর-কাকদ্বীপ (নামখানা পর্যন্ত শীঘ্রই সম্প্রসারিত হবে) এবং অন্যদিকে শিয়ালদহ থেকে বজবজ ও ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত ট্রেন চলছে। কলকাতা থেকে সরাসরি বাস নামখানা, রাম গঙ্গা, রায়দীঘি, সাগর (৮নং লটে ভ্যাসেল হয়ে), সোনাখালি, ক্যানিং, বিষ্ণুপুর (দক্ষিণ) পর্যন্ত যাচ্ছে। জেলার কোন বায়ুপথ নেই। বেহালার ফ্লাইং ক্লাবও এখন সক্রিয় নেই। সর্বত্রই প্রচুর লরী ও মালবাহী গাড়ী এবং বজবজ-মৌরীগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তৈলবাহী ট্যাঙ্কার ও গ্যাসের লরীগুলি চলে।

শিল্প ঃ

ছোট বড় নানা শিল্প রয়েছে। কাঁচ ও কাঠ শিল্প, চর্মশিল্প, তৈলজাত শিল্প, গেঞ্জী-মোজা শিল্প, সেলাইমেশিন, কালি, সূচীশিল্প, পাখাতৈরী শিল্প, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, লবণ, বিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ শিল্প, হোটেল, পর্যটন, প্রস্তর ও খোদাই শিল্প, ছোবড়া শিল্প, তাঁত শিল্প, ফল ও

মৎস সংরক্ষণ শিল্প, যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, কাঁসা, পাদুকা, পিতল, অলংকার নির্মাণ, দড়ি শিল্প, নৌকাশিল্প ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া মেরামতি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির কাজও এ অঞ্চলে হয়। নৌকা, ট্রলার তৈরী ও মেরামত, জাল ও সূতা তৈরীর সঙ্গে বহুলোক জড়িত। এ জেলায় অনেক শিল্প সম্ভবনা রয়েছে।

ট্যুরিজম ও হোটেল শিল্প আরও অনেক নতুন স্থানে গড়ে উঠছে। সুন্দরবন নতুনভাবে ট্যুরিজম এর আওতায় আসছে। ডায়মণ্ডহারবার, বকখালী, সাগর, গোসাবা, সজনেখালি, কৈখালি অঞ্চলে ট্যুরিস্ট লজ ইত্যাদি আছে।

লৌকিক দেবদেবী মেলা ও পালাগান ঃ

ইতিহাস চর্চায় লোকসংস্কৃতি, ভাষা, পূজাপার্বন, মেলা এবং কবি, পালাকার, তর্জা, পুতুল নাচ, গাজন গান ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত লোকজীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যোগায়। সৌভাগ্যের কথা শত অভাব অভিযোগ অত্যাচারের মধ্যেও দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রবহমান লোকসংস্কৃতি চিত্র একটি উন্নত জীবনাদর্শের পথ দেখায়। গোষ্ঠীজীবন থেকে সভ্যতার উন্নতসীমা পর্যন্ত নানা পার্যায়ে লোকসংস্কৃতিগুলি দেখা যায়। প্রাচীন গোষ্ঠী জীবনের পাথরপূজা, পিতৃপুরুষ পূজা, মুণ্ডপূজা, বীরপূজা, বৃক্ষপূজা, নদীপূজা, নৌকা (জীবিকা) পূজা, অতিপ্রাকৃত পূজা, পশুপূজা, যাদু ও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস - ভূতপ্রেত পূজা, ভীতিজনিত পূজা, মানসিক করা, মানত চোকানো, বৃষ, ঘোড়া, হাঁস, কুকুর, ছাগল, ছোট ছোট পুতুল বা দেবদেবীর ছলন প্রদীপ, ঘটপূজা উপাদান হিসাবে গৃহীত। পদপূজা, বলি প্রদান, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক সবই এক ধারাবাহিক লোকসংস্কৃতি র অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষেএই লোকজীবনের মধ্যে নানা সংস্কার, মানত, পূজা, আচার, উপাচার ইত্যাদি নানা ধর্মীয় অনুষঙ্গ রয়েছে যেগুলো তারা শত কষ্টের মধ্যে আজও প্রবহমান রেখেছে। সেগুলিকেই আমরা লোকায়ত সংস্কৃতি বলতে পারি। সাধারণ কথায় এগুলি লোকাচার। এগুলির প্রায় সবই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ; বিবাহও একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনেও নানা সংস্কার এরা মেনে চলে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এখানকার জনসমাজ যে সমস্ত অসংখ্য আচার আচরণ ও লৌকিক পূজা পার্বণের প্রচলিত ধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে তাই-ই লোকধর্ম। এখানকার তপশিলী ও অনুন্নত জনগোষ্ঠীর যে চিত্র পাওয়া যায় তার সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে আদিবাসী, বুনো, সর্দার, ভূমিজ গোষ্ঠীগুলির কথা যারা বিহার, উত্তরবঙ্গ, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নানা প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল অথবা চুক্তি প্রথায় বা 'বনকাটি', জঙ্গলকাটি-এর সময় একাজে দক্ষ শ্রমিক হিসাবে সর্দারী প্রথায় এই অঞ্চলে এসে তাদের গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বাসভূমি গড়ে তুলে আজও রয়ে গেছে। তাদের সংস্কৃতির কথাও গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাংলার জনজীবনে বহমান হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সংস্কৃতি পুষ্ট লোকায়ত জীবনের সঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতিরও সংমিশ্রণ ঘটে। ফলে এক বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির প্রবাহে এ অঞ্চলের জনজীবন অপ্লুত হয়। তাই এখানে হিন্দু-বৌদ্ধ-

জৈন সংস্কৃতি, তান্ত্রিকতাবাদ এবং আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রবাহিত হয়েছে। এই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হল, তা জাতিজনভিত্তিক নয় – গণ ভিত্তিক। সেখানে ধর্মীয় স্ট্যাম্প মারা কিছু নেই – আছে এক উদার সর্বদর্শী, সবধর্মসমন্বয়ে আপ্লুত মনের মাধুরী দিয়ে গড়া, জীবনের অকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত সর্বজনীন সংস্কৃতি, যা প্রকৃতই একক বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। গ্রামজীবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগে, রোগে, শোকে মহামারীতে দিশেহারা মানুষের মনে আসে অলৌকিকত্বে বিশ্বাসপ্রবণতা। তন্ত্রমন্ত্র বা তার রহস্য জানা, সারল্য ও আনুগত্যের ফলে জীবন ধারণের স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে দৃঢ়ভাবে এগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

লোকায়ত সেই জীবনশিল্পীদের প্রাথমিক স্তরে ভাবনা চিন্তা ছিল গোষ্ঠীগত। গোষ্ঠী ভাবধারায় টোটেমের বা গোষ্ঠী কূলপ্রতীক হিসাবে গাছ পাথর সাপ বাঘ কূর্ম মৎস্য ইত্যাদির চিহ্ন প্রতিফলিত হতে থাকে। গোষ্ঠীগত বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের ব্যক্তি জীবনে প্রভাব ফেলে। এইসব চিন্তাভাবনা কোন কোন সময় সমাজ ও সংস্কৃতির বিশ্বজনীন ভিত্তির রূপরেখা তৈরী করতে পারে। দক্ষিণ বাংলায় নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক ধরনের লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ভিত্তিটা যদিও প্রাচীন হরপ্পা, দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক সভ্যতা অনুসারী এবং মুখ্যত কৃষি ভিত্তিক তবুও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মধ্যে একটি পরিবর্তনশীল ও উন্নততর সংস্কৃতির দিকেই এগিয়ে চলেছে গ্রামীণ পরিবেশে, যুগ যুগ ধরে, বংশ পরম্পরায়।

মাটির ঢিবি, মৃতের সমাধি থেকে এসেছে স্তূপপূজা। বৌদ্ধ সংস্কৃতির এই আঙ্গিকটিকে মুসলমান আমলে পীরগাজী বিবিদের প্রতীক হিসাবে বয়ে আনা হয়েছে। এইভাবে অনেক প্রাচীন আঙ্গিক একইভাবে বা রূপান্তরিত ভাবে এখনো চলে আসছে। পশুপূজা এখন গণেশপূজা, ব্র্যাঘ্রদেবতার মত নানা পূজার দেবতা হিসাবে উপদেবতায় চলে এসেছে। মুণ্ড পূজা আজ রূপান্তরিত বারা পূজায়।

বৃক্ষপূজা এবং বনদেবী পূজা রূপান্তরিত হয়েছে বিশালাক্ষী পূজা, চণ্ডী ও বনপূজা বা বনবিবি পূজায়। ওলাওঠা রোগের দেবী ওলাবিবি, বসন্ত হামের দেবী শিতলা, শিশুরোগে পেঁচো ঠাকুর, চর্মরোগে ঘেঁটু – আরও কত পূজার প্রচলন রয়েছে। বাবাঠাকুর, ধর্মঠাকুর, পঞ্চানন্দ, শিবঠাকুর বৌদ্ধদের ধ্যানধারণার অবশেষ। বর্ষশেষ বা বর্ষারম্ভে কৃষি - শিব পূজা, শিবের গাজন, নীলের বাতি, চড়ক, গাজন, ঝাপ, এগুলি প্রাচীন সূর্যপূজার অবশেষও বটে। কৃষি ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত পশু, পূজা তথা, গোপূজা, ১লা বোশেখের গরু নাওয়ানো এ অঞ্চলের অবশ্য পালনীয় একটি অনুষ্ঠান। ১লা বৈশাখ থেকে তুলসী ও অশ্বত্থগাছে জল দেওয়া, কৃষি, পরিবেশ ও বৃক্ষপূজার বিশেষ উদাহরণ। প্রায় প্রতি মাসে কৃষি সংক্রান্ত লোকদেবতার পূজা আছে। ফসল তোলার পর পৌষ পার্বণ, উৎসব এবং শিকারও গোষ্ঠী জীবনের এবং কৃষিনির্ভর জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব। পৌষ সংক্রান্তিতে বনবিবির পূজা এখনো লোকজীবনকে আলোড়িত করে। ভাদ্র সংক্রান্তিতে মনসাপূজা ও অরন্ধনপূজা লোকায়ত সমাজ আজও আবশ্যিকভাবে পরম শ্রদ্ধায় পালন করে। মিশ্রিত সংস্কৃতির ফলে সাগরদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা (পান বা বরজের) দেবীর পূজার প্রচলন রয়েছে। সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব কিছু পূজা পার্বণ রয়েছে। এছাড়া নানা দেবদেবী পূজায় এবং বিবাহ, অন্নপ্রাশন, ষষ্ঠীপূজা, জন্মকালে এবং মৃতসংস্কারে

নানান লৌকিক আচার এবং অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে।

এইসব লৌকিক দেবদেবী এবং নানান আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত এই জেলার প্রায় অধিকাংশ মেলাপ্রাঙ্গণ। এছাড়া রয়েছে পুতুলনাচ, যাত্রাগান, পালাগান, কবিগান, মনসার গান, তরজা গান এবং সর্বোপরি শিবোৎসব উপলক্ষ্যে গাজন গান। অবশ্য আজকের দিনে গাজন গানের নানান কলা কৌশল ও যন্ত্রাদির প্রয়োগ করে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগানো হয়েছে। ফলে গাজন এখন সব ঋতু উপযোগী একটি বিনোদন মাধ্যমে পরিণত হতে চলেছে।

মেলা ঃ

সারা বছরে জেলার বিভিন্নস্থানে কোন না কোন মেলা লেগেই আছে। এমন গ্রাম বোধ হয় নেই যেখানে বছরের কোন এক বা একাধিকদিনে সার্বজনীন কোন লোকউৎসব হয় না; তা সে শীতলা পূজাই হোক, বিবিমা পূজাই হোক বা শিবোৎসবই হোক। তাই এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সব মেলার কথা বলা সম্ভব নয়। দু'একটির কথা বলি।

সর্বভারতীয় মেলা হিসাবে দেখি বৃহত্তম মেলা গঙ্গাসাগর। পৌষ সংক্রান্তিতে সাগরদ্বীপের কপিলমুনির মন্দির-এ পূজা এবং গঙ্গাস্নান এ মেলার বৈশিষ্ট্য। সারা ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী মানুষের ভীড়ে সরব হয়ে ওঠে। পূজার সামগ্রী, ফলমূল, চিনি বাতাসা, কদমা, নকুলদানা ছাড়াও শঙ্খ ও শঙ্খজাতদ্রব্য, মনিহারী দ্রব্যে ভরে যায়। গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হওয়ার অনুষ্ঠান করা হয় ইত্যাদি। এখন সাগরদ্বীপে যাতায়াতে কোন অসুবিধা নেই।

এর পরই আমরা শিবের গাজন ও মেলার নাম করতে পারি। প্রায় প্রতি গ্রামের শিব মন্দির কেন্দ্রিক এই গাজন, সন্ন্যাসী ও মেলা হয় পাঁচ ছয় দিন ধরে। চৈত্রের শেষ কটা দিনে এই মেলা। প্রধান মেলা ২৭-২৮শে চৈত্র — সন্ন্যাস গ্রহণ ও শিবের মাথায় জল ঢালা এবং ঝাঁপ। শিব মন্দির না থাকলেও অস্থায়ী শিবস্থান তৈরী করে নেওয়া হয়। তারপরের দিন নীলের বাতি এবং শেষ চৈত্রে চড়ক ঝাঁপ। ১লা বৈশাখ আগুন সন্ন্যাস, গোষ্ঠ মেলা। জেলার সব বড় শিবমন্দিরে এই কয় দিন প্রত্যহ প্রচুর ভীড় হয়। অম্বুলিঙ্গ, জয়রামপুর, কেশবেশ্বর, হাউড়িহাট, সীতাকুণ্ড, তাড়দহ প্রভৃতি স্থানে এই মেলা ও ঝাঁপ খুবই প্রসিদ্ধ। জয়রামপুর ও কেশবেশ্বরে অভাবনীয় ভীড় হয়। জেলার একমাত্র বিশাল বাণফোঁড় উৎসবটি হয় বোলসিদ্ধিতে।

গঙ্গাপূজা বেশ বড় ধরনের হয় ফলতা, জামতলা, কুলতলি, সাগর, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি অঞ্চলে। বিবিমা পূজা ও মেলা অনেক স্থলে হয়ে থাকে। মগরাহাট থানার আলিদায় সবচেয়ে বড় বিবিমা মেলা হয়। বনবিবি মেলা সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে হয়ে থাকে। অন্য অঞ্চলেও থানে ছলন দেওয়া এবং পূজা হয়। বৃহত্তম সাতবিবি মেলা ১লা মাঘ সাতবিবিতলা, রাধাবল্লভপুরে (সোনারপুর থানা) অনুষ্ঠিত হয় — ৭ দিন ব্যাপী এই মেলা। কোন কোন বছর ছলন পড়ে ৫০০ এর বেশী। তবে এইথানে বিবিমা ছাড়াও প্রায় ৩৫ শতাংশ শীতলামায়ের ছলন দেওয়া হয়। পীর ও গাজীদের পূজা প্রধানত ১লা মাঘ হয়। খাড়িতে বড়খাঁগাজীর পূজা হয়। খাড়ির নারায়ণীপূজা এবং ছত্রভোগের ত্রিপুরাসুন্দরী পূজা ও মেলা বিখ্যাত। চক্রতীর্থে স্নানের মেলায় প্রচুর লোকসমাগম হয় — মেলাও বসে। বেহালার চণ্ডীপূজা ও মেলা, বারুইপুর এবং অন্যত্র রাসের মেলা (কার্তিক পূর্ণিমায়) এবং আষাঢ়ে রথের মেলায় বারুইপুর, জয়নগর, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর

লোকসমাগম হয়। বিশালাক্ষীপূজা ও মেলা কাকদ্বীপ, বারুইপুর, কাঁটাবেনিয়া, সাগর (ধবলাট), পাথরপ্রতিমা ও জয়নগরের অনেক গ্রামে হয়ে থাকে। পদ্মপুরের বিশালাক্ষী মেলা ও পার্বণ প্রায় পনের দিন ধরে চলে। প্রচুর লোকসমাগম হয়। জেলায় প্রাচীন লোকসংস্কৃতি গবেষক ও পুঁথি সাহিত্যিক নব্বই বৎসরের প্রবীণ অক্ষয়কুমার কয়াল এই মেলা পরিচালনা করেন আজও।

বড় মনসা পূজা ও মেলাটি হয় মনসাদ্বীপ, সাগরে। পাশেই নাগমন্দিরে নাগরাজ (বাসুকী) পূজা ও মেলা কয়েকদনি ধরেই চলে। ধবলাটের বিশালাক্ষী পূজাও খুব প্রাচীন এবং বিখ্যাত।

এছাড়া মাণিকপীর, তাতালগাজী, বামনগাজী, মছানদলীপীর, রাখাল ঠাকুর, কালী, বনচণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা ও মেলা নানা স্থানে হয়ে থাকে। আর একটি বড় মেলা ও পূজা হচ্ছে দক্ষিণ রায় পূজা এবং জাঁতাল উৎসব। প্রধান মেলা ও পূজা হয় বারুইপুরের ধপধপিতে, ১লা মাঘ, রাতে জাঁতাল পূজা। এছাড়া জয়নগর ও ডায়মণ্ডহারবার, মথুরাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দক্ষিণরায়পূজা সাড়ম্বরে হয়ে থাকে। ভাঙড়ে ভাঙড় শাহের মেলায় বেশ লোকসমাগম হয়। আর একটি বড় মেলা হয় মোবারক গাজীর ঘুটিয়ারীশরিফ মেলা। এই মেলা দু'বার হয় – আষাঢ়ে অম্বুবাচীর সময় এবং ১৭ই শ্রাবণ। সর্বধর্মের লোকের প্রচুর সমাবেশ ঘটে। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারও এখানে প্রচুর ভক্ত সমাবেশ হয়।

ফতেয়াদোয়াজ দাহামের দিন মল্লিকপুরের মাজারে (গনিমিয়া) বড় মেলা হয়ে থাকে। বড়দিনে ছোট বড় সব চার্চগুলোর সন্নিকটে বড়দিন মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। বিষ্ণুপুর, মগরাহাট, খাড়ি, বারুইপুর অঞ্চলে বড়দিন মেলা জমজমাট হয়ে ওঠে। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের - দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তিভাবনা গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)।

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান পাওয়া যাবে জেলার সব সংগ্রহশালাগুলিতে। লোক সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে ঠাকুরপুকুর গুরুসদয় মিউজিয়াম অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় এইসব সংগ্রহশালাগুলির অবদান অপরিসীম।
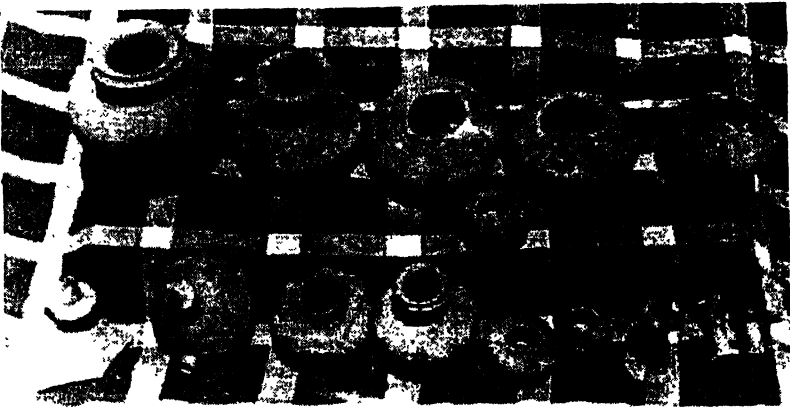
কালো রঙের প্রাচীন পটারী (নলযুক্ত), গোবর্দ্ধনপুর

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার সেকাল

প্রাচীন ইতিহাসঃ

দক্ষিণচব্বিশ পরগনা জেলা গাঙ্গেয় উপকূলবর্তী দক্ষিণবাংলার শেষ সীমায় অবস্থিত একটি প্রাচীন ভূখণ্ড। মূল ভূস্তর-শিলা সমুদ্রস্তরের প্রত্যন্ত গভীরে থাকায় সামগ্রিকভাবে প্রচুর পাললিক মৃত্তিকায় ভূমির উপরিভাগটি গঠিত। সমগ্র ভূ-ভাগ প্রায়শই ভূ-কম্পন ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে ভূনিম্নে নিমজ্জিত হয়। ফলে পুরাপোলীয় বা তৎপরবর্তীকালের জনজীবনের অস্তিত্ব সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক প্রত্নউৎখনন না হওয়ায় মধ্যাশ্মীয়, নবাশ্মীয় তথা প্রাগৈতিহাসিক যুগের জনবসতির ইতিহাস সঠিকভাবে জানতে হলে পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে এই সময়কার ইতিহাস বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। আদিগঙ্গা, হুগলী, সরস্বতী, পিয়ালী ও মাতলা-বিদ্যাধরী নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলির ভূনিম্নে দেখা গেছে বহুপ্রাচীন জনবসতির নিদর্শনাদি রয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রত্নইতিহাসের রূপকার শ্রদ্ধেয় কালিদাস দত্ত (১৮৯৫-১৯৬৮খৃঃ) আজীবন প্রত্ন উদ্ধারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, যার ফলে বর্তমানের দক্ষিণ চব্বিশপরগনার ইতিহাস তৈরীর পথ সুগম হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ ঃ

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বিখ্যাত কয়েকটি প্রত্নস্থলে মধ্যাশ্মীয়, নবাশ্মীয় ও প্রাগৈতিহাসিক কালের কিছু প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া যায়। এই প্রত্নস্থলগুলি জেলার পশ্চিম সীমানায় প্রবাহিত সরস্বতী - হুগলীর বর্তমান প্রবহখাত বরাবর অঞ্চলে ঃ দেউলপোতা (ডায়মণ্ডহারবার থানা), হরিনারায়ণপুর (কুলপী থানা), সাগরদ্বীপ (সাগর থানা)। জেলার মধ্যস্থল দিয়ে প্রবাহিত আদিগঙ্গা তীরবর্তী বোড়াল, দক্ষিণ গোবিন্দপুর (সোনারপুর থানা), মল্লিকপুর - হরিহরপুর, আটঘরা (বারুইপুর থানা) এবং গোবর্দ্ধনপুর (পাথরপ্রতিমা থানা) প্রভৃতি অঞ্চলেও এই সময়কার বেশ কিছু প্রত্ননির্দশন পাওয়া গেছে। দেউলপোতা এবং হরিনারায়ণপুর ও আটঘরা ছাড়া অধিকাংশ প্রত্নস্থলগুলির প্রত্নসম্পদের কথা অনেক বিশেষজ্ঞের কাছেই অজ্ঞাত থেকে গেছে। কিন্তু সার্বিকভাবে মধ্যাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের প্রত্ন নিদর্শনগুলির সংখ্যা কম নয়। কালিদাস দত্ত, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের প্রচেষ্টায় প্রচুর পাথরের ও হাড়ের তৈরী সেযুগের অস্ত্র-শস্ত্র, প্যাস্টেল, হ্যামার, চাঁচক, ছেদক, তূরপুন, ফোঁড়, সেলাইয়ের সুচ, কাজলকাঠি, পোড়ামাটির গহণা, পোড়ামাটির বীড্স্, হাতেটেপা পুতুল, জালের কাঁঠি, পাথরের বীড্স্ ইত্যাদি ঐ সমস্ত প্রত্নস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিশেষ করে কালিদাস দত্ত আবিষ্কৃত শক্ত কালোপাথরের নোড়া, প্যাস্টেল, বীডস্, হাড়ের তৈরী যন্ত্রাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১] 'একদিকে ধারালো' শক্ত পাথরের কয়েকটি কুঠার প্রপ্তি এঞ্চলকে নিঃসন্দেহে মধ্যাশ্মীয় প্রস্তর যুগে পৌঁছে দেয়। শুধু অস্ত্রশস্ত্রই নয় বহুমুখী কজে লাগানো পাথরের যন্ত্রপাতি, সহায়ক যন্ত্রপাতি তৈরীর টুলস হিসাবে ব্যবহৃত জিনিসপত্রও প্রচুর পাওয়া গেছে। হরিনারায়ণপুর

এবং দেউলপোতা থেকে প্রধানত এ জাতীয় প্রস্তরায়ুধ পাওয়া গেছে। এই দুটি স্থান সংলগ্ন নদীর অপর পাড়ে গেঁওখালি, নাটশাল ও অন্যান্য প্রত্নস্থলে অনুরূপ প্রস্তর কুঠার এবং মধ্যাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। হরিনারায়ণপুর ও দেউলপোতা থেকে সংগৃহীত মধ্যাশ্মীয়, নবাশ্মীয় যুগের এ - জাতীয় প্রত্ন নিদর্শনের সংখ্যা কমবেশী ১২০০ (বারোশত)-র মত।[২] বারুইপুর, সোনারপুর এবং সাগরে প্রাপ্ত এজাতীয় প্রস্তরায়ুধের সংখ্যা খুব বেশী নয়। অন্যদিকে সম্প্রতি আবিষ্কৃত পাথরপ্রতিমার গোবর্দ্ধনপুরে পাওয়া প্রস্তরখণ্ড, প্রস্তরায়ুধ, টুলস ইত্যাদির সংখ্যা বেশ কয়েকটি। তাদের মধ্যে আছে হাত কুঠার, বর্শা ফলক, হ্যামার, প্যাস্টেল, চপার, হাতুড়ী, ছেদক, খোদক, বাটালী, চাঁচক ইত্যাদি। এগুলি বিভিন্ন জাতীয় শক্ত কালো, ধূসর, সাদাটে পাথরে তৈরী। কোনটি একই সঙ্গে বিভিন্ন রং-এর প্রস্তরখণ্ডে তৈরী । কোনটি ওভাল ধরনের, কানা পাতলা ও মসৃণ; কোনটা শক্ত কালোপাথরের বা সাদাটে পাথরের অস্ত্র; কোনটির এক দিকে বাঁকানো ডগা; কোনটির আবার এক দিকে খাঁজ কাটা এবং অপর প্রান্ত পাতলা ও মসৃণ করা হয়েছে। গভীর কালোর মধ্যে ফুট ফুট ছিটে রং-এর প্রস্তরখণ্ডে ত্রিভুজাকৃতির কয়েকটি প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। তেশিরা, লম্বাটে অস্ত্র. গোলাকার প্যাস্টেল ইত্যাদির মত কয়েকটি ব্যবহৃত টুলসও রয়েছে।[৩]

বোড়াল, হরিনারায়ণপুর অঞ্চলে যেমন বেশ কিছু মসৃণ হাড়ের ও মাছের কাঁটার অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে, গোবর্দ্ধনপুরেও সেরকম কিছু নিওলিথিক যুগের অস্থিআয়ুধ, যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। গোবর্দ্ধনপুর, কাকদ্বীপ, বোড়াল প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রগুলি থেকে ছোট বড় জীবজন্তুর বিভিন্ন অংশের অর্ধফসিলীভূত হাড়, দাঁত, শিং ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। বোড়াল, কাকদ্বীপ এবং গোবর্দ্ধনপুরের জলজ এবং স্থলজ উভয় প্রকার বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রায়-ফসিলীভূত এবং অর্ধফসিলীভূত প্রচুর অস্থি উদ্ধার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এদের মধ্যে তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণীর প্রচুর অস্থি উদ্ধার করা হয়েছে। তৃণভোজী প্রাণীর প্রচুর চর্বনদন্ত অর্ধফসিলীভূত অবস্থায় পাওয়া গেছে। দুটি বিশাল গজদন্তসহ গজমস্তক এবং হস্তী, গণ্ডার, বাঘ, মহিষ, হরিণ, কুমীর, শুশুক এবং সামুদ্রিক কাঁকড়ার বড় দাড়া গোবর্দ্ধনপুরের এই প্রত্নস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

নবপোলীয় যুগের পটারী, কাঁচামাটির ও পোড়ামাটির নিত্যব্যবহার্য আসবাবপত্র, পোড়ামাটির বীডস্, জালের কাঁঠি ইত্যাদি প্রপ্তি এই সকল স্থানে মধ্যাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের মানুষের উপস্থিতির স্পষ্ট লক্ষণ।[৪]

খাদ্য, বসতি এবং কৃষির উপযোগী পরিবেশ নিঃসন্দেহে তৎকালীন মানুষকে এইসব নদী ও সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে নিশ্চিতভাবে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছিল। পরবর্তী প্রাগৈতিহাসিক কালে, (খৃষ্টপূর্ব) এবং ঐতিহাসিক সময়ে সেই পরিবেশ বজায় ছিল। দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর, সাগর, আটঘরা, বোড়াল, গোবর্দ্ধনপুর, তিলপী, জটা, মণিনদীর অববাহিকা, বাইশহাটা, খাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের প্রত্নস্থলগুলি থেকে জবসতির চিহ্ন, প্রাচীন কূপ, জলাশয়, পাকা গৃহ-ভিত্তি, মঠমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন পটারী, NBP -র উপস্থিতি, পাঞ্চমার্ক কয়েন, ঝুড়িছাপ ও অন্যান্য ষ্ট্যাম্পড় (ছাপ) পটারী, রুলেটেড পটারী, হাতেটেপা পুতুল, পক্ষীচঞ্চু ও মুণ্ডযুক্ত ও ছাগ - মুণ্ড - যুক্ত টেরাকোটা (মনুষ্য অবয়ব যুক্ত দেবদেবী), উচ্চস্কন্ধবৃষ, হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি প্রত্নসামগ্রী প্রাগৈতিকহাসিক যুগে মনুষ্য বসবাসের নিদর্শন।

তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার সমস্ত অঞ্চলে মানুষের উপস্থিতির ইতিহাস এখনও এই সব পরোক্ষ প্রত্নসাক্ষ্য নির্ভর। ভূ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণগুলি থেকে দেখা যায় যে অবনমিত ভূ-ভাগে অনেক বনভূমির চিহ্ন পাওয়া গেছে। বোড়াল, ক্যানিং, নামখানা, সাগর, রামনগর, ধোপাগাছি ইত্যাদি অঞ্চলে Ground Level - র ১৫ ফুট থেকে ৪০ ফুট নীচে আবিষ্কৃত পচনশীল বৃক্ষরাজীর বয়স আনুমানিক ৫,০০০ - ৮,০০০ বছর। আবার পূর্বোক্ত গোবর্দ্ধনপুরের অর্ধফসিলীভূত অস্থিসমূহের বয়স আনুমানিক ৫,০০০ - ১১,০০০ বছর। দেউলপোতা থেকে প্রাপ্ত একটি বানরাকৃতি করোটির আনুমানিক বয়স ১ লক্ষ থেকে ১.৫ লক্ষ বছর। এই প্রেক্ষাপটে এবং ক্ষুদ্রাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের প্রস্তরায়ুধগুলি প্রাপ্তির নিরিখে এখানে মানুষের উপস্থিত ও বসতির ইতিহাস ক্ষুদ্রাশ্মীয় বা নবাশ্মীয় যুগ থেকেই, একথা বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন। তবে তৎকালীন গোষ্ঠীজীবন ও স্বল্প জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে জনবসতিগুলি নির্দিষ্ট কতকগুলি স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। অবশ্য আরো উন্নততর গবেষণা সাপেক্ষে এই কাল সীমার বিস্তৃতি সম্ভবপর হতে পারে। যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে একথা বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে বা প্রথম সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে এ অঞ্চলে মানুষের উপস্থিতি সম্ভব হয়েছিল।[৫] কিন্তু এই সময় সীমা আরও বেড়ে যাবে।

নানা প্রকার প্রত্নতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখান হয়েছে যে ক্রীটদেশের সঙ্গে এ অঞ্চলের বণিকদের নৌবাণিজ্যের মাধ্যমে ৩৫০০ বছর আগেই যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল।[৬] তাই মনে করা যেতে পারে যে আদি জনবসতি আরও প্রাচীন।

নবাশ্মীয় যুগের পরবর্তীকালে অথবা সমসাময়িক সময়েই এই সমস্থ অঞ্চলে কৃষিকার্যও শুরু হয় বলে অনুমান করা যায়। তৎকালীন জনজীবনে ব্যবহৃত মৃৎ পাত্রাদি ও পোড়া মাটির অন্যান্য নিদর্শন থেকে এই অনুমান করা যায়। সম্ভবত এই সময়েই লৌহ ও তাম্রের অস্ত্রশস্ত্রাদি ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রবাদির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। গোবর্দ্ধনপুরে প্রাপ্ত লৌহাস্ত্রগুলি[৭] এবং হরিণারায়ণপুর ও অন্যত্র প্রাপ্ত লৌহ অস্ত্র শস্ত্র ও দ্রব্যাদি[৮] তার সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলায় তাম্রযুগের আগেই লৌহযুগের আবির্ভাব ঘটেছিল।[৯]

আদি ঐতিহাসিক যুগ ঃ

বস্তুতপক্ষে আদি ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাসও প্রায়ান্ধকারাচ্ছন্ন। খ্রীঃপূঃ আনুঃ ১৫০০-২০০০ অব্দে (মতান্তর আছে) যাযাবরী বৈদিক আর্যগণ প্রচীন ভারতীয় সভ্যতার ধ্বংস করেছিল সিন্ধু অববাহিকায়। এই সময়কার এবং তার পূর্ববর্ত্তী কালের উন্নত প্রাক-আর্য সভ্যতার কথা জানা গেছে গুজরাট; উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলে প্রত্ন উৎখননের মাধ্যমে। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় প্রত্ন উৎখনন না হওয়ায় সেরকম কোন উৎখনিত প্রাক-আর্য নিদর্শন পাওয়া যায়নি। উৎখনন হয়নি বলেই বিভিন্নস্তর থেকে পাওয়া Chance finds গুলির উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

লোকধারা ঃ

এ অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন মনুষ্য কঙ্কাল উদ্ধার না হওয়ায় নৃ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ অঞ্চলের তৎকালীন মানুষের দেহগত বৈশিষ্ট্যের কথা অজ্ঞাত। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রচলিত ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও শব্দ শৃঙ্খলা, কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত পর্যালোচনা, ধর্ম ও আচরণগত সাদৃশ্য ইত্যাদি থেকে নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে এ-অঞ্চলে নেগ্রিটো, প্রোটো - অষ্ট্রোলয়েড, অ্যালপাইন, কোলিড, দ্রাবিড়িয়ান ইত্যাদি জাতি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাদের রক্ত, ভাষা ও সংস্কৃতির মিশ্রণে গঠিত আচার আচরণ ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা এ-অঞ্চলে দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত। এর সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছিল আর্য বা নর্ডিক প্রবাহ ধারা। এ-সব কারণেই এই জেলায় এখনও একই সঙ্গে দুইটি সংস্কৃতিধারার প্রবাহ দেখা যায়। আদি ধারাটি লৌকিকধারা বা লোকসংস্কৃতিধারা এবং অন্যটি পরিশুদ্ধ বা উচ্চসংস্কৃতিধারা নামে প্রচলিত। অবশ্য এটাও ঠিক যে, উভয় সংস্কৃতি একটি উন্নততর ক্ষেত্রে একীভূত হয়ে গেছে। লৌকিক ধারাটি এখনো বজায় রয়েছে কোল, শবর, হাড়ি, ডোম, বাগদী, কওরা, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে।

লিখিত তথ্যাদি ঃ

খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতক থেকে গ্রীক ও রোমান ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোর্তিবিদ্যাবিদগণের লেখা এবং প্রাচীন বণিকদের বাণিজ্য ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে ভারত ইতিহাসের ঐতিহাসিক কালের বেশ কিছু লিখিত তথ্যাদি পাওয়া যায়। দেশীয় সূত্রে যেমন, ঐতরেয় আরণ্যক, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, বায়ুপুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং পরবর্তীকালে রঘুবংশ ও অন্যান্য বৌদ্ধ, জৈনসূত্র গ্রন্থাদি থেকে গঙ্গা, গঙ্গারাষ্ট্র, বঙ্গ প্রভৃতি জাতি ও রাজ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্দেশসূত্র পাওয়া যায়।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে (খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ - ৩২৪ অব্দ) এবং তৎপরবর্তীকালে যে সমস্ত গ্রীক দূত ও ভ্রমণকারীরা ভারতে এসেছিলেন তাদের মধ্যে মেগাস্থিনিসের লেখা "ইণ্ডিকা" নামক ভারত-বিবরণ থেকে দক্ষিণ বাংলার এই অঞ্চলের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ইনি চন্দ্রগুপ্তের (৩২৪ - ৩০০ মতান্তরে ৩১৭ - ২৯৩ খৃষ্টপূর্ব) রাজসভায় গ্রীকদূত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করেন। কৌটিল্যের সহায়তায় তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। ২৯৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মারা যান। পরবর্তীকালে গ্রীক রোমান লেখকগণ ঃ ডিওডোরাস সেকিউলাস (খৃঃ ১ম শতাব্দী), কার্টিয়াস্ রুফাস্ (খৃঃ ১ম শতাব্দী) প্লুটার্ক, সলিনাস, স্ট্র্যাবো, টলেমি (জিওগ্রাফিকে হুফেগেসিস্), প্লিনী (নেচুরালিস্ হিস্টোরিয়া), পেরিপ্লাস্ গ্রন্থকার (পেরিপ্লাস্ থেস্ ইরিথ্রাস্ থালাস্পেস্) তাঁদের বিবরণে ভারত ও বাংলা প্রসঙ্গে যে সমস্ত বিবরণ দিয়েছেন তাতে উপকূলীয় দক্ষিণ বাংলার তথা দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এই অংশের আদি ইতিহাস, জাতি, রাজ্য ও তার অবস্থান, রাজধানী, গঙ্গে বন্দর, আমদানি রপ্তানি এবং স্বর্ণখনি, স্বর্ণমুদ্রা, বিনিময় ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা লিখেছেন। সে সময়ে এই অঞ্চলটি গঙ্গার অববাহিকা ও গঙ্গা নদীর মোহনা ছিল বলে উল্লিখিত। টলেমির ম্যাপে গঙ্গার শেষ পাঁচটি শাখার মোহনা, গঙ্গ ারিডি রাজ্যের অবস্থান (মোটামুটি পূর্ববঙ্গের গঙ্গা যমুনা মোহনা থেকে পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা

মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত), পলুরা, গঙ্গে, তিলোগ্রাম প্রভৃতি বিশেষ সামুদ্রিক বন্দরগুলির অবস্থানও দেখানো হয়েছে। এ সময়ে তাম্রলিপ্ত বন্দরের কথা অনুল্লিখিত দেখা যায়। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার গঙ্গাসাগর মোহনাকেই 'গঙ্গেবন্দর' বলেছেন। সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্ত বন্দরের পূর্বে 'গঙ্গে বন্দরের' প্রাধান্য ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে মৌর্যযুগে তাম্রলিপ্ত বন্দরের প্রাধান্য দেখা যায়। সিংহলের মহাবংশ নামক সিংহলী ধর্মগ্রন্থে বন্দর হিসাবে সম্ভবত গঙ্গা বন্দরকে নির্দেশ করা হয়েছে। গঙ্গারাঢ় বা গঙ্গারাষ্ট্র থেকে বিজয় সিংহ তাম্রপর্ণী গিয়েছিলেন — একথা বলা হয়েছে। এটি গৌতমবুদ্ধের মৃত্যুকালীন ঘটনা। বৌদ্ধ গ্রন্থ দীপবংশেও দক্ষিণ বাংলার নৌবন্দরের উল্লেখ আছে।

মেগাস্থিনিসের বিবরণে গঙ্গারিডি, কলিঙ্গী, প্রাসী, মদগোলিঙ্গী প্রভৃতি আলাদা আলাদা জাতি ও রাজ্যের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় সমুদ্রতীরবর্তী দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় এই গঙ্গারিডি জাতিদের পৃথক রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। তাম্রলিপ্ত সম্ভবত কলিঙ্গী বা অন্য কোন রাজ্যভুক্ত ছিল।

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস না হলেও এর মধ্যেও ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যায়। ইতিপূর্বেই আমরা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করেছি। বর্তমান আলোচনায় রামায়ণে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী সাংখ্য দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিল পাতাল বলে কথিত দক্ষিণ বঙ্গের এই অংশে বসবাস করতেন। ইক্ষাকু বংশীয় রাজা সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ইন্দ্র মহর্ষি কপিলের আশ্রমে লুকিয়ে রাখেন। মহর্ষি কপিলের রোষে দুরাচারী সগর সৈন্য (ষাট হাজার পুত্র?) নিহত হয়। পরে সগরের পৌত্র (অংশুমানের- পুত্র) দিলীপের সঙ্গে মতবিনিময়ের (সন্ধি?) ফলে এ অঞ্চলে গঙ্গা আনয়নের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যজ্ঞাশ্ব মুক্তি সম্ভব হয়। এ কাহিনী সবার জানা। পরবর্তীকালে ঐ বংশের ভগীরথ আনীত গঙ্গা এ অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে সাগরে মিলিত হয়। এই কাহিনী থেকে আমরা অন্তত এটুকু পাই যে পবিত্র গঙ্গা যা আদিগঙ্গা রূপে এককালে বর্তমান এই জেলার প্রায় মাঝখান দিয়ে প্রবল স্রোতস্বিনীরূপে প্রবাহিত হত তার মোহনায় সাগর-সঙ্গমে বা গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির আশ্রম ছিল। যদিও মূল গঙ্গাসাগর আশ্রম এখন সমুদ্র গ্রাসে নিমজ্জিত এবং বর্তমান তীর্থক্ষেত্র থেকে তার অবস্থান আরো কয়েক কিমিঃ দক্ষিণে ছিল, অর্থাৎ সেই সুদুর অতীতে সাগরদ্বীপ, গঙ্গাসাগর মোহনা ইত্যাদির অস্তিত্ব এবং একটি স্বতন্ত্র উন্নত অনার্য (দস্যু, অসুর, পক্ষী, বা নাগ জাতীয়) রাজ্যে (পাতাল) -র অবস্থান আর্যদের জানা ছিল। সম্ভবত মহর্ষি কপিলই ছি.লেন (অন্তত বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব কালে) এই অনার্য রাজ্যের প্রথম আর্য ব্যক্তিত্ব। মহাভারতেও (রামায়ণ এর পরে লিখিত বলে অনুমিত) আমরা বন পর্বে যুধিষ্ঠিরের সাগর সঙ্গমে তীর্থ স্নান এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে ভীম কর্তৃক উপকূলীয় দক্ষিণ বঙ্গের ছোট ছোট রাজ্য জয়ের সময় এই অঞ্চলও তাঁদের অধীনে আসে এ-কথা বোঝা যায়। রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে বঙ্গীয় রাজদের উপস্থিতি এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাংলার রাজার কৌরব পক্ষে যোগদান ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের ইঙ্গিত দেয়। অন্তত ঐ সময়ে এই অঞ্চলে শক্তিশালী স্বাধীন স্বতন্ত্র (ম্লেচ্ছ?) রাজারা রাজত্ব করতেন তা স্পষ্ট হয়। রামায়ণ কাহিনী এবং মহাভারত যুদ্ধের 'যুগ বিচারে' ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরি ৩১০২ খৃঃ পূঃ মহাভারত যুদ্ধের আরম্ভ বলে হিসাব করেছেন। অন্য দিকে মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে ৪১০০ খৃঃ পূঃ বলে মনে করেন (উভয় ক্ষেত্রেই মতান্তর আছে)। ত্রেতাযুগ বা রামায়ণ যুগকে মহাভারতের

আগের যুগ বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে সুন্দরবন সহ দক্ষিণ চব্বিশপরগনা অঞ্চল ভৌগলিক ভাবেও সুদুর অতীতের সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগে (বর্তমান অবস্থানের তুলনায় কিছুটা অন্যভাবে হলেও) অবস্থিত ছিল। এমন কি গোষ্ঠীরাজ্য হলেও এরা বেশ উন্নত রাজ্য ছিল। সাগরে-সৈন্য সমাবেশ, ভার্জিলের কাব্যে গঙ্গারিডিদের যোদ্ধা হিসাবে প্রশংসা, রঘুর নৌযুদ্ধ ইত্যাদি সম্ভবত এইটুকু প্রমাণ করে যে এই অঞ্চলের তৎকালীন অধিবাসীরা বীর যোদ্ধা ছিল এবং তারা নৌযুদ্ধে ও হস্তীবাহিনীসহ স্থলযুদ্ধে পারদর্শী ছিল। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রচুর হস্তীকঙ্কাল ও অস্থিরাজি, হস্তীর সহজলভ্যতা প্রমাণ করে। এ-সবই আদি ইতিহাসের কথা।

আদি ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিত তথ্যাদি বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, জৈন ও বৌদ্ধ সূত্রগ্রন্থ ও ধর্ম গ্রন্থাদিতে যতটুকু পাওয়া যায় তা উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যা পাওয়া গেছে সেগুলির যুগবিচারের ক্ষেত্রে মত পার্থক্য দেখা যায়। বস্তুতপক্ষে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় মগধের নন্দবংশীয় রাজা ধননন্দের গঙ্গা তীরে সৈন্য সমাবেশ, গঙ্গারিডিদের হস্তীবাহিনী নিয়ে সহযোগিতা ইত্যাদি ঘটনাবলী থেকেই আদি ইতিহাসের তথ্যসমৃদ্ধ পর্যায় আরম্ভ হল বলা যায়।

মৌর্য যুগ ঃ

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি মিশরের অজানা গ্রিক বণিকের (দিনলিপি ভিত্তিক নৌ-বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির) বিবরণ প্রসঙ্গের শেষ দিকে ঐ নাবিকের উড়িষ্যা হয়ে গঙ্গামোহনায় উপস্থিতি ও তার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশপরগনার গঙ্গা মোহনার অবস্থিতির ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। পেরিপ্লাসের ঐ বিবরণের "দোশারেনে" অঞ্চল অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দশার্ন বা পুরী - কটক অঞ্চল হয়ে পূর্বদিকে মহাসাগরকে ডানদিকে রেখে পেরিপ্লাস গ্রন্থকারের গঙ্গাভূমির অবস্থান নজরে আসে। পেরিপ্লাসগ্রন্থের সংশ্লিষ্ট ৬৩ অনুচ্ছেদটির সম্পূর্ণ অনূদিত পাঠ এরকম ঃ

"৬৩। এই সবের পরে, পথ আবার পূর্বদিকে ঘুরে গেছে, আর মহাসাগরকে ডানদিকে রেখে এবং সমুদ্রতীরকে দূরে বাঁদিকে ফেলে ভেসে চললে, গাঙ্গেস্ (The shore remaining beyond to the left, Ganges comes into view) নজরে আসে,আর তার কাছে পূর্বদিকে সব শেষের দেশ খ্রুসে (Chryse- সুবর্ণভূমি)। এর (Ganges বা গঙ্গার) কাছে গঙ্গা নামে একটি নদী আছে, আর এটি নীল নদের মত একইভাবে ওঠা নামা করে। এর (গাঙ্গেস বা গঙ্গা নদীর) তীরে আছে একটি বাণিজ্যিক শহর, নদীর মত যার এক নাম গঙ্গা (Ganges)। এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে আনা হয় তেজপাতা (Malabathrum) এবং গাঙ্গেয় গন্ধদ্রব্য (Gangetic Spikenard—গাঙ্গেয় জটামাংসী) এবং মুক্তা আর সূক্ষ্মতম শ্রেণীর মসলিন যা গাঙ্গেয় মসলিন নামে পরিচিত। কথিত আছে যে এই অঞ্চলগুলির কাছাকাছি সোনারখনি রয়েছে আর এখানে এক ধরনের স্বর্ণমুদ্রা আছে যাকে কলটিস (Caltis) বলা হয়।"

বর্ণনাটি দিনলিপি আকারে ব্যক্তিগতঅভিজ্ঞতা ভিত্তিক এবং গঙ্গা অঞ্চল (ভূ-ভাগ), গঙ্গা নদী, গঙ্গা নামক বন্দরের অস্তিত্ব এবং সমুদ্র মোহনায় এর অবস্থান জানা যাচ্ছে। পেরিপ্লাস

গ্রন্থের সঙ্গে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা টলেমীর ভূগোলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিবরণ ও নদী মোহনাগুলির বিবরণ, কাছাকাছি বন্দরগুলির অবস্থানের কথা বিবেচনা করলে দক্ষিণ চব্বিশপরগনা অঞ্চলটির অবস্থিতি এবং এই অঞ্চলটি যে তৎকালে একটি উন্নত বাণিজ্য কেন্দ্র, পোতাশ্রয় ইত্যাদি ছিল, তা বোঝা যায়। সোজা কথায় রাজনৈতিক ভাবে ঐতিহাসিক যুগের আলোকে দক্ষিণ চব্বিশপরগনা অঞ্চলের প্রাচীনতম নাম হিসাবে পাই গঙ্গা নামক এক ভূখণ্ড বা রাজ্যের। এই গঙ্গা-রাজ্যের (গঙ্গারিডি রাজ্যের) সঙ্গে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের মগধের নন্দবংশীয় রাজার যে একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ছিল তাও আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি গ্রীক লেখক মেগাস্থিনিস এবং তার পরবর্তী লেখকদের লেখা থেকে। খৃঃ পূঃ ৪র্থ-৩য় শতাব্দীতে এই গঙ্গারাজ্য মৌর্য রাজাদের অধীনে এসেছিল বলে মনে করা হয়। পুড় নগরস্থিত সরকারী সমবায় প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনামা জাতীয় যে শিলালিপিটি মহাস্থানগড়ে (খৃঃ পূঃ ৩য় শতক - বগুড়া, বাংলাদেশ) পাওয়া গেছে সেটি মৌর্য যুগের বলেই চিহ্নিত হয়েছে। উপরিউক্ত শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে, তৎকালীন মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (?) পুড় নগরে প্রকাশাসনিক কর্মচারীদের নিয়োগ করেছিলেন।[১০] হরিনারায়ণপুর, পাকুড়তলা, দেউলপোতা, সাগরদ্বীপ, গোবর্দ্ধনপুর, তিলপী, আটঘরা প্রভৃতিস্থানে মৌর্য যুগের পটারী (NBP, Red Ware, Rouletted Pottery), প্রাক বঙ্গলিপিসীল, পাঞ্চমার্ক কয়েন, মৃন্ময় জৈন মাতৃকামূর্তি ও তীর্থঙ্কর মূর্তি, বুদ্ধ মূর্তি, মৃন্ময় অম্বিকা মূর্তি, এবং অন্যান্য পটারী, নির্দিষ্ট আকারের পোড়ামাটির ইট, বীড্‌স্‌ ইত্যাদির প্রাপ্তি, মৌর্য যুগে এ অঞ্চলে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে গড়ে উঠেছিল তা প্রমাণ করে। মহাস্থানগড় শিলালিপিতে সরকারী প্রশাসনিক নির্দেশাবলী পাওয়া যাচ্ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি বিশ্লেষণ করে তৎসহ প্রত্ন-সাক্ষ্যগুলিকে বিবেচনা করলে এই অঞ্চলে মৌর্য রাজ্য ভুক্তির ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহারাজ অশোকের (২য় শিলালিপি) রাজত্বকালে দেখা যায় যে, কলিঙ্গ ছাড়া দক্ষিণ বঙ্গের সমস্ত অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা কলিঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না বলেই কলিঙ্গযুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। একটি 'ধর্মীয় সুত্ত' থেকে জানা যায় যে অশোক একটি বিশেষ কারণে পৌণ্ড্র বর্ধনীয় সমস্ত নির্গ্রন্থ্ (আজীবিক?) - দের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বহু সংখ্যক নির্গ্রন্থ্দের সঙ্গে অশোকের এক ভ্রাতাকেও ভুলক্রমে (?) ঐ একই সঙ্গে হত্যা করা হয়েছিল। অন্য একটি কথিত কাহিনী এই যে অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য নিজ পুত্র কন্যাকে (?) তাম্রলিপ্ত (অথবা গঙ্গে) বন্দর থেকে সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। এইসব উপকথার সবগুলি ইতিহাস নাও হতে পারে কিন্তু ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এর মধ্যে থেকে খুঁজে পাওয়া যায় অর্থাৎ 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি' ছিল এবং সেখানে বৌদ্ধদের সঙ্গে প্রচুর আজীবিকও বাসকরতেন; এবং তাম্রলিপ্ত (মতান্তরে গঙ্গে) একটি সমুদ্রবন্দর ছিল। এছাড়া চীনা পর্যটক ইয়াং চুয়াং নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে বিশেষ করে সমতটে অশোক কর্তৃক নির্মিত বেশ কিছু বৌদ্ধস্তুপ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। পৌণ্ড্রবর্ধনের মত সমতটের সীমানা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে, তবুও সামগ্রিকভাবে দেখলে,এবং বিভিন্ন সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এই ভূখণ্ডও সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলাটাই সমীচীন। একই সময়ে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রাচীনতম ধর্মীয় পথ বা পিলগ্রিম্‌স্‌ট্র্যাক্‌ দিয়ে যেমন স্থল

পথের দক্ষিণতম তীর্থস্থান গঙ্গাসাগরে আসা যেত (যার অস্তিত্ব এখনও এ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে রয়েছে এবং যা পরবর্তীকালে দ্বারীর জাঙ্গাল নামে খ্যাত) সেই পথ দিয়ে এবং আরো কয়েকটি শাখাপথ দিয়েও উত্তর-পূর্ব ভারত, আফগানিস্থান ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে দিয়ে বিদেশের সঙ্গে বিশেষত রোম, গ্রীক প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য যোগাযোগ চলত। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর থেকে শুঙ্গ-কুষাণ যুগ পর্যন্ত এই ব্যবসা বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। পাল ও সেন যুগে বহির্রাষ্ট্রীয় অস্থিরতার জন্য স্থলপথে বাণিজ্য হয়ত খুবই কমে এসেছিল কিন্তু জলপথে বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। একটি তথ্যে জানা যায় যে আনুমানিক খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী থেকে খৃঃ ১৪শ-১৫শে শতাব্দী পর্যন্ত রায়মঙ্গল, আদিগঙ্গা, সরস্বতী মোহনা সহ উপকূলীয় সমুদ্রপথে পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে উপকূলীয় দক্ষিণবঙ্গের বাণিজ্য যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।[১১]

জৈন ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রভাবও সেই সময় এই অঞ্চলে ছিল।[১২] এই সময়ের পূর্ব থেকেই খৃঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ ভারতের প্রায় সর্বত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিয়মকানুন ও আচার সর্বস্বতা বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ মানুষের কাছে প্রায় অত্যাচারের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যার ফলে এই দুটি প্রতিবাদী ধর্ম, জৈন (নির্গ্রন্থ) ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ঘটেছিল। এই সময় যে সমস্ত ধর্ম প্রচলিত ছিল তার মধ্যে ভাগবতীয় ধর্ম একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিল। বিশেষত পঞ্চবিষ্ণু পূজা এবং চতুর্ব্যূহ বা চতুর্বিষ্ণু পূজা বহু প্রচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। চতুর্ব্যূহ বিষ্ণুপূজা বৃষ্ণি বংশীয় বিষ্ণু পূজক ভক্ত সমাজে পঞ্চবিষ্ণু পূজকদের পরবর্তী । দেখা যায় যে চতুর্ব্যূহ বিষ্ণুপূজকগণ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। পঞ্চবিষ্ণুপূজা তার পুর্ববর্তী হওয়ায় এটি আরও প্রাচীন কালের।[১৩] দক্ষিণ চব্বিশপরগনার পাথরপ্রতিমার সমুদ্র সংলগ্ন গোবর্ধনপুর থেকে পঞ্চ বিষ্ণু উপাসনার পোড়ামাটির একটি প্রাচীন পঞ্চবিষ্ণু পূজাবেদী পাওয়া গেছে। এটিতে যুগ্ম পদচিহ্ন, লাঙল, গদা, চক্র ও মৎস্য খোদিত আছে। চিহ্নগুলি যথাক্রমে বৃষ্ণিবংশীয় বিষ্ণু, সংকর্ষণ বা বলরাম, অনিরুদ্ধ, শাম্ব ও প্রদ্যুম্নের লাঞ্ছন। প্রাক্ঐতিহাসিক যুগের অন্যান্য প্রাচীন প্রত্ননিদর্শনগুলির সঙ্গে এই নিদর্শনটিও পাওয়া গেছে সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। এই প্রত্ননিদর্শনটির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা না হলেও শাস্ত্রগত ও লাঞ্ছনাগত (আইকোনোগ্রাফিক) তত্ত্ব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করা যায় যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত পঞ্চবিষ্ণু পূজার ধারা দক্ষিণ চব্বিশপরগনা তথা সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছিল।[১৪] প্রসঙ্গত আর একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য যে সেই প্রাচীনকালে শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বৈষ্ণবরাই নয়, নিজেদের মঙ্গল ও সুখ শান্তির জন্য শূদ্ররাও গৃহে বিষ্ণুপূজা করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করত। ধোপা, মুচি, শিকারি, কুম্ভকার, কলু, তেলি ইত্যাদি সকল নিম্নবর্গীয় জাতি নিজেদের মঙ্গল কামনায় গৃহে বিষ্ণু বাসুদেবের পূজা করত।[১৫] অর্থাৎ এই সকল জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হচ্ছে।

সম্প্রতি (১৯৯৫ খৃঃ) গোসাবার নিকটবর্তী রিজার্ভ ফরেস্টের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে বনকর্মীরা একজোড়া পদচিহ্নযুক্ত একটি পোড়ামাটির বেদী, একটি সূর্যমূর্তি ও গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধার করে রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালায় প্রদান করেন। যুগ্ম পদচিহ্নযুক্ত এই পোড়ামাটির ছোট বেদীটি খৃঃ পূঃ প্রথম বা খৃঃ প্রথম শতাব্দীর বলে আনুমিত।[১৬] এই পদচিহ্নবেদীটি

বুদ্ধপদপট্ট বা ভাগবতীয় বিষ্ণুপূজার (?) প্রতীক বলে মনে করা যায়।[১৭] দক্ষিণ চব্বিশপরগনার অনেগুলি প্রত্নস্থল যেমন আটঘরা, বাইশহাটা, গোবর্দ্ধনপুর, তিলপী, উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ, খাড়ি-ছত্রভোগ অঞ্চল, ভরতগড়, বিরিঞ্চিবাড়ি, মন্দিরতলা, পাকুড়তলা, পুকুরবেড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্তযুগের ইষ্টক নির্মিত বাসগৃহ, দেবালয়, দুর্গ, প্রচীর, কূপ, ড্রেনেজ-পাইপ, মুদ্রা সীল, বীড্‌স্, টেরাকোটা মূর্তি ইত্যাদি প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে। দক্ষিণবঙ্গের প্রত্নস্থলগুলিতে মৌর্যযুগে প্রচলিত পুরাণ মুদ্রার নিদর্শনও পাওয়া যায়।

মৌর্য পরবর্তী যুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত অবস্থা ঃ

গত বিশবছর ধরে চব্বিশ পরগনা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে মাটির পাত্র, সীলমোহর ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ খরোষ্ঠী ও খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত তথ্যাবলী প্রাচীনতম বঙ্গের ইতিহাস অনেকটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর শেষ থেকে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে (শুঙ্গ কুষাণ যুগে) উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন অংশে সাময়িকভাবে হলেও বসবাস করতে থাকেন। তাদের এই ব্যবসা ছিল এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য ও অন্য পণ্যাদি, মাটির পাত্রাদি, চাল ও ঘোড়ার আমদানীতে। অনেক সময় তারা জোতদার হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত হতেন। এদের মধ্যে শক ও য়ত্র-চি (কুষাণ) জাতিভুক্ত লোকেরাও ছিল। সম্ভবত এদের প্রভাবেই দক্ষিণবঙ্গে অনেকগুলি গণরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৮] নদী খাড়ি প্রভাবিত দক্ষিণ চব্বিশপরগনাও এরূপ গণরাজ্য বা প্রায়- স্বাধীন সামন্তরাজ্যের প্রায়শই অন্তর্ভুক্ত হত।

মৌর্য যুগের পরেই ভারতে শুঙ্গ (১৮৭ - ৭৫ খৃঃ পূঃ) কুষাণ রাজত্বের শুরু। মৌর্যযুগের রাজত্বকাল দীর্ঘস্থায়ী হলেও ভরতে শুঙ্গ ও কুষাণ রাজত্ব খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শেষ মৌর্যসম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র (খৃঃ পূঃ ১৮৭-১৫১) মগধ অধিকার করে ভারতে শুঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে ইউচি বা কুষাণদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা কনিষ্ক ৭৮ খৃঃ ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। একথা ঠিক যে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এই ভূ-খণ্ড পর্যন্ত শুঙ্গ ও কুষাণ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল এমন কোন সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে কুষাণ যুগের মুদ্রা, ব্যবসা - বাণিজ্য ও শিল্প সংস্কৃতি,এ অঞ্চলের তৎকালীন প্রায়-স্বাধীন সামন্ত রাজ্যগুলির অর্থনীতির সঙ্গে যে যুক্ত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রায় সমস্ত প্রত্নস্থলগুলি থেকে শুঙ্গ কুষাণ যুগের প্রচুর প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে। বহিরাগত শিল্পভাস্কর্য সমগ্র ভারত সহ তৎকালীন দক্ষিণবঙ্গের সভ্যতাতেও যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করেছিল। মৌর্যযুগের বিশেষ চিহ্ন হিসাবে অনেক পটারী যেমন NBP/RW ইত্যাদি থাকে এবং বিশেষ ধরনের মাতৃকা মূর্তি, প্রস্তর দ্রব্যের স্বল্পতা, কাঠের বাড়িঘর ও আসবাবপত্রের চিহ্ন, বিশেষ আকৃতির চওড়া পাতলা ইট, ইটের গৃহভিত্তি, পাঞ্চমার্ক ও কাষ্টিং কয়েন, বিশেষ ধরনের মূল্যবান পাথরের নানা প্রকার বীড্‌স্ ইত্যাদি নানা প্রকার প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে। তেমনি শুঙ্গ কুষাণ-যুগের চিহ্ন হিসাবে অত্যন্ত রুচিশীল শিল্পসমৃদ্ধ পটারী, এনিম্যাল ফিগার, খেলনাগাড়ী ও গাড়ীর চাকা বিশেষ করে বাঁকান শিংওয়ালা এবং ঘাড় ও গলার কাছে কারুকার্য করা ছাপ যুক্ত মেষের বলিষ্ঠ ও আকর্ষক চেহারার নিদর্শন, যা এসব

অঞ্চলের প্রত্নস্থলগুলিতে প্রচুর পাওয়া গেছে, এবং তা এক কথায় অনবদ্য। বৈদেশিক উচ্চ সংস্কৃতি সম্পন্ন শিল্পধারার রীতি কুষাণ যুগের হাত ধরে দক্ষিণবঙ্গেও পরিব্যপ্ত হয়েছিল। কুষাণ সাম্রাজ্যের আয়ু সীমিতকালীন হলেও ব্যাকট্রিয় ও গান্ধার শিল্পধারা নানাভাবে পরিমিশ্রিত হয়ে যে অনবদ্য শিল্পরীতি ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল তা কুষাণ সাম্রাজ্যের কালসীমাকে অতিক্রম করে এই নিম্নবঙ্গীয় অঞ্চলেও দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। এ-জেলার শুঙ্গ ও কুষাণ শিল্পরীতির বিশেষ ধরনের প্রত্ননিদর্শনগুলি যেমন ধূসর ও কৃষ্ণ বর্ণের মৃৎপাত্রাদি, বিশেষ ধরনের পটারী, ধূসর বর্ণের হস্তী, গলায় সুন্দর কারুকার্য করা এবং উত্তোলিত শুঁড় ও ঐ একই রকম কাজ করা বিশেষ রকম বিশাল বিশাল আকৃতির এবং কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমার হস্তীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তিলপি, হরিনারায়ণপুর, আটঘরা, সাগরদ্বীপ প্রভৃতি প্রত্নস্থলগুলিতে। এছাড়া বিশেষ করে সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা এবং আরও কয়েকটি প্রত্নস্থলে বেশকিছু টেরাকোটা এনিম্যাল ফিগার, দেবদেবী, ছোট ছোট টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলোকে দেবপ্রসাদ ঘোষ কুষাণ যুগের বা গুপ্ত যুগের প্রথম দিকের বলে সনাক্ত করেছেন। [১৯] ১১৬ নং লট্ থেকে বেশ কিছু কুষাণ তাম্রমুদ্রার হোর্ড পাওয়া গেছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে কুষাণ যুগের মুদ্রা ও মূর্তি পাওয়া গেছে। কাশিনগরেও কুষাণ যুগের মত কিছু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে। এছাড়া জটার দেউলের দক্ষিণ পশ্চিমে ছাটুয়া নদীর প্রবাহপথে কুষাণ রাজ হুবিষ্কের অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তি এক বিরল ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

মৃন্ময় ও প্রস্তর নির্মিত জৈন এবং বৌদ্ধ মূর্তিগুলি থেকে বোঝা যায় যে খৃঃ পূঃ ৫ম ও ৪র্থ শতাব্দী থেকেই ভারতবর্ষে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটে। বিশেষ করে বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলায় পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের ধর্ম-প্রচারে এ অঞ্চলে নির্গ্রন্থ ও জৈন ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। পরবর্তীকালে জৈনধর্মীয় যে 'গণ'গুলির সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনীয় 'গণ' এ-জেলার অন্তর্ভুক্ত। জৈন কল্পসূত্র অনুসারে গোদাস প্রমুখ জৈন সাধুরা তাম্রলিপ্তীয়, কোটিবর্ষীয়, পুণ্ড্রবর্ধনীয় ও কর্বটীয় নামক চার শাখায় বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত বিভিন্ন জৈন সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রতিপত্তি ছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে পৌণ্ড্রদেশ, পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির সীমারেখা বিভিন্ন সময়ে উত্তরবঙ্গ থেকে সুদুর দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ-জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আদিগঙ্গার পূর্বতীরস্থ সমস্ত ভূ-ভাগ পরবর্তী গুপ্ত-পাল-সেন যুগে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও পৌণ্ড্রবর্ধনীয় ও পুণ্ড্রবর্ধনের বিস্তৃতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে তবুও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং পরবর্তীকালে চৈনিক ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রীদের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে পৌণ্ড্রবর্ধনের বিস্তৃতি বাংলার দক্ষিণে এই জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

গুপ্তযুগ ঃ খৃঃ ৪র্থ শতকে সমগ্র বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনাও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার এই ভূখণ্ড গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের শেষ সীমানা হওয়ায় এ অঞ্চলের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং প্রতিরক্ষার ব্যাপারে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এবং সমুদ্রগুপ্ত যখন বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, বাংলাদেশের এসব অঞ্চলে তখন কতকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। শুশুনিয়া লিপিতে সিংহবর্মা ও তৎপুত্র চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে। ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায়

চন্দ্রবর্মাফোর্ট নামে একটি দূর্গ ছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে-সমস্ত রাজাদের পরাজিত করেছিলেন তাদের একজনের নাম চন্দ্রবর্মা। খুব সম্ভবত এঁকে পরাস্ত করেই সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ বাংলা অধিকার করেন। সমতটসহ সম্ভবত এঅঞ্চল সমুদ্রগুপ্তের করদ রাজ্য ছিল। কয়েকটি তাম্রশাসন থেকে জনা যায় যে পুন্ড্রবর্ধন নামক ভুক্তিটি গুপ্তরাজ্যেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূল পুন্ড্রবর্ধন উত্তরবঙ্গে হলেও দক্ষিণ চব্বিশপরগনা (বিশেষ করে আদিগঙ্গার পূর্বতীর বরাবর সমুদ্র পর্যন্ত) এই ভুক্তির অন্তর্গত ছিল (পালপূর্ব— দীনেশ সরকার পৃঃ ৫৫-৫৬)। পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি কতকগুলি 'বিষয়ে' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। ৫৪৪ খৃঃ গুপ্ত বংশীয় সম্রাট তাঁর পুত্রকে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। অপরদিকে ৫০৭ খৃঃ মহারাজ বৈন্যগুপ্ত পূর্ববঙ্গ বা সমতট (সুন্দরবনসহ) শাসন করতেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে সমতট, বঙ্গ, এমনকি পুন্ড্রবর্ধনেরও বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন রাজার শাসনকালে, তার ভূখণ্ডগত আয়তনের পরিবর্তন হয়েছিল। কালিদাসের রঘুবংশে বলা হয়েছে যে, রঘু সাগর তথা দক্ষিণ চব্বিশপরগনা ভূখণ্ডটি জয় করার সময় প্রতিপক্ষের স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং যুদ্ধরত স্থানীয় শাসনকর্তাকে পরাজিত ক'রে তার পুত্রকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে যে সমুদ্রগুপ্ত এই অঞ্চলের রাজাকে পরাজিত করে কলিঙ্গের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ হিসাবে এ অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করাই গুপ্ত রাজাদের উদ্দেশ্য ছিল।

গুপ্তযুগের যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় পাওয়া গেছে তার মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা (তীরধনুক হস্তে) ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা বেশী (তীরধনুক হস্তে)। স্বর্ণমুদ্রাগুলি পাথরপ্রতিমায় পাওয়া গেছে। অন্যান্য স্থানের মধ্যে তেঁতুলবেড়িয়া, কঙ্কণদীঘি ইত্যাদি জায়গায় আরও কিছু গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। এগুলি আশুতোষ মিউজিয়ামে ও উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জের বিদ্যালয়ে সুরক্ষিত আছে। এছাড়া জটার দেউলের দক্ষিণ পশ্চিমে ছাটুয়া নদীর প্রবাহপথে স্কন্ধগুপ্তের বেশকিছু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। এ-অঞ্চল থেকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গেছে। ছাটুয়ার তীরভূমি থেকে পাওয়া গেছে হরতনের টেক্কার মত বেশ কিছু ভারী তাম্রমুদ্রা যেগুলির প্রতিটির ওজন একভরি সাড়েতিন আনা এবং এগুলির একদিকে আরোহী সহ হস্তীমূর্তি অঙ্কিত। ইতিপূর্বে এধরনের মুদ্রা আর কোথাও পাওয়া যায় নি। সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা থেকেও গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। বাইশহাটা থেকে সমুদ্রগুপ্তের এবং কালিঘাট থেকে গুপ্তযুগের বিভিন্ন রাজার অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে।

গুপ্তযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক মূর্তিগুলির মধ্যে প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি অনেকগুলিই পাওয়া গেছে পাকুড়তলা, বোড়াল, হরিনারায়ণপুর, কঙ্কণদীঘি প্রভৃতি অঞ্চলে। গুপ্তযুগের গৃহভিত্তি বলে অনুমিত প্রত্ননিদর্শন যে সমস্ত প্রত্নস্থলে পাওয়া গেছে সেগুলো হল ঃ আটঘরা, বিড়াল, উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল। পটারী এবং টেরাকোটা মূর্তি ইত্যাদি পাওয়া গেছে আটঘরা, বোড়াল, মণিরতট, বাইশহাটা, কঙ্কণদীঘি, খাড়ি - ছত্রভোগ, মন্দিরতলা প্রভৃতি অঞ্চলে।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় প্রত্নক্ষেত্রে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ন-নিদর্শনগুলির মাধ্যমে এ জেলায় গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসটিকে রূপদান করা যায়।

দেউলপোতা ঃ

(২২°১২'N, ৮৮°১০' E) ও সংলগ্ন অঞ্চল ডায়মণ্ডহারবার থানায় অবস্থিত। এখানে গুপ্ত যুগের মুদ্রা, প্রস্তর মূর্তি, শিল্প সমন্বিত মৃৎফলক, ইত্যাদি পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগের টেরাকোটা আবক্ষ মূর্তি ও আবক্ষ নারীমূর্তি, খেলনা-গাড়ীর ভগ্নাংশ এবং বিভিন্ন যুগের মূল্যবান প্রস্তর মাল্যদানাও পাওয়া গেছে। প্রত্নস্থলটি প্রাগৈতিহাসিক কালের।

হরিনারায়ণপুর (২২°৯' N ,৮৮°১৩' E) কুলপী থানায় অবস্থিত। এখানে অল্প পরিমাণ গুপ্তযুগের টেরাকোটা, প্রদীপ ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এখানে গুপ্ত রাজাদের অঙ্ক চিহ্নিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। (ঐ)

মন্দিরতলা - সাগর (২১°৪৯' N,৮৮°০৬' E) সাগর থানায় অবস্থিত। এখান থেকে গুপ্তযুগের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, প্রস্তরের সূর্যমূর্তি, দ্বাদশভুজা মহিষমর্দিনী, স্বর্ণ অলংকার আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া গুপ্তযুগের টেরাকোটা মূর্তি, পটারী, ব্রোঞ্জের মূর্তি ও উপরত্নের প্রস্তর মাল্যদানা পাওয়া গেছে।

সাগরের ধবলাটে প্রসাদপুর কাছারী বাড়ীর মন্দিরে রক্ষিত কালো কষ্টিপাথরের দেবী বিশালাক্ষী হিসাবে পূজিত গঙ্গা মূর্তি, একটি প্রাচীন স্কয়াটে বেলেপাথরের বিষ্ণুমূর্তি ও ঐ একই পাথরের একটি সূর্যমূর্তি গুপ্তযুগের বা গুপ্ত পূর্ববর্তী যুগের বলে অনুমিত।

পাকুড়তলা কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত। এখানে গুপ্তযুগের টেরাকোটা মূর্তি, পটারী, উপরত্নের প্রস্তর মাল্যদানা, টেরাকোটা যক্ষিণী, টেরাকোটা প্লাক, প্রাকবঙ্গলিপি সীল ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এইসব প্লাকগুলোতে নানারকম Motif-র আলতো ছাপ লাগান আছে। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী এখানকার কিছু প্রাকবঙ্গলিপির সীল পাঠোদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে এগুলি সপ্তম, অষ্টম ও দ্বাদশ শতাব্দীর। এখানে স্লেট পাথরের কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি ফলক, একটি ধূসর বর্ণের শক্ত পাথরের গণেশ মূর্তি এবং অন্যান্য কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলিকে গুপ্ত বা গুপ্ত পরবর্তী সপ্তম-অষ্টম শতকের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলি মূর্তিই গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। কাকদ্বীপ মহাকুমার প্রত্নস্থলের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরী করেছেন সন্তোষ কুমার বর্মণ। তার অনেকগুলি বেশ প্রাচীন।

কঙ্কণদীঘি অঞ্চল (২২°০' N, ৮৮°২৭' E) ও **জটার দেউল** (২২°০' N, ৮৮°২৯'E) রায়দীঘি থানায় অবস্থিত। সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চল থেকে কয়েকটি প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। নিকটবর্তী ছাটুয়ানদী অঞ্চল থেকে স্কন্দগুপ্তের স্বর্ণ মুদ্রা ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। সামগ্রিকভাবে কঙ্কণদীঘি অঞ্চলে গুপ্তযুগের কিছু গৃহভিত্তি, প্রাকবঙ্গলেখ সীল, পুঁতিদানা, পটারী, প্রস্তর নির্মিত নরসিংহ মূর্তি, প্রস্তরের নবগ্রহ মূর্তি, প্রস্তরের মনসা মূর্তি ইত্যাদি গুপ্তযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

অনুরূপভাবে **খাড়ী** (২২°০৩' N – ২২°৭' N মধ্যে, ৮৮°২৬'E) **ছত্রভোগ** অঞ্চলে গুপ্তযুগের প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধ মূর্তি, প্রাকবঙ্গলিপি সীল, ইত্যাদি পাওয়া গেছে। কালিদাসদত্ত জটা, কঙ্কণদীঘি, নালুয়া, খাড়ি থেকে অন্যান্য প্রত্ননিদর্শনের সঙ্গে গুপ্তযুগের বেশকিছু প্রত্ননিদর্শন

সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে প্রস্তরনির্মিত নিদর্শন যেমন কিছু ছিল তেমনি টেরাকোটা ও পটারীর বেশ কিছু নিদর্শনও ছিল।[২০] সাম্প্রতিককালে মণিরতট, রায়দীঘি, কঙ্কণদীঘি, কুয়েমুড়ি, দিগম্বরপুর, মইপীঠ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে গুপ্তযুগের আরো কিছু মৃন্ময় ও প্রস্তর নির্মিত প্রত্ননিদর্শন। কঙ্কণদীঘি থেকে প্রাপ্ত উচ্চ ভ্রূযুক্ত এবং সুন্দর হাস্যময় মুখের একটি মৃণ্ময়ী দেবীমূর্তিকে সপ্তম-অষ্টম শতকের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বাংলার শিল্প কলার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। (Fig-13, KKNDGH-1/South Asian Studies-10)। খাড়ি থেকে পাওয়া একটি ভগ্ন টেরাকোটা দেবী মূর্তিকে সপ্তম শতকের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (Ibid,KHR-II) এছাড়া সামগ্রিক ভাবে মণিনদীর অববাহিকা, নালুয়া অঞ্চল, যৌখিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে গুপ্ত যুগের মুদ্রা, পটারী, মন্দিরের ভগ্নাংশ ইত্যাদি পাওয়া গেছে। পাথরপ্রতিমার গোবর্দ্ধনপুরে শ্লেট পাথরের যে একটি মাত্র বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গেছে যেটি স্ফিংসের (মিশরের) মত দেখতে, (ঠিক গলার কাছে ভগ্ন হওয়ায় মূর্তিটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে) তাতে সহজেই এটিকে গুপ্ত যুগের প্রথমদিকের বা গুপ্ত পূর্ব যুগের বিষ্ণু মূর্তি ফলক বলে চিহ্নিত করা যায়। ব্রজবল্লভপুর ও তটের বাজারের নিকট বৌদ্ধমূর্তি এবং গুপ্তযুগের স্বর্ণ মুদ্রাদি বেশ কয়েকটি পাওয়া গেছে। বাকী মূর্তির বেশীরভাগই কালোপাথরে তৈরী পাল-সেন যুগের। গোবর্দ্ধনপুরে গুপ্তযুগের পটারী ও টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া গেছে। সুন্দরবন থেকে প্রাপ্ত শ্লেট পাথরের একটি বিষ্ণুমূর্তি আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। মূর্তিটি তিনটি বাহু বিশিষ্ট। এটি সপ্তম শতকের বলে চিহ্নিত। এই মিউজিয়ামে রক্ষিত কাশীপুর থেকে কালিদাস দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত কালো কষ্টিপাথরের তৈরী সপ্তাশ্ব বাহিত অপূর্ব সুন্দর সূর্য মূর্তিটি সপ্তম শতাব্দীর বলে চিহ্নিত। বেহালা থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিটি কালো প্রস্তর নির্মিত। এটি গুপ্ত যুগের বলে চিহ্নিত হয়েছে। ব্যাসাল্ট পাথরের তৈরী লক্ষ্মী, সরস্বতী, ব্রহ্মা, শিবসহ বিষ্ণু বাসুদেব মূর্তিটি পাওয়া গেছে পাথরপ্রতিমা থানার শিব-গোবিন্দপুর থেকে, যেটি গুপ্তযুগের বলে চিহ্নিত। সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চলের Reserve Forest থেকে (১৯৯৫ খৃঃ) যুগ্ম-পদচিহ্ন-বেদী ও সূর্যমূর্তিসহ গুপ্তযুগের মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলি বর্তমানে বেহালার রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। আটঘরা থেকে প্রাপ্ত পটারী, মৃন্ময় মূর্তি, মিথুন ফলক ইত্যাদি গুপ্তযুগের বলে চিহ্নিত। এগুলি নিকটস্থ দমদমার ঢিবিতে নমুনা উৎখনন কালে সংগৃহীত হয়।[২১] বিড়াল, পুরন্দরপুর অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে ছোট ছোট কয়েকটি বৌদ্ধ তান্ত্রিকমূর্তি, পটারী ও পাত্রাদি যেগুলি গুপ্তযুগের বলে চিহ্নিত। বোড়ালে পাওয়া গেছে কতকগুলি স্ট্যাম্প, মস্তকবিহীন শঙ্কু আকৃতির এবং অলংকরণ যুক্ত কতকগুলি টেরাকোটা মূর্তি ও কিছু পটারী যেগুলি গুপ্তযুগের বলে চিহ্নিত। এছাড়াও ক্রীম রঙের বয়াম, নীচের দিক সরু কতকগুলি মৃৎপাত্র, বৈশিষ্ট্যহীন কানা ও সোজা গলার কয়েকটি মৃৎপাত্র, ইত্যাদি গুপ্তযুগের আরো কিছু নিদর্শনও এখানে পাওয়া গেছে।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার শুঙ্গ - কুষাণ - গুপ্ত বা পালযুগের কোন শিলালিপি বা তাম্রলিপি এ-পর্যন্ত না পাওয়া যাওয়ায় প্রশাসনিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃ সন্দেহ হওয়া যায় না। তবে অন্যত্র পাওয়া সমসাময়িক কয়েকটি তাম্রলিপি এবং কতকগুলি জৈন-বৌদ্ধ -সাহিত্য-

সাক্ষ্য থেকে এবং কালিদাসের রঘুবংশ থেকে অনুমান করা যায় যে গুপ্তযুগে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এই ভূ-খণ্ড গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর আর যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি আমরা পাই তাহল শাশাঙ্কের (৬০৬ - ৬৩৭ খৃঃ) কয়েকটি মুদ্রা যার মধ্যে একটি স্বর্ণ মুদ্রা ও দুটি রৌপ্য মুদ্রা পাথরপ্রতিমার উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জে রয়েছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ একটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে পাথরপ্রতিমা থানার মলয়া নামক গ্রামে। L. D. Barnett সম্পাদিত (মহারাজ জয়নাগের ৬৪৬-৬৫০ খৃঃ ?) তাম্রলিপি (EP. Ind, Vol-XVIII, 1925-26 এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় EP. Ind, Vol-XIX 1927-'28, P:286-287)। এই গুরুত্বপূর্ণ তাম্রলিপিটি থেকে বাংলায় জয়নাগের সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে (সম্ভবত ৬২৫খৃঃ মতান্তরে ৬৪৬-৪৭খৃঃ)। সমগ্র বাংলায় জয়নাগের মাত্র কয়েকটি মুদ্রাই পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে বারুইপুরের নবগ্রাম থেকে। রাস্তা তৈরীর সময় এটি পাওয়া গেছে। এটি এখন বারুইপুর সুন্দরবন সংগ্রহশালায় আছে। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার মলয়া এবং বারুইপুর মাত্র এই কয়েক কিমিঃ ব্যবধানের মধ্যে জয়নাগের একমাত্র তাম্রশাসন এবং তার স্বর্ণমুদ্রা প্রপ্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শশাঙ্কের তাম্রশাসন ইত্যাদি এ-জেলায় পাওয়া যায়নি। গুপ্তযুগের সমৃদ্ধ শিল্পরীতি ও শিল্প চর্চার নিদর্শন যেমন এ-জেলায় যথেষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, তেমনি খৃঃ সপ্তম-অষ্টম শতক বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক বৈশিষ্ট্যময় যুগ। শিল্প ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্যগুলিতে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। গাঙ্গেয় দক্ষিণ বঙ্গের এই সমৃদ্ধির পরিচয় নারী মূর্তিতে শুঙ্গ - কুষাণ আমলের পোড়ামাটির রূপবিন্যাসে, বেণীবন্ধনে এবং অলংকরণে পরিলক্ষিত হয়। গুপ্ত যুগকে শিল্পসমৃদ্ধির সুবর্ণযুগ বলা হয়। কেন্দ্রীয় আধিপত্য সত্ত্বেও বাংলার শাসন ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে অঞ্চলভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ আমরা শাসন ব্যবস্থায় ভুক্তি, বিষয় ইত্যাদি আঞ্চলিক বিভাগগুলির নাম পাই। বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, আমদানী - রপ্তানীকারক, বণিক, শিল্পগোষ্ঠী, কৃষক এবং সমাজ শিল্পীরা ধনাগমে সাহায্য করত। প্রচুর স্বর্ণ আমদানী হত, ফলে বাণিজ্যের সঙ্গে সুবর্ণ ও সুবর্ণ মুদ্রার একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। স্বর্ণ আমদানীর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল দক্ষিণ বাংলার উপকূলীয় সমুদ্র বন্দরগুলি যেগুলির মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার গঙ্গে, পলুরা, তিলোগ্রামম্ ইত্যাদির মত বন্দরগুলো হয়ত স্বনামে বা পরিবর্তিত কোন নামে তাদের গুরুত্ব বজায় রেখেছিল। গুজরাটের বন্দরগুলির স্থান ছিল সম্ভবত তার পরে।[২২] গুপ্ত পরবর্তী রাজারাও এই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বজায় রেখেছিলেন। শশাঙ্কের রাজত্বকালের পরেই সম্ভবত হর্ষবর্ধন (৬০৬ - ৬৪৭ খৃঃ) তাঁর (শশাঙ্কের) রাজ্য ও রাজধানী দখল করেন। এসময়ে সারা দক্ষিণ বাংলায় বিদ্রোহ এবং অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময়েই কর্ণসুবর্ণে মহারাজ জয়নাগের উত্থান ঘটেছিল। তিনি সম্ভবত ৬৫০খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। হিউয়েন সাঙের (৬৩০-৬৪৪ খৃঃ) বিবরণ থেকে জানা যায়, দক্ষিণবঙ্গে তৎকালে সমতট নামে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এই ভূ-ভাগ তখন সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এমনকি অন্য কোন স্বাধীন সামন্ত রাজ্যের অধীন হওয়াও সম্ভব। এ সময় গুপ্তবংশের শেষ রাজাগণের দুর্বলতার সুযোগে কনৌজের যশোবর্মন, তিব্বত, আসাম, কামরূপ, কাশ্মীরের

ও গুর্জরের রাজাগণ বারংবার বাংলা আক্রমণ করেন। এই অরাজক অবস্থার মধ্যে আনুমানিক ৭৫০ খৃঃ বাংলার গণ্যমান্য ব্যাক্তি (ও সামন্তরাজগণ) গোপাল নামে এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ঐ বংশের পালসম্রাট ধর্মপাল ও দেবপাল এক বিশাল পালসাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়েই দক্ষিণ বাংলার এই অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনা, আচার আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এ-জেলায় পালযুগ পর্যন্ত যে সমস্ত ধর্মীয় প্রত্ননিদর্শন ও মূর্তি ভাস্কর্য ইত্যাদি পাওয়া গেছে তাতে একই সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনার চিহ্ন পাওয়া যায়। স্বভাবতই মনে করা যেতে পারে যে ধর্মীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রশাসনিক উদারতা এবং গোঁড়ামি রোহিত ধর্মীয় মনোভাব মানবজীবনের অগ্রগতি ও শিল্পসমৃদ্ধির পরিপন্থী হয়ে ওঠেনি। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং সৌর ও ভাগবতীয় ধর্মের সহাবস্থান খৃঃপূঃ যুগ থেকেই এখানে পরিলক্ষিত হয়। কুষাণ যুগে বৌদ্ধধর্ম আরো ব্যাপকভাবে এখানে প্রসার লাভ করে। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও অন্যান্য ধর্মগুলির প্রসারের অন্তরায় ছিল না। সপ্তম শতকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বৈষ্ণব মতাবলম্বী রাজ বংশ এবং বৌদ্ধ মতাবলম্বী খড়গ বংশীয়রা রাজত্ব করতেন। সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনে এই সমস্ত ধর্মীয় প্রভাব কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। মহাযানী ও অন্যান্য তান্ত্রিক উপাসনা ইতিপূর্বেই এ অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করার মত। তারা, কালী, ত্রিপুরাসুন্দরী, চণ্ডী, উমামহেশ্বর, হরিহর, পর্ণশবরী ইত্যাদি মূর্তি নিদর্শনগুলি থেকে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এই সব ধর্মীয় পরিস্থিতির অনুধাবন করা যায়।

পালযুগ ঃ

দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় পালরাজাদের কোন তাম্রলিপি ইত্যাদি না পাওয়া গেলেও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রাপ্ত পালরাজদের তাম্রলিপিগুলি থেকে এ-অঞ্চলে পাল রাজাদের শাসন যে বলবৎ ছিল তা বোঝা যায়। এছাড়া দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বিভিন্নস্থান থেকে যে সমস্ত অনিন্দ্য সুন্দর অসংখ্য প্রস্তর ভাস্কর্য পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে, শক্তিশালী পালরাজাদের আমলে স্থিতিশীল, উন্নত শাসন ব্যবস্থা এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার ফলে গুপ্তোত্তর যুগের উন্নততর শিল্প-সৌকর্যের চরম বিকাশ ঘটেছিল। পালবংশীয় রাজারা প্রায় চারশো বছর ধরে শাসন করেন। এঁরা বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিলেন। শাসন ব্যবস্থায় তাঁরা গ্রামস্তর পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন। বৌদ্ধ মঠ-মন্দির নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বিষ্ণু, শিব, গণেশ এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ও স্থাপন করিয়েছিলেন। পাল রাজাদের সময়কার অনেকগুলি তাম্রলিপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে।[২৩] যেগুলি থেকে পাল সাম্রাজ্যের বিশালত্ব ও গৌরবময় যুগের কথা জানা যায়। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় এসময়ের বহু সংখ্যক প্রস্তর নির্মিত দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মূর্তিগুলির শিল্প সুষমা, গঠন নৈপুণ্য, অলংকরণ এবং মূর্তি নির্মাণের শাস্ত্রীয় মাপ-জোক অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করেছেন তৎকালের দক্ষ শিল্পীরা। শিল্প - ঘরানা যাই হোক না কেন মূর্তি ভাস্কর্যের মধ্যে সামগ্রিকভাবে পাল যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই নজরে আসে। যার ফলে পাল যুগের শিল্পকলার

সঙ্গে এ যুগের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালের শিল্পবৈশিষ্ট্যকে সহজেই আলাদা করা যায়। মূর্তি নির্মাণ, অলংকরণ, মূর্তির পাদপীঠ বা Basement, মূর্তিলক্ষণ, চালচিত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলংকরণ লক্ষ্য করার বিষয়। পালপূর্বযুগের মূর্তিগুলির মত এযুগের মূর্তিগুলি শুধুমাত্র পেশীবহুল ও দেহসর্বস্ব নয়। আবার পরবর্তী সেনযুগের মত মূর্তি ভাস্কর্যগুলি ক্ষীণতনু নয় এবং অলংকরণের তত বাহুল্যও নেই। Basement-র স্তর এবং কোণাগুলিরও পাথক্য রয়েছে।[২৪] দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় এ পর্যন্ত সংগৃহীত সবচেয়ে বেশীসংখ্যক প্রস্তর নির্মিত ছোট বড় মূর্তি পাল যুগের। যথাযথ প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্তির দুর্লভতার জন্য পাল পূর্ববর্তী যুগ পর্যন্ত প্রস্তর নির্মিত মূর্তির সংখ্যা সীমিত হলেও পাল যুগে এ জেলায় এত প্রস্তর মূর্তি কিভাবে নির্মিত হয়েছিল তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিশেষকরে মূল্যবান কালো কষ্টিপাথর, শক্ত কালো ব্যাসাল্টপাথর, নীলাভ মূল্যবান শক্তপাথর, অন্যান্য শক্ত কালোপাথর, লালচে বেলেপাথর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাদা মার্বেলপাথর এ-সমস্ত মূর্তি তৈরীর মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়াও ব্রোঞ্জের পালিশ করা মূর্তি ও অষ্টধাতুর মূর্তি এবং অন্যান্য মিশ্র ধাতুর মূল্যবান ও শিল্প সমৃদ্ধ মূর্তিও তৈরী হয়েছে। মূল্যবান পাথরের পুঁতিদানা, কাঁচ, হীরা, হাতির দাঁতের কাজ মৌর্য-শুঙ্গ যুগের মত এ সময়ের কিছু কিছু নিদর্শনও এ-জেলায় পাওয়া গেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত মৃন্ময় পাত্রাদি বহু প্রকারের এবং বহুসংখ্যক পাওয়া গেছে। কিছু সংখ্যক Ageless পটারী, টেরাকোটা মূর্তি ও Votive প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। প্রাকবঙ্গলিপির মৃন্ময় সীল ও Votive সীল বেশ কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। এ যুগের প্রচুর গৃহভিত্তি, ব্যবসা কেন্দ্র, মন্দির-মঠের ভগ্ন অবশেষ এ-জেলার বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। ব্যয়বহুল মূর্তি নির্মাণ, মন্দির তৈরী, দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, মঠাধ্যক্ষ ও ব্রাহ্মণ পূজারী নিয়োগ, তাদের ভরণপোষণ এবং পূজার জন্য দেবোত্তর স্বরূপ বিশাল জমি দান করা হত। এসব দেখে স্পষ্টতই মনে হয় যে, সাধারণ লোকের ধর্মীয় প্রবণতাকে রাষ্ট্রীয় স্তরে উৎসাহ দিয়ে কাজে লাগান হত। সম্ভবত একই সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রবণতা তৈরী করাও রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য ছিল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে একতাবদ্ধ রাখার এটি একটি প্রশাসনিক সার্থক ব্যবস্থা হিসাবে মনে করা যায়। খুব সম্ভবত সে কারণেই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা অন্তত পক্ষে স্থানীয় প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা ছিল বলে মনে হয়। যে কারণে এত ব্যয়বহুল মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠা করা গিয়েছিল। স্থানীয় প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই জলপথে ও স্থলপথে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে প্রস্তর খণ্ডাদি আনা সম্ভব হত। এছাড়া মূর্তি-শাস্ত্রজ্ঞ, দক্ষ মূর্তি নির্মাতা নিয়োগও এক কঠিন কাজ ছিল। তবে এটা ঠিক যে তৎকালে বাংলায় এরকম মূর্তি নির্মাণ শিল্পীর অভাব ছিল না। বঙ্গীয় শিল্পীদের মূর্তি নির্মাণ শৈলী ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পে একটি আলাদা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছিল। ধাতু এবং কারিগরী শিল্পে উন্নতিরও প্রমাণ পাওয়া যায়, এ-জেলায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি থেকে। পাথরপ্রতিমায় পাওয়া ধাতব (ব্রোঞ্জ) বুদ্ধমূর্তিটির মত মূর্তি নির্মাণের শিল্প কৌশল সুদূর প্রাচ্যের জাভা প্রভৃতি অঞ্চলের ধাতব মূর্তি নির্মাণে প্রতিফলিত হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় যত প্রস্তর মূর্তি উদ্ধার হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী হল বিষ্ণুমূর্তি। এছাড়া আছে বুদ্ধমূর্তি, জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি, হিন্দু - বৌদ্ধ মাতৃকা মূর্তি বা তান্ত্রিক মূর্তি, শিব লিঙ্গ (নানা প্রকারের), মুখ লিঙ্গ, শক্তি শিবলিঙ্গ, গণেশ মূর্তি, সূর্য মূর্তি, মঞ্জুশ্রী মূর্তি, বরাহ ও নৃসিংহ অবতার, দশাবতার বিষ্ণু মূর্তি ইত্যাদি। ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলির

মধ্যে চন্দ্রশেখর শিব, নানা দেবদেবীর মূর্তি, অম্বিকা মূর্তি, বারাহি মূর্তি, বুদ্ধ মূর্তি ও জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি ইত্যাদি। ছোট বড় অনেকগুলি বৌদ্ধ তান্ত্রিক মূর্তিও এ জেলায় পাওয়া গেছে। পাল যুগের মূর্তিগুলি প্রধানত এ জেলার সোনারপুর (বিষ্ণুমূর্তি), আটঘরা ও সীতাকুণ্ড (বিষ্ণুমূর্তি,বরাহ অবতার মূর্তি, নৃসিংহমূর্তি), নিহাটা (বিষ্ণুমূর্তি), কল্যাণপুর (যমুনা মূর্তি দ্বারবাজু, শিবলিঙ্গ), পুরন্দরপুর (বৌদ্ধ তান্ত্রিক মূর্তি), রামনগর (বিষ্ণু মূর্তি, অম্বিকা মূর্তি), জয়নগর থানা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের বিষ্ণু মূর্তি, গণেশ মূর্তি, সূর্য মূর্তি, নানা প্রকার ধাতব মূর্তি, বুদ্ধ মূর্তি, মথুরাপুর ও রায়দীঘি থানার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে খাড়ি - ছত্রভোগ, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, মাধবপুর, কাশীনগর, কঙ্কণদীঘি, জটা অঞ্চলে পাওয়া গেছে বিষ্ণুমূর্তি, সূর্য মূর্তি, নরসিংহ মূর্তি, উমামহেশ্বর মূর্তি, প্রাচীন শিবলিঙ্গ, চতুর্ভুজ শক্তি শিবলিঙ্গ, মুখলিঙ্গ, তারামূর্তি, ত্রিপুরাসুন্দরী, প্রস্তর-বীম, প্রস্তরলিংটাল, প্রচুর গৃহ, মন্দির ও মঠের ভিত্তি; কঙ্কণদীঘিতে প্রাপ্ত প্রচুর বৌদ্ধ মূর্তি, স্বর্ণালঙ্কার, জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি, গণেশ মূর্তি (ছত্রভোগ); মাধবপুরের বিখ্যাত সংকেতমাধব বিষ্ণুমূর্তি, কৃষ্ণচন্দ্রপুরের ব্রোঞ্জের দীপলক্ষ্মী; ভরতগড়, মইপীঠ ও বিরিঞ্চিবাড়ীর থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি; ভাঙড়ের মঞ্জুশ্রী মূর্তি, বিষ্ণু মূর্তি, বোলিবামনীর পার্শ্বনাথ মূর্তি, কাঁটাবেনিয়ার পার্শ্বনাথ মূর্তি, ঘাটেশ্বরার আদিনাথ মূর্তি;বাইশহাটার দুটি বৌদ্ধস্তূপ, জটার দেউল, বনশ্যামনগরের জটার মত রেখদেউলের ভগ্নাংশ; পাথরপ্রতিমার উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জের বিষ্ণুমূর্তি, দশাবতার মূর্তি, গণেশ মূর্তি, শত শিবলিঙ্গ, বরাহ মূর্তি এবং তটের বাজারের ভূ-নিম্নে সারি সারি অনেকগুলি মঠ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, সাগরের মন্দিরতলার মন্দির, বিষ্ণু মূর্তি, ধবলাটের বিষ্ণু মূর্তি,শ্বেত পাথরের জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি, ব্রোঞ্জের বৌদ্ধ মূর্তি, সাপখালির প্রস্তরের বিষ্ণুপদ বেদী, ইত্যাদি পাল যুগের বলে চিহ্নিত অসংখ্য নিদর্শন দেখা যায়।

লক্ষ্য করার মত বিষয় যে এই সময়ের শৈলীতে গঠিত তিন-চারটি বড় জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি পাওয়া গছে। বাইশহাটায় (২২°০৮'N, ৮৮°২৯' E) উৎখননে জানা যায় যে সেখানে একটি বৌদ্ধ বা জৈন মঠ ছিল এবং সংশ্লিষ্ট আর একটি ছিল বৌদ্ধ বিহার। ইতিপূর্বে ভাঙড়ের নিকটবর্তী খাসবালাণ্ডা নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারটির কথা বলেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। প্রায় ২৫০০ বছর আগে এখানে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা প্রজ্ঞাপারমিতা চর্চা ও শাস্ত্র অধ্যায়ন করতেন। অনেকের মতে জটার দেউল একটি বৌদ্ধ বা জৈন মন্দির। উড়িষ্যার রেখ মন্দিরের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান। ৩২ ফুট বর্গভূমি পঞ্চরথ ভিত্তিভূমির উপর প্রায় দশফুট প্রশস্ত অনেকগুলি শিরা যুক্ত রেখ দেউল সোজা প্রায় একশো ফুট উপরে উঠে গেছে। পুরুলিয়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে এটির স্থাপত্য সামঞ্জস্য থাকায় অনেকে এটিকে জৈন মন্দির বলেন। জটার দেউলের বৈশিষ্ট্য হল এর গর্ভগৃহে নীচের দিকে ৬ ফুট নেমে তবেই যাওয়া যায়। অভ্যন্তরভাগ ১০ ফুট ৯ ইঞ্চি x ১০ ফুট ৯ ইঞ্চি। ভিতরে প্রদীপ জ্বালানোর কুলুঙ্গী আছে। প্রবেশ পথের প্রায় ১৬ ফুট উঁচু ও ৯ ফুট চওড়া দরজাটি পূর্বমুখী। এককালে মন্দিরগাত্রে প্রচুর অলংকরণ ও কারুকার্য ছিল। মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে পড়ায় কালিদাস দত্তের প্রচেষ্টায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটিকে সংরক্ষণের আওতায় আনে এবং জীর্ণ ভগ্নোন্মুখ মন্দিরটির সংস্কারসাধন করা হয়। ফলে মন্দিরটি রক্ষা করতে গিয়ে মন্দির শিল্পের এবং গঠনরীতির হানি ঘটেছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের আগে গুপ্তধনের আশায় ইংরেজরা এটির শীর্ষ দেশে বসান প্রস্তরখণ্ডটি

অপসারণ করে। পরবর্তীকালে আরও দু'একজন ঐ একই কারণে এটির ক্ষতিসাধন করে। ১৮৭৫ খৃঃ জটার দেউলের নিকটবর্তী জঙ্গল হাসিলের সময় জমিদার দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী জটার প্রতিষ্ঠালিপি হিসাবে একটি তাম্রফলক উদ্ধার করেন। তাতে দেখা যায় যে মহারাজ জয়ন্তচন্দ্র এই মন্দিরটি বাংলা ৮৯৭ শকে বা ৯৭৫ খৃঃ নির্মাণ করিয়েছিলেন।[২৫] পরবর্তীকালে ঐ তাম্র-প্রতিষ্ঠালিপিটির আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। ডেপুটি কালেক্টার, ডায়মণ্ডহারবার এর একটি রিপোর্ট List of Ancient Monuments 1886,P.W.D.Dept in the Presidency Division, Page : 222 তে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে দেখা যায় যে এ সময়ে (খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দী) এইসব অঞ্চলে (সমতট) অনেক বৌদ্ধবিহার ছিল। সম্ভবত পাল যুগেও এমনকি জয়ন্তচন্দ্রের সময় পর্যন্ত সেই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। বাইশহাটার মত এ-জেলায় আরও অনেকগুলি মঠ বা মঠবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রের সঠিক পরিচয় জানা যায় না। তবে তিনি যে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এই ভূখণ্ডে অথবা এর নিকটবর্তী অঞ্চলে কোন রাজা (চন্দ্রবংশীয় ?) অথবা সামন্তরাজ ছিলেন তা বোঝা যায়। কয়েকটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে পূর্ববঙ্গে এই সময় চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করছিলেন। এছাড়া জটার ৬ মাইল দূরে দেলবাড়ীতে জটার দেউলের মত প্রায় ১৮ ফুট বর্গভূমির আভ্যন্তরীণ প্রায় ৭.২৩ ফুট বর্গ বিশিষ্ট একটি মন্দির ভগ্নাংশ আছে। এরও গর্ভগৃহ ৫ ফুট নীচে এবং পশ্চিমমুখী দরজাটি প্রায় ত্রিভূজাকৃতির এবং ৩.৫ ফুট চওড়া। জটার দেউলের দক্ষিণ পশ্চিমে ৩.২৫ ফুট চওড়া পূর্বমুখী দরজার ৫ ফুট বর্গভূমিতে আর একটি মন্দিরের কথা জানা যায়।

এই সময় দক্ষিণ চব্বিশপরগনার কোন অংশ কখন কোন রাজাদের দ্বারা শাসিত হত তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। পাল বংশের রাজারা বাংলায় সম্ভবত ১০৫৪ খৃঃ -এর পরে ক্ষমতাচ্যুত হন (নয়পাল ১০৩৮ - ৫৪ খৃঃ) অন্যদিকে বিজয়সেন আনুমানিক ১০৯৫ খৃঃ বাংলার সিংহাসনে আরোহন করে সেনবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দেখা যাচ্ছে যে ৯৭৫ খৃঃ জটার দেউল নির্মাণের সময় বাংলায় দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯৬০ - ৮৮ খৃঃ) রাজত্ব করছেন এবং তারপরে ৯৮৮ - ১০৩৮ খৃঃ পর্যন্ত তাঁর পুত্র মহীপাল বাংলার রাজা ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে পাল রাজাদের আরো তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় জানা যায় যে, মদনপাল (১১৪৩ - ৬১ খৃঃ) গোবিন্দপাল (১১৬১ - ৬৫ খৃঃ) এবং পলপাল (১১৬৫ - ১২০০ খৃঃ পর্যন্ত) রাজত্ব করেছিলেন। সম্ভবত এঁরা বিহারের ভাগলপুর অঞ্চলেই তাঁদের সংক্ষিপ্ত রাজ্যের সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে দেববংশ এবং চন্দ্রবংশে রাজত্ব করছিলেন।

অপরদিকে পাথরপ্রতিমার এফ প্লটের রাক্ষসখালিতে প্রাপ্ত ১১৭৮ শক বা ১১৯৬ খৃঃ প্রদত্ত মহারাজ ডোম্মনপাল নামক এক স্বাধীন রাজার একটি গ্রামদান বিষয়ক তাম্রশাসন পাওয়া যায়।[২৬] ডোম্মনপাল অযোধ্যা-আগত পাল পরিবারের কোন মহামাণ্ডলিক পুত্র ছিলেন এবং পূর্ব খাটিকা বা খাড়ি তাঁদের অধিকারে ছিল। দ্বারহাট নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে মহারাজ ডোম্মনপালদেব বামহিট্টা Va (Dh) amahitta নামক গ্রামখানি তাঁর বন্ধু শ্রীবাসুদেব শর্মাকে দান করেন।

অর্থাৎ মহারাজ লক্ষ্মণসেন তখন দক্ষিণ বাংলার রাজ্যশাসনে রয়েছেন (১১৭৯ - ১২০৬ খৃঃ)। কাজেই একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে দক্ষিণ চব্বিশপরগনা সহ সুন্দরবন অঞ্চল কেন্দ্রীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের শাসনাধীন হওয়া সত্ত্বেও খোদ পূর্ব খাটিকা বা খাড়ি অঞ্চলে স্বাধীনভাবে মহারাজাধিরাজ উপাধিসহ সামন্তরাজ ডোম্মনপাল রাজত্ব করছিলেন। বরাবরই দেখা যাচ্ছে যে মগধ, কর্ণ-সুবর্ণ বা গৌড় - র কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হয়েও দক্ষিণ চব্বিশপরগনা ভূখণ্ড বারবার বিদ্রোহী রাজাদের অধীনে অথবা প্রায় স্বাধীন করদ রাজ্য হিসাবে কেন্দ্রীয় শাসকের অধীনস্থ ছিল।

কুলপি (২২°৫'N/৮৮°১৫' E) তে কালো পাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি এবং অন্যান্য মূর্তি এবং করঞ্জলি, কাঁটা বেনিয়া, মলয়া (পাথরপ্রতিমা), চন্ডীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পালযুগের নানান মূর্তি, লিন্টাল ব্রোঞ্জ বেনুকৃষ্ণ (কাটানদীঘি) ইত্যাদি প্রচুর পাওয়া গেছে। বেশীরভাগই অবশ্য ১২শ - ১৩শ শতাব্দীর।

সেন যুগ ঃ

বিজয়সেন থেকে লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত (১০৯৫ - ১২০৬ খৃঃ) সেন রাজবংশ বাংলায় দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করলেও ১২০৬ খৃঃ তুর্কী আক্রমণের ফলে সেন রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটে। যদিও বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণের এই সব নদী খাড়ি অঞ্চল থেকে বিশ্বরূপ সেন (১২০৬ - ১২২৫ খৃঃ), কেশব সেন (১২২৫ - ২৮ খৃঃ) প্রভৃতি সেনবংশের রাজারা রাজত্ব করেছিলেন।

সেনযুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার আচারণ ও ধর্মকে কঠোরভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন ও প্রচলন করা। এই প্রথার বিষময় ফল আজও দক্ষিণবঙ্গের মানুষকে নির্যাতিত করে।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার অধিকাংশ মানুষই অব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠীর হওয়ায় সেনরাজারা দক্ষিণ চব্বিশপরগনার সুদূরতম অঞ্চলে মন্দির ধর্মস্থান ইত্যাদির প্রচলন করেন, ধর্মীয় শাসন কঠোরতর হয় এবং বহিরাগত শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণদের দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতেও বসতি স্থাপন করার জন্য নিষ্কর জমিজমা ও অর্থ-সম্পদ প্রদান করা হয়। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন[২৭] (তাঁর রাজত্বের ৬২ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত), লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসন (তাঁর রাজত্বের ২য় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত), বকুলতলা তাম্রশাসন[২৮] (তাঁর রাজ্যাঙ্কের ২য় বছরে প্রদত্ত) থেকে এই সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে, দক্ষিণ গোবিন্দপুর (সোনারপুর থানা) এবং বকুলতলায় (রায়দীঘি থানা) লক্ষ্মণসেনের দুটি তাম্রলিপি প্রাপ্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই তাম্রপত্র দুটি থেকে লক্ষ্মণসেনের (রাজধানী ও) সেনানিবাসস্থল বিক্রমপুরের নাম জানা যায় এবং এই গ্রাম দানকারী সনদ ঘোষণার জন্য তিনি তাঁর যুদ্ধ ও শান্তি রক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নারায়ণ দত্তকে নিয়োগ করেছিলেন। এই অঞ্চল যে তখন বর্দ্ধমানভুক্তি ও পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল তাও জানা যায় তাম্রশাসন থেকে। এছাড়া 'পুরাণ' নামক মুদ্রার প্রচলন যে তখন ছিল, তাও এতে উল্লিখিত হয়েছে।

লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রলিপিটি দক্ষিণ গোবিন্দপুরের (হেদো) পুকুর কাটার সময় ১৯১৯ সালে অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত হওয়ার পরই এটিকে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নিকট পাঠান হয় এবং তিনি এটিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় প্রদর্শন করেন। উভয় দিকে লেখা এই তাম্রশাসটির আয়তন ১৩.৫ ইঞ্চিx১২.৫ ইঞ্চি। এই তাম্রশাসনের তথ্যানুসারে প্রমাণ হয় যে বিড্ডারশাসন গ্রামটি জাহ্নবী বা আদিগঙ্গার পশ্চিমে বর্তমান বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটির শাসন নামক গ্রাম (রেলস্টেশনের নামও শাসন)।[২৯] এর উত্তরের গ্রামের নাম বলা হয়েছে ধর্মনগর যেটি বর্তমানে ধামনগর - ধোপাগাছি (বারুইপুর থানা) নামে পরিচিত।[৩০] তৎকালে এ অঞ্চলে যে সমস্ত কৃষিজ ফসল উৎপন্ন হত তার মধ্যে সুপারী, নারিকেল ইত্যাদির নামও এই তাম্রশাসনটি থেকে পাওয়া যায়। এই তাম্রঘোষণা পত্রটিও তাঁর যুদ্ধ ও শান্তিমন্ত্রী ও দূত নারায়ণ দত্তর উপস্থিতিতে প্রদান করা হয়। এই গ্রামখানির পশ্চিম দিকে একটি বিখ্যাত ডালিম বাগান ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে।

মৌর্য যুগ থেকেই কৃষিজমি ও কৃষকের উপর আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে কৃষকেরা বিশাল বিশাল জমিতে নিশ্চিন্ত মনে ফসল উৎপাদন করত। এমনকি যুদ্ধের সময়ও শত্রু সৈন্যরা কৃষিক্ষেত্র ও ফসলের কোন হানি ঘটাত না। পুষ্করিণী খনন ও অন্যান্য পরিসেবা, আপৎকালীন অবস্থায় খাদ্যশস্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে সাহায্য করা হত। কৃষকদের সু- সময়ে এই শস্য ফিরৎ দেওয়া চলত। নারকেল, সুপারী, মৎস্য, আম, কাঁঠাল, ডালিম ইত্যাদির চাষ হত। জয়নাগের তাম্রশাসন থেকে প্রচুর সর্ষে চাষের কথাও (?) জানা যায়। অন্যান্য ফল ফলাদিও প্রচুর চাষ হত। চাষীরা ক্ষেত্রবিশেষে এক - চতুর্থাংশ থেকে এক - দশমাংশ উৎপন্ন ফসল রাজকোষে কর হিসাবে জমা দিতে। বিশেষ জরুরী অবস্থায় রাজা অতিরিক্ত কর চাপাতেন। সাধারণভাবে কৃষিজমি দান, বিক্রয় করা হত না বা কৃষককে উৎখাত করা হত না।

লক্ষ্মণসেনের তাম্রলিপিগুলি থেকে দেখা যায়, যেসমস্ত ভূমি দান করা হচ্ছে তার কোনটিই কৃষিক্ষেত্র নয়। বাসযোগ্য উঁচু জমি, ফল-ফলাদির বাগান, পুষ্করিণী, নদী-নালা-খাড়ি, উর্বর-অনুর্বর জমি, তৃণভূমি ইত্যাদি জাতীয় জমিগুলিই ব্রাহ্মণ বসতি হিসাবে দান করা হত।

মৌর্য যুগ থেকে সেন যুগ পর্যন্ত 'বিষয়' ইত্যাদি প্রশাসনিক বিভাগের নাম পাওয়া যায়। পৌণ্ড্রবর্ধন এবং বর্ধমানভুক্তি নামে আলাদা দুটি ভুক্তির নাম পাওয়া যায় দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এই ভূ-খণ্ডে। গঙ্গা অর্থাৎ আদিগঙ্গার পশ্চিমপার্শ্বে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বর্ধমানভুক্তি এবং গঙ্গার পূর্বপার্শ্বে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত এই জেলা পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ভুক্তিগুলোকে কতকগুলি 'বিষয়ে' ভাগ করা হয়েছিল। 'বিষয়ের' অধীনে ছিল 'মণ্ডল'। কোন কোন স্থলে চারটি গ্রাম একত্রিতভাবে 'চতুরক' বলে একটি 'বিভাগের' সৃষ্টি করেছিল। অনেক পণ্ডিত আবার এই চতুরকের অন্যতর ব্যাখ্যাও করেছেন। খাড়িকে কখনও কখনও খাড়িবিষয় আবার কখনও কখনও খাড়িমণ্ডল বলা হয়েছে। আর একটি মণ্ডলের নামও পাওয়া যায় যেটি দক্ষিণ চব্বিশপরগনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল ডায়মণ্ডহারবারের দক্ষিণে ব্যাঘ্র অধ্যুষিত সুন্দরবন বনাঞ্চলকে বলা যায় যদিও এ বিষয়ে মতান্তর আছে। লক্ষ্মণসেনের বকুলতলা তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, খাড়িমণ্ডল, কান্তাল্লপুর - চতুরকের নাম পাই। বিজয় সেনের ব্যারাকপুর তাম্রলিপিতে (EP. Indica-Vol-XV, P-282) দক্ষিণ চব্বিশপরগনা সম্পর্কে

কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যেমন — পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, খাড়ি বিষয়ে, ঘাস সম্ভোগ ভাট্রবড়া গ্রামে চারটি পাটক দান করা হয়। আলোচ্য গ্রামটি খাড়ি বিষয়ে হওয়ায় এটি দক্ষিণ চব্বিশপরগনার গ্রাম খাড়িকেই বুঝিয়েছে। এখানেও সমতটীয় 'নলের' ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই অঞ্চলটি যে এককালে (এমনকি বিজয়সেনের সময়ও) সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। এই তাম্রশাসনে ধন সম্পদের মধ্যে আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারী ও ফলমূলাদির কথা বলা হয়েছে।

মুদ্রা ঃ

সেন বংশের লেখগুলি থেকে তৎকালে প্রচলিত অনেকগুলি মুদ্রার নাম পাওয়া যায়। পুরাণ, ধরণ ও কার্ষাপণ ইত্যাদি অন্যতম মুদ্রা ছিল। রূপা বা তামা দিয়ে পিটিয়ে বা ঢালাই করে এই পুরাণ মুদ্রাগুলি তৈরী করা হত। এগুলি চতুষ্কোণ বা গোল হত। এগুলিতে কোন লেখ থাকত না। গাছপালা, ফুল, সূর্য, পাহাড়, জ্যামিতিক নক্সা এগুলিতে অঙ্কিত থাকত। পাল ও সেন আমলে পূর্বতন যুগের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। দক্ষির চব্বিশপরগনায় পাল-সেন যুগের কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়নি। এই যুগগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাচুর্য থাকলেও বিনিময় প্রথা, স্বর্ণ এবং কড়ির ব্যবহার সমধিক হত। এই কড়ি সমুদ্রপথে মালদ্বীপ ও অন্যান্য স্থান থেকে আমদানী করা হত। শোনা যায় লক্ষ্মণসেন হাজার হাজার কর্ষাপণ বা কড়ি দান করতেন। ক্ষেত্রানুসন্ধানেও দেখা গেছে যে বারুইপুর থানার ধোপাগাছি, শাসন, জয়নগর থানার বিভিন্ন অঞ্চলে, পাথরপ্রতিমার উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ ও দাসপুর অঞ্চলের প্রত্নস্থলগুলিতে ছড়ান অথবা কলসী সমতে প্রচুর কড়ি পাওয়া গেছে। এছাড়া দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রায় সর্বত্রই এই কড়ি পাওয়া গেছে। মুদ্রা মান কম থাকায় সাধারণ মানুষের কাছে কড়ির ব্যবহার খুবই জনপ্রিয় ছিল। এমনকি পাল-সেন আমলের পরেও এই কড়ির ব্যবহার অনেকদিন চলেছিল।

মূর্তি ভাস্কর্য ঃ

সেন আমলের প্রচুর বিষ্ণুমূর্তি দক্ষিণ চব্বিশপরগনা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। বেশিরভাগ মূর্তিই অবশ্য দশম-একাদশ শতাব্দীর। এমনকি ভাঙড়ের মঞ্জুশ্রী মূর্তি, বোলবামনি, কাঁটাবেনিয়া ও ঘাটেশ্বরার জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলি, সাগর, উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জের কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি; সাগর, কঙ্কণদীঘি, পাথরপ্রতিমা, কৃষ্ণচন্দ্রপুরের ধাতব মূর্তিগুলি খৃঃ দশম-একাদশ শতাব্দীর বলে অনেকে মনে করেন। বোড়াল, আটঘরা, মাহিনগর এবং বাইশহাটার মঠবাড়ীর উৎখননে বেশ কয়েকটি স্তরে পাল-সেন যুগের মূর্তি ও বসতি চিহ্নের নিদর্শন পাওয়া গেছে। কঙ্কণদীঘি, সাগর, উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ, পাল-সেন যুগের কয়েকটি প্রধান নদী বন্দর ও বৈদেশিক বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ফলে এসব অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পন্ন লোকের জন্য, এমনকি বিদেশীদের জন্যও একই স্থানে নানা ধর্মীয় উপাসনালয়ের ভিত্তি ও মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও বিশেষভাবে সেনযুগের কয়েকটি প্রস্তর বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে বারুইপুরের শাঁখারীপুকুর থেকে পাওয়া বিদ্যাধরপুরের বিষ্ণুমূর্তি, কাকদ্বীপ, পাকুড়তলা, কুলপী, দূর্গাচক, খাড়ি-ছত্রভোগ প্রভৃতি অঞ্চলে। কিন্তু কাকদ্বীপের নৃসিংহ আশ্রমে যে সুন্দর নীলাভ পাথরের বিষ্ণুমূর্তিটি রয়েছে সেটি নিঃসন্দেহে পাল শিল্পকলাকে স্মরণ করায়। পাল-সেন যুগের পটারী, টেরাকোটা, বীড্‌স্ ইত্যাদি পাওয়া গেছে পূর্ব উল্লিখিত প্রত্নক্ষেত্রের অনেকগুলিতেই।

উপসংহার ঃ

আমাদের দুর্ভাগ্য যে পরবর্তীকালে তুর্কি আক্রমণের ফলে, ধর্মীয় উন্মাদনা ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের প্ররোচনায় এবং মগ, আরাকান, পর্তুগীজ জলদস্যুরা লুঠপাঠ, অগ্নিসংযোগের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির, দেবস্থানগুলো ধ্বংস করে এবং প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তিগুলোকে ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড করে। অনেক সময়েই প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে বিধর্মীদের হাত থেকে বাঁচাতে উপাসকরা নিজেরাই মূর্তিগুলিকে নিকটস্থ নদী, খাল-বিল, পুকুরে ফেলে দেয়। এরকম মূর্তিও মাটিকাটা বা পুকুর সংস্কারের সময় কিছু কিছু উদ্ধার করা গেছে।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রাচীনতা সম্পর্কে কয়েকটি সংক্ষেপিত মতবাদ উদ্ধৃত করা হল ঃ

"আপনার পৌণ্ড্র ও বর্ধমানভুক্তির সীমানা নির্দেশ দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি।"

— কালিদাস দত্তকে লিখিত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি।

"শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত সুন্দরবনের বহুস্থানে যে সকল পুরাকীর্তির চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে বর্তমান চব্বিশপরগনা জেলার দক্ষিণাংশেও গুপ্ত ও পাল যুগের বহু গ্রাম নগর বিদ্যমান ছিল।" *— ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ও ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ননীগোপাল মজুমদারের ভাষণের অংশবিশেষ।*

"Professor Debaprasad Ghosh aptly comments : Sundarban Provides us with another forgotton chapter of Indian history. Coins and inscriptions, large number of images and sculptures – Brahmanical, Buddhist and Jain, – in stone, terracotta, and bronze, beginning from the Kushan and Gupta Periods, representing some of the outstanding examples of Indian art and antiquity of unique variety, have been discovered in the process of reclamation of forests largely within a space of last 70 years. Ruins of habitations and temples including Jatar Deul, the loftiest in Bengal, at least one thousand years old, scattered through out the area often amidst impenetrable jungle and swamp still testify to the glory that was Sundarban." – *Amrita Bazar Patrika, 25-10-53.*

"The figures discovered at Harinarayanpur belong mostly to the Maurya, Sunga and Kushan Periods. Surface findings from Harinarayanpur are contemporary with the startling discoveries of Pandu Rajar Dhipi in Burdwan District."

– Census 1961, Vol-II, District Handbook, 24-Parganas, P : 21.

"In the Sundarbans portion of the 24-Parganas, in the course of the reclamation of the forest area, several brick built houses, tanks, buildings surrounded by moats had been discovered and that these went to prove that several centuries ago these tracts were the sites of populous villages which had been deserted probably in consequence of storm-waves and similar other providential visitations."

– Report of A. W. Paul, Sept. 1885, Collector of 24-Parganas to the D. G. Statistics, Govt. of India, Mr. W. W. Hunter.

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার ইতিহাস বিশেষত, তমসাচ্ছন্ন মৌর্যপূর্ব যুগের ইতিহাস আজ অনেকটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সামনে দাঁড়িয়ে আজ আমরা একথা বলতে পারি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে একথা প্রমাণ করতে গেলে প্রয়োজন আরও পরীক্ষা, নিরীক্ষা, গবেষণা এবং ব্যাপক বৈজ্ঞানিক উৎখনন। হরিনরায়ণপুর, দেউলপোতা, সাগর, আটঘরা, গোবর্দ্ধনপুর, উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ, বোড়াল ও তিলপীর মত সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলির আশু বৈজ্ঞানিক উৎখনন একান্তভাবে প্রয়োজন। নানা যুগের বসতিস্তর যুক্ত এই সমস্ত প্রত্নস্থল থেকে উৎখননের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাশ্মীয়, নবাশ্মীয় ও তাম্রশ্মীয় যুগের প্রচুর প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া যাবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। প্রত্ন উৎখননের ফলেই কেবলমাত্র সঠিকভাবে সেই আদিম যুগের ইতিহাসকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। কালিদাস দত্ত সংগ্রহ — পঃ বঃ রাজ্য সংগ্রহশালা, বেহালা।

২। প্রকাশ চন্দ্র মাইতি — "পশ্চিমবঙ্গ", পঃ বঃ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ১৪০৬, পৃঃ ৫৭, দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলা সংখ্যা।

৩। কৃষ্ণকালী মণ্ডল — দক্ষিণবঙ্গের নতুন প্রত্নস্থল, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ৭৯-৮৯। 'প্রস্তর যুগের অঙিনায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা' দক্ষিণ চব্বিশপরগনা বিস্মৃত অধ্যায়, পৃঃ ২০৭ - ২১৭।

৪। কৃষ্ণকালী মণ্ডল — দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বিস্মৃত অধ্যায়।
প্রকাশ চন্দ্র মাইতি — "পশ্চিমবঙ্গ", দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলা সংখ্যা, চৈত্রমাস ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ প্রস্তর যুগের আলোকে', পৃঃ ৫৯।

৫। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় —স্থানিক ইতিহাস ঃ চব্বিশ পরগনা, ২০০১, সম্পাদনা - গোকুল চন্দ্র দাস, সোনারপুর মহাবিদ্যালয়, 'আঞ্চলিক ইতিহাস - দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা', পৃঃ ৩৪-৩৫।

৬। পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত — প্রাগৈতিহাসিক বাংলা।

৭। কৃষ্ণকালী মণ্ডল — দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০২, পৃঃ ৭৫, ৭৮, ৮১ - ৮২।

৮। অতুল চন্দ্র ভৌমিক — দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ প্রত্নায়ুধ প্রাপ্তিস্থল ও পর্যালোচনা, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলা সংখ্যা, চৈত্রমাস, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৬।

৯। ডঃ অশোক দত্ত — ইতালীর ফোলিতে পৃথিবীর বৃহত্তম প্রত্নসম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গে তাম্রাশ্মীয় যুগ সম্বন্ধে পঠিত প্রবন্ধ, "বর্তমান", ১৯-১-১৯৯৭।

১০। অতুল সুর — বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃঃ ১২।

১১। Dr. Goutam Sengupta — Archaeology of Coastal Bengal, Ed : Ray & Salles, New Delhi & Lyon, International Seminar, New Delhi, Feb-28 – March 4, 1994.

১২। কৃষ্ণকালী মণ্ডল — দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বিস্মৃত অধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯৯, 'দক্ষিণ চব্বিশপরগনার জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম', পৃঃ ৫৩-৭২।
কৃষ্ণকালী মণ্ডল — দক্ষিণ চব্বিশপরগনার জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম, "পশ্চিমবঙ্গ", দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যা, চৈত্র ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১০৩-১১০।

১৩। জীতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী — পঞ্চোপাসনা।
১৪। কৃষ্ণকালী মণ্ডল — দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০২, পৃঃ ১০৩ — ১১৪।
Dr. J. N. Banerjee — Development of Hindu Iconography, Page :131, 145, 201, 202.
১৫। Rao — Hindu Iconography, Page : 237, 238.
কৃষ্ণকালী মণ্ডল — দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল, পৃঃ ১০৮
১৬। ড. গৌতম সেনগুপ্ত — আসন্ন প্রকাশিতব্য প্রবন্ধ, 'ওয়ারশিপ অফ ফুটপ্রিন্ট : নিউ এভিডেন্স ফ্রম এনসিয়েন্ট বেঙ্গল'। (Archaeology of Eastern India – CAST).
১৭। কৃষ্ণকালী মণ্ডল — দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল, পৃঃ ১১১-১১৪।
১৮। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — খরোষ্ঠী অ্যান্ড খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী ইনস্‌ক্রিপসান অফ্ বেঙ্গল, ২৫তম খণ্ড, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতা, ১৯৯০।
১৯। অমৃতবাজার পত্রিকা — ২৫শে অক্টোবর ১৯৫৩।
২০। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার অতীত — কালিদাস দত্ত, সম্পাদনা : ভট্টাচার্য ও মজুমদার।
২১। সুধীন দে — নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চল ও প্রত্ন উৎখনন পৃঃ ১৬-২০।
২২। কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় — বাংলার ভাস্কর্য, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৮-৫০।
২৩। ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার — পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১০-৩৩।
২৪। Dr. J. N. Banerjee — Development of Hindu Iconography, C.U., 1956.
২৫। কালিদাস দত্ত — প্রাগুক্ত;
২৬। Epigraphia Indica — Vol. XXVII, Page : 68 & Vol. XXX, Page : 42.
কৃষ্ণকালী মণ্ডল — দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ, কলকাতা, ১৯৯৭ এবং ঐ, ২য় সংস্করণ, ২০০১, পৃঃ ৫৯ - ৬২।
২৭। Epigraphia Indica — Vol. XV, Page : 278.
২৮। N. G. Majumdar — Inscriptions of Bengal, Vol. III, Chapter-IX, Page : 92, 93.
২৯। কালিদাস দত্ত — প্রাগুক্ত।
৩০। W. W. Hunter —A Statistical Account of Bengal, 1998 Edn, Page :116.
কালিদাস দত্ত — প্রাগুক্ত।
কৃষ্ণকালী মণ্ডল — দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৪১-৫৮।

***

চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার সমস্যা

চব্বিশ পরগনার ইতিহাস রচনার প্রয়াস খুব বেশীদিনের নয়। সুসংহত প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায় না। চব্বিশ পরগনার ইতিহাস যেহেতু আঞ্চলিক ইতিহাস তাই সরকারী প্রচেষ্টার আন্তরিকতা ও লক্ষ্যণীয় উদ্যোগ দেখা যায় না।

সাম্প্রতিককালে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জেলার ইতিহাস লেখা ও লেখানোর একটি উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। সেই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে মালদহ, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলার ইতিহাস লেখা বা লেখানো হয়েছে। 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় বিভিন্ন জেলার উপর বিশেষ ইতিহাস সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। কিন্তু চব্বিশ পরগনা জেলার উপর সেভাবে কাজ বিশেষ কিছু হয়নি। তবে বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে (চৈত্র - ১৪০৬)। এছাড়া প্রায় দুষ্প্রাপ্য W.W. Hunter-এর Statistical Account of 24 Parganas; Sundarbans; Annals of Bengal; District Gazetteer; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির গ্রন্থাদি সরকারী ব্যবস্থাপনায় পুনঃ প্রকাশিত হওয়ায় অন্তত অধুনিক যুগের ইতিহাসের কিছু উপাদান সহজলভ্য হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক যে প্রাচীন লিখিত গ্রন্থাদি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য আকর গ্রন্থাদি এবং বর্তমানকালের S.S.O' Malley-র Distirct Gazetteer, D.C. Sarkar, Dinesh Sen, B.C. Bhattacharya, রামগতি তর্কালঙ্কার, পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, কালিদাস দত্ত প্রমুখের লিখিত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি প্রায় পাওয়াই যায় না (ইতিমধ্যে কিছুটা সহজলভ্য হয়েছে)। আজকের যুগের বহু ব্যস্ত গবেষকদের পক্ষে কলকাতার জাতীয় পাঠাগারে বা এশিয়াটিক সোসাইটিতে এসে বিভিন্ন কারণে এসমস্ত বই না পেলে অযথা সময় ব্যয় হয়। আজকে ইন্টারনেটের যুগের গবেষক পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে ব'সে চব্বিশ পরগনার ইতিহাস লিখতে যে কেউ সচেষ্ট হতে চাইলে তার কাছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একঘরের মধ্যেই সব তথ্য সহজলভ্য হচ্ছে, আর এখানে তখন আধুনিক সুযোগের অভাব দেখে আমাদের কষ্ট হয় বইকি! (আর আমরা ক্ষেত্রানুসন্ধানী গবেষকগণ অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারার জন্য আক্ষেপ করি। এ বিষয়ে জেলার ইতিহাস সংগঠক ও ইতিহাস সমিতিগুলির সচেতন হওয়া প্রয়োজন।)

চব্বিশ পরগনার উপর সাম্প্রতিককালে যে লেখালিখি হচ্ছে তা অনেকটাই পরিকল্পনাবিহীন ও বিচ্ছিন্নভাবে। সুসংহত ও পরিকল্পনাপ্রসূত লেখার প্রভূত অভাব রয়েছে। সহযোগিতামূলক বিষয়ভিত্তিক লেখাই সুপ্রয়াস বলে গণ্য হবে।

এই আলোচনায় চব্বিশ পরগনা জেলার নিরিখে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার সমস্যাগুলি কি সেগুলি এবার একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। (এই আলোচনায় আমাদের সময়সীমা মোটামুটি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মধ্যযুগের সূচনা পর্যন্ত অর্থাৎ সেন রাজত্বকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। অবশ্যই সংক্ষেপে।)

মনে রাখা প্রয়োজন যে চব্বিশ পরগনা বলে যে অঞ্চলকে নিয়ে আমাদের আলোচনা সেই অঞ্চল বা বর্তমান দক্ষিণ বাংলার সেই ভূ-খণ্ডটির অস্তিত্ব এই নামে তখন ছিল না। চব্বিশ পরগনা নামের উৎপত্তি বা ধারণাটাই আলোচ্য কালের মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে

অর্থাৎ বেদ পুরাণের আমল থেকে আলেকজাণ্ডারের সময় পর্যন্ত এই অঞ্চল বঙ্গ, বগধ, পাতাল, রসাতল, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি, গঙ্গারিডি প্রভৃতি নানা নামের অঙ্গভূমি হিসাবে পরিচিত ছিল। আর এই জেলার ভূ-খণ্ডটি তখন সমুদ্রোপকূল, বনভূমি, নদীখাড়ীর দেশ, পলিমাটিরদেশ, ব-দ্বীপ অঞ্চল বলেও চিহ্নিত হত। এখানকার অধিবাসীদের চিহ্নিত করা হত নাগ, পক্ষী, দস্যু, দাস, গঙ্গারিডি, পৌণ্ড্র ইত্যাদি নানা নামে। অর্থাৎ এরা সবাই ছিল প্রাক্-আর্য গোষ্ঠীর লোক।

উল্লেখ পাই ঃ

ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১; ইসাঃ প্রজাস্তিস্রো ..... বঙ্গা মগধাশ্চের 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে যু ...'। মনু; রামায়ণ ঃ আদি—১০৩ অ, অযোধ্যা ১০ সঃ। ৩৭।৩৮;মহাভারতঃ সভা – ৩০। ২২-২৪; বন – ১২৪ অ।

পৌরাণিক যুগে প্রাক্ - আর্য হিসাবে এরা নানা গোষ্ঠীভুক্ত জনজাতির লোক ছিল। নানা পুরাণ ও রামায়ণ, মহাভারতে দেখি সাংখ্যাচার্য কপিলমুনির অবস্থিতির কথা এবং বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গাসাগরের কথা। আর প্রাক-আর্যদের দেশের এই সমস্ত তীর্থস্নানে আসা ও পবিত্র তীর্থস্থান করায় তখনকার বহিরাগত আর্যদের কাছেও কোন বাধা ছিল না বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হত না। একইসঙ্গে একথা বাল যায় যে তৎকালীন এই জেলাবাসী সুসভ্য প্রাক আর্যগণও তীর্থদর্শনে আর্যদের এখানে আসায় কোন বাধা দিত না। অর্থাৎ সেই বহু প্রাচীনকালেও এই অঞ্চলে যে এক শ্রেণীর সুসভ্য লোকের বাস ছিল তা বোঝা যায়। সারা ভারতের পাঁচটি প্রাচীন বনভূমির মধ্যে আঙ্গেরিয় বনভূমিটিও যে দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত তাও জানা যায়। ডঃ অতুল সুরের মতে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে তৎকালীন বাংলার যে এক গভীর যোগাযোগ রয়েছে তা এখানে প্রাপ্ত মূর্তি ও মৃৎশিল্প, খাদ্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন। মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা এবং তদানুসারী গ্রীক-রোমান লেখকদের গ্রন্থাবলী, টলেমির ভূগোল, পেরিপ্লাস গ্রন্থকারের ভ্রমণ ডায়েরী ইত্যাদিতে যে সমস্ত অঞ্চলের কথা পাই তার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের এই অঞ্চলকেও নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ অঞ্চলটির অবস্থান যে বহু প্রাচীন তার লিখিত বিবরণ কিছু পাওয়া যাচ্ছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রসঙ্গে চব্বিশ পরগনায় বৌদ্ধ প্রভাব, বালান্দা মহাবিহারের অবস্থিতির কথা এবং প্রজ্ঞাপারমিতা চর্চা, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও গ্রন্থাদি রচনা এবং সংকলনের কথা বলেছেন। সে সময় এ অঞ্চলের আপামর জনজীবন যে বৌদ্ধ-জৈন সংস্কৃতিতে পুষ্ট ছিল একথা জানা যায়। অবশ্য কৌমজাত আর একটি সভ্যতা তৎপূর্বে এবং সমকালে ছিল বলে মনে হয়।

এখানকার প্রচুর প্রত্ন নিদর্শন হাড়োয়া সংগ্রহশালায় রয়েছে। পরবর্তীকালে ধ্বংসের যুগের সময় বালান্দা মহাবিহারের মঞ্জুশ্রী মূর্তিটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেটিকে পরে ভাঙড় থেকে উদ্ধার করে আশুতোষ মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। এছাড়াও প্রাচীন জৈন বৌদ্ধ গ্রন্থাদি ও তন্ত্রশাস্ত্রগুলিতে বালান্দা বৌদ্ধবিহার, নদী সমুদ্রতীরবর্তী মঠ ও বিহারগুলির অবস্থানের কথা বলা হয়েছে।

বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে খাড়ির উল্লেখ ছাড়াও জাতকের কাহিনীতে সুন্দরবনের পরোক্ষ উল্লেখ দেখা যায়। হাতিয়াগড়ের একটি বৌদ্ধবিহারের কথাও জানা যায়। ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকেই এ অঞ্চলের প্রচুর আজীবিক জৈন ও বৌদ্ধ

জনজীবনের কথা জানতে পারি।

কোন অঞ্চলের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য কতকগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রয়োজন হয় প্রাচীন জনজীবন, তার ধারাবাহিকতা, জীবিকা, শিল্প ও কৃষি এবং সামগ্রিক সংস্কৃতি ও জীবনবোধের পর্যালোচনা। আদিম যুগের মানুষের ব্যবহৃত গুহা, বাসস্থান, অস্ত্র-শস্ত্র, জীবন জীবিকার চিহ্নাদি, নরকঙ্কাল, কৃষি, শিল্প নিদর্শন, দৈনন্দিন ব্যবহৃত পাত্র এবং তৎকালীন শিল্প নমুনা হল ইতিহাসের উপকরণ। আবার সেজন্য প্রয়োজন সেই অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ভূ-গঠন, বনভূমি, নদী, পর্বত ও সমুদ্র সান্নিধ্য, ভূ-জৈবিক পরিবর্তন এবং ভূমিস্তর গঠনের বিশ্লেষণ। নৃ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পাই জনগোষ্ঠী ও তাদের জীবন বিকাশের ধারা। একের পর এক সভ্যতার স্তর বিন্যাস সঞ্চিত হয় ভূ-অভ্যন্তরে।

সভ্যতার কাল নির্ণয় এবং প্রাচীনত্বের হদিশ বিজ্ঞানের কষ্ঠিপাথরে এইভাবে যাচাই করা সম্ভব। বর্তমান বনভূমি ও তার প্রাচীনত্ব, বাদাবন ও জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ বা লবণাম্বু উদ্ভিদ ও তার বৈশিষ্ঠ্য – এগুলির জীবন বিন্যাস ও পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক জানা প্রয়োজন। ম্যানগ্রোভ বনভূমির প্রাচীন ধারাবাহিকতার সঙ্গে বর্তমান ম্যানগ্রোভ বনভূমির বৃক্ষরাজির জাতিগত বৈচিত্র্য ও সাদৃশ্য লক্ষণের তুলনামূলক আলোচনায় প্রাচীন ইতিহাস সমৃদ্ধতর হয়। মাটির গঠন, কৃষি ও উদ্ভিদ, ভূ-প্রকৃতি, নদী-নালা এবং সমুদ্র সান্নিধ্য প্রভৃতি মানব সভ্যতার উত্তরণ ঘটায়। সঙ্গে সঙ্গে থাকে ভূ-অবনমন ও তজ্জনিত সমস্যা। এই সমস্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনার জন্য দরকার আধুনিককালের নানা বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা। C-14 Test – এদের অন্যতম। যদিও আমাদের মতো গবেষকদের কাছে এই Test করান একটি বিরাট সমস্যা। এছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে কাজে লাগান দরকার। যেমন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বা বোটানি, জীববিজ্ঞান, জৈব রসায়ণ বা Biochemistry । আর দরকার উন্নতমানের প্যালেন্টোলজি, Polen-test বা পরাগরেণু পরীক্ষা ইত্যাদি। এসব আমাদের কাছে প্রায় আকাশ কুসুম হয়েই রয়ে গেছে। সংখ্যাতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, লোক সংস্কৃতিবিদ্যা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের বিশেষজ্ঞের সাহায্যও প্রয়োজন হয়। তাছাড়া সাহায্যের প্রয়োজন হয় প্রাচীন লিপি বিশারদদের, পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের, প্রাচীন মূর্তি শিল্পরীতি বিশারদ, মন্দির ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ, কলাবিদ ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের। প্রয়োজন মুদ্রা ও ধাতু বিশেষজ্ঞদের। এছাড়া দরকার লোক সংস্কৃতি এবং আর্থ সমাজ ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের। এমনকি আনবিক শক্তি বিভাগ ও কম্পিউটারের সাহায্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থাৎ এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ইতিহাস লেখক ও সংগ্রাহকদের একটি সার্বিক জ্ঞান থাকতে হবে। আসলে বেশীরভাগ লেখক সংগ্রাহকই ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব বা লোকসংস্কৃতি গবেষক হিসাবে শেকড়ের সন্ধানে এগিয়ে আসেন দেশ ও জাতিকে ভালবেসে। এঁদের নিষ্ঠা, ভালবাসা, আগ্রহ, সাধনা ও একাগ্রতায় কোন খাদ নেই। জলে জঙ্গলে, মাঠে ঘাটেসুদূর সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রানুসন্ধান, পুরাবস্তু সংগ্রহ, প্রাচীন লোককথা, লোকগীতি, লোকসংস্কার ইত্যাদির সংগ্রহ, ইতিহাসের কাজে লাগে এমন বস্তু নিদর্শনের ছবি সংগ্রহ, মুদ্রা সংগ্রহ বা অন্যান্য সংগ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি প্রাথমিক স্তরের মহামূল্যবান কাজগুলি এঁরা করে থাকেন। বিশেষজ্ঞ ইতিহাসবিদ বিজ্ঞানী বা পুরাতাত্ত্বিকেরও বিজ্ঞান বিষয়ক ঐসব গুণাবলী বা শিক্ষাগুলির সবগুলি একত্রে থাকতে পারে না। সেজন্য আঞ্চলিক ইতিহাস অনুরাগীদের সঙ্গে পূর্বোক্ত বিভিন্ন বিষয়ের

বিশেষজ্ঞদের যোগাযোগ থাকতে হবে। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তা নেই বা থাকে না। তাই এঁদের তথ্য বিশ্লেষণ এবং লেখায় অনেক ফাঁক থেকে যেতে পারে।

বেড়াচাঁপা বা চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর, আবদালপুর প্রভৃতি স্থানে কিছু বৈজ্ঞানিক উৎখনন হয়েছে। এর মধ্যে বেড়াচাঁপার উৎখননের পরিধি ও পরিমাণ বেশী এবং প্রাপ্তিও শুধু বেশী নয়, সমভাবে তা বেশ গুরুত্বপূর্ণও বটে। এমনকি প্রাগৈতিহাসিক ও প্রস্তর যুগের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ নমুনাও পাওয়া গেছে। ইদানিং মাহিনগর, বোড়াল, বাইশহাটা, আটঘরার সামান্য উৎখননেও খুব গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও তথ্যাদি পাওয়া গেছে। কিন্তু দুঃখের কথা এগুলির বিশ্লেষিত রিপোর্টগুলি পাওয়া যায় না বা সহজলভ্য নয়। এমনকি নিদর্শনগুলি সরকারী সংগ্রহশালাগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় না। চব্বিশ পরগনার প্রত্ন ইতিহাসের প্রাণপুরুষ কালিদাস দত্ত সংগৃহীত ও দানকৃত প্রচুর মূর্তি ও নিদর্শনগুলির কিছু কিছু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা, রাজ্য সংগ্রহশালা বা ভারতীয় জাদুঘরে পাওয়া গেলেও সবগুলি দেখতে পাওয়া যায় না। কোন কোন সংগ্রহশালায় কিছু কিছু থাকলেও তার সঠিক পরিচিতি ইত্যাদি নেই। প্রসঙ্গত বলি, ঘাটেশ্বরা থেকে প্রাপ্ত কালিদাস দত্ত কর্তৃক আশুতোষ সংগ্রহশালায় দানকৃত প্রাচীন জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের (আদিনাথের অন্যত্র প্রাপ্ত) মূর্তিটি দেখা যায় না। অন্যত্রও তাঁর দানকৃত সব নিদর্শন নেই।

দিলীপ মৈত্রের চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা, স্বর্গত এম.এ. জব্বার সাহেবের হাড়োয়ার বালান্দা সংগ্রহশালা, নরোত্তম হালদারের গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র সংগ্রহশালা, দীনবন্ধু নস্করের খাড়ি সংগ্রহশালা, বিষ্ণুপুরের ডঃ তুলসী ভট্টাচার্যের সংগ্রহশালা, জয়নগরের কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা, বিমল চক্রবর্তীর কয়েন মিউজিয়াম, বারুইপুরের সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা, রামনগর কালিদাস দত্তস্মৃতি সংগ্রহশালা, সাগরের অনিল খাঁড়া ও জগন্নাথ মাইতির সংগ্রহশালা কাশিনগরের সুন্দরবন সংগ্রহশালা প্রভৃতি অনেকগুলি সংগ্রহশালা এ জেলার ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানকারীদের বেশ কিছু কাজে লাগলেও সংগ্রহশালায় রক্ষিত সমস্ত জিনিষগুলির সঠিক পরিচিতি ও বয়স বিষয়ে আরো বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন রয়েছে। এই সংগ্রহশালাগুলিতে সমগ্র চব্বিশপরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার অনেক উপাদান পাওয়া গেছে। যেমন প্রাচীন যুগের প্রস্তরের ও হাড়ের অস্ত্রশস্ত্র থেকে মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ যুগের নানা নিদর্শন এবং পাল সেন যুগ পর্যন্ত নানা ব্যবহৃত নিদর্শন ছাড়াও মুদ্রা ও মূর্তি প্রাপ্তিতে; শিলালিপি ও তাম্রলিপিগুলিতে এ অঞ্চলের প্রাচীনত্বের হদিস মেলে। তাছাড়া যুগ অনুযায়ী বহু প্রত্ন সামগ্রী এসব স্থানে থাকলেও ইতিহাস ধারাবাহিকতায় তাদের ভাগ করা শক্ত। এখানে Chance Finding-এ প্রাপ্ত বহু নিদর্শন রয়েছে। পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, শিকারের অস্ত্রশস্ত্র, হাড়ের বঁড়শী এবং সেলাই ও ফুটো করার যন্ত্রাদি, ছেদক অস্ত্র, চাঁচক ও বাটালী, ফ্লিন্ট পাথরের নানা প্রকার অস্ত্র, তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড, চিত্রিত প্রাচীন পটারী, বিভিন্ন যুগের ইট, নিত্য ব্যবহার্য পাত্রাদি, হাঁড়ি, কুঁড়ি, মাটির খেলনা, হাতি, ঘোড়া, মেষ, বৃষ, বিভিন্ন তীর্থঙ্করের ছোট বড় মাটির ও প্রস্তর নির্মিত মূর্তি, নানাপ্রকার বুদ্ধমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি, মঞ্জুশ্রী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, নৃত্যরত বিষ্ণু, নৃত্যরত গণেশ, মুখলিঙ্গ, প্রচুর শিবলিঙ্গ, দ্বিহস্ত বিশিষ্ট বা ষষ্ঠ, অষ্ট হস্ত বিশিষ্ট দেবীমূর্তি ও শক্তিমূর্তি। নানাপ্রকার মাতৃকা মূর্তি, বিভিন্ন ভঙ্গীমায় বহু সালাংকারা যক্ষিণী মূর্তি, বহু যন্ত্রমূর্তি, নানা নামে বৌদ্ধ তারা মূর্তি, বহু জৈন-বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবী মূর্তি, বিশালাক্ষী, ধর্মঠাকুর, পর্ণশবরী প্রভৃতি দেবীর প্রস্তর

মূর্তি ও পোড়ামাটির মূর্তি এবং নানাপ্রকার রৌপ্য, স্বর্ণ, তাম্রমুদ্রা, পাঞ্চমার্ক তাম্রমুদ্রা প্রস্তর ও মৃন্ময় বিড়স্ ইত্যাদি আলোচ্য সময়কার ইতিহাসের বহু উপযুক্ত উপকরণ এই সংগ্রহশালাগুলিতে সংরক্ষিত রয়েছে। যদিও সেই প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কালে যথাযথভাবে পৌঁছনোর মত সাধনা ও নিষ্ঠার এবং সুযোগের অভাব রয়েছে। সৌখিন মজদুরী এখানে কার্যকরী নয়। আবার Context নেই বলে উড়িয়ে দেওয়াও যাবে না।

প্রাচীন ইতিহাস লিখতে প্রাচীন পুঁথির গুরুত্ব অনেক। কিন্তু কিছু কিছু শেষ মধ্যযুগীয় পুঁথি পাওয়া গেলেও খুব প্রচীন পুঁথির অভাব রয়েছে। বৈদেশিক বেশ কিছু লেখকের ও পর্যটকদের লেখায় নিম্নবঙ্গ সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের উপাদান রয়েছে। সেগুলোকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ও নিষ্ঠা সহকারে বিচার বিশ্লেষণ করে চব্বিশ পরগনার ইতিহাস রচনায় কাজে লাগাতে হবে। নানা তথ্যের ভিত্তিতে এ অঞ্চলের প্রাচীনত্বের কথাটা সঠিকভাবে একটি তুলনামূলক আলোচনা সাপেক্ষে কাজে লাগানো প্রয়োজন। G.S.I., রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালা, মেট্রোরেল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিমধ্যে সংগৃহীত তথ্যাদিও এই ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। একটু চেষ্টা করলে অবশ্য এগুলো পাওয়া সম্ভব।

এ-জেলার ইতিহাস আলোচনায় নৃতত্ত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অপরিসীম। যদিও এক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি আছে এবং যদিও নৃতাত্ত্বিক এই ঘাটতির কারণও আছে। এ অঞ্চল থেকে এ পর্যন্ত কোন প্রত্ন প্রাচীন নরকঙ্কাল বা নরদেহের ফসিল বা আধা ফসিল পাওয়া যায়নি। সে কারণেই প্রস্তরযুগীয় বা নবপ্রস্তরযুগীয় মানুষের ব্যবহৃত কিছু প্রস্তর বা অস্থি আয়ুধ পাওয়া গেলেও এখানে যে প্রস্তরযুগীয় মানুষের অবির্ভাব ঘটেছিল তা স্বীকার করতে অনেক পণ্ডিতই রাজী হন না। তাছাড়া ঐ Context এর ব্যাপারটা আছে। দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর থেকে যে সমস্ত প্রস্তরায়ুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এখানকার বালি ও মৃত্তিকা পরীক্ষায় যে সমস্ত চিহ্ন ধরা পড়েছে তাতে এ জেলায় প্রস্তর যুগের আবির্ভাব অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া হরিনারায়ণপুর থেকে প্রাপ্ত প্রায় বানর মনুষ্যাকৃতি করোটিটির বয়স প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ বছর বলে জানা গেছে। অনেক ভূ-তাত্ত্বিক রিপোর্টে এবং ONGC র Report -এ, এখানকার মাটির গভীরে প্রাচীন গণ্ডোয়ানা রেঞ্জের পাথরের অবস্থিতি রয়েছে বলে উল্লিখিত হয়েছে। এই পর্যালোচনায় এ অঞ্চলের বারংবার ভূ-অবনমনের কথাটা মনে রাখা অবশ্য প্রয়োজন।

আবার নৃ-বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেছেন যে এ অঞ্চলের মাটিতে অধিক পরিমাণে লবণের অস্তিত্ব থাকার কারণে মনুষ্য কঙ্কালের ফসিল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কেননা মাটির ৩০ – ৪০ ফুট নীচে থেকে পাওয়া হরিণের শিং ও মাথা, মহিষের বুকের হাড়, সামুদ্রিক ঝিনুক, ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের কাণ্ড ইত্যাদিগুলি পরীক্ষার পর তাদের বয়স ৫০০০ – ৮০০০০ বছর বলে জানা যায় (লেখকের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্মৃত অধ্যায় পুস্তক দ্রষ্টব্য)। আবার গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্রে রক্ষিত হাতি / গণ্ডারের হাড়; খাড়ি ও গোবর্ধনপুর সংগ্রহশালায় রক্ষিত জলহস্তী, হস্তী ও গণ্ডারের হাড়, মাথা, চোয়াল ও প্রস্তরীভূত দাঁত প্রমাণ করে যে এগুলি ২০০০ - ১১০০০ বছরের প্রাচীন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে মানুষ্যদেহের ফসিল না পাওয়ার কারণ লবণই শুধু নয়, ভূ-অবনমন এবং সঠিক বৈজ্ঞানিক উৎখনন ও পর্যবেক্ষণের অভাবেই ভূ-নিম্নস্থ তেমন কিছু থাকলেও তা পাওয়া যাচ্ছে না।

নৃতাত্ত্বিক রিজলের এ-অঞ্চলের মানুষের ওপর আলোচনা যে ভুল তা তো নৃ-তাত্ত্বিকেরা এবং ইতিহাসবিদ্‌রা বলেছেন। তাছাড়াও ডঃ বি.এস. গুহ প্রমুখ নৃ-বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ-অঞ্চলের মানুষের শিকড়ের সন্ধান যা করেছেন তাও আংশিক সত্য মাত্র কেননা যে মানুষেরা তাঁদের গবেষণার আওতায় ছিল তারা এ অঞ্চলের আদি মানব গোষ্ঠীর কতখানি প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল তা বলা খুবই মুস্কিল। সেখানেও সমস্যা – সেই প্রাচীন মানব কঙ্কাল প্রাপ্তির। আধুনিককালের জিন টেস্ট করলেও হয়ত দেখা যাবে যে ফলাফল সেই একই অর্থাৎ এই অঞ্চলের মানবগোষ্ঠী এক মিশ্র অস্ট্রোদ্রাবিড়িয়ান জাতির অংশ বিশেষ। বর্তমান জনগোষ্ঠী বড়জোর ১০০০ বছরের প্রতিনিধিত্ব করে। তাছাড়া সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দারা মাত্র ২০০ বছরে কম-বেশী সময়ের। পূর্ব-বাংলা, মেদিনীপুর এবং বিহার, মধ্যপ্রদেশের লোক এরা। কাজেই নৃ-তাত্ত্বিক আলোচনার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সমস্ত সমস্যা মেটাতে বিপরীতপক্ষে যেসব উপকরণের দরকার তা হল এই অঞ্চলের পুরাতন লোক-সংস্কৃতির ব্যাপক সংগ্রহ, অনুসন্ধান এবং বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিসিদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা। আজকের দিনে সেটিও ইতিহাসের উপকরণ এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা লোক-সংস্কার ও লোক-সংস্কৃতি প্রাচীন জনজীবনের ধারাবাহিকতা বহন করে চলে।

আগেই বলা হয়েছে যে প্রাচীন লেখা পুঁথিগুলির অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে গেছে। যাও বা আছে তা খুব প্রাচীন নয় – হয়ত বা দুই-তিনশত বছরের। অনেকেই তা হাত ছাড়া করতে চান না। আর যাওবা পাওয়া যায় তা পাঠের লোকের অভাব অনুভূত হয় ভীষণভাবে। আমাদের সৌভাগ্যের কথা যে আমরা আমাদের জেলায় প্রাচীন বাংলা পুঁথি বিশেষজ্ঞ ৯১ বছর বয়স্ক পণ্ডিত অক্ষয় কুমার কয়াল মহাশয়কে এখনো সক্রিয় অবস্থায় পাচ্ছি। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, প্রাকৃত প্রভৃতি লেখ ও শিলালিপি পাঠের জন্য এবং পোড়ামাটির প্রাক্-বঙ্গলিপি, প্রাকবঙ্গলিপির ফলক, সীল ও ব্যবসায়িক লেনদেন ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ কলকাতায় রয়েছেন। যাঁদের মধ্যে অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সূর্যসম; কিন্তু হাতের কাছে কেউ নেই।

সমস্যাগুলির আরো গভীরে প্রবেশ করা যাক। প্রাগৈতিহাসিক কাল তথা প্রস্তর যুগ থেকে যে সূত্র বা নিদর্শনগুলি পাই তা যে যথাযথ নয় তা আমরা বলেছি। কিন্তু যুগ অনুযায়ী স্তর বিভাগক্রমে আমরা নিদর্শনগুলি পাইনা; ফলে বিশেষজ্ঞ আলোচনায় কদাচিৎ যুগ চিহ্নগুলি দেখানো হলেও সেগুলো যথাযথ নয়, মাঝে মাঝেই অনেক সূত্র লুপ্ত রয়েছে। এই লোপ পেয়ে যাওয়া ফাঁকগুলো সহসা ভরাট করা যাচ্ছে না। তার ফলে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। মাটির পাললিক গঠন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড় ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, ভূ-অবনমন, রাজনৈতিক অথবা রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদ বা বিবর্তন, ধর্মীয় বিরোধ, বিদেশী আক্রমণ, ধ্বংসকার্য, শত্রু ভয়ে বা ধর্মনাশ আশঙ্কায় ধ্বংসকার্য, অজ্ঞতা ও অসচেতনতা ইত্যাদি কারণে এই সব মিসিং লিঙ্কগুলি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নদী মাতৃক জেলা চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবন। অসংখ্য নদী, উপনদী, শাখা নদী জালের মত বিছিয়ে রয়েছে। এ অঞ্চলের মানবজীবনের সভ্যতা, সংস্কৃতি, উন্নতির ইতিহাস, তার জোয়ারভাঁটা, উত্থানপতন আর হাজা মজার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রাচীন পরিবহন, ব্যবসা, বাণিজ্য ও সংস্কৃতি নদীনির্ভর। কাজেই নদীর গতি পরিবর্তন ও নদীর প্রবাহ মজে হেজে গেলে

সভ্যতাটারই অবলুপ্তি ঘটবে। সে সভ্যতার চিহ্ন আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে মজে যাওয়া বর্তমান নদী-খাত বা তার তীরবর্তী অঞ্চল প্রাচীন সভ্যতা থেকে বহুদূরে রয়ে গেছে – হয়ত বা মনুষ্য দৃষ্টির আড়ালে। এ সব সমস্যার কথাও আমাদের ভাবতে হবে। যাতায়াতও একটি সমস্যা।

এতক্ষণ আলোচনায় যেটা বলা হল তা হল সঠিক তথ্যের অভাব এবং প্রত্ন নিদর্শন বা ইতিহাস উপকরণগুলি প্রাপ্তির সমস্যা। আর পাওয়া গেলেও তার সঠিক ব্যাখ্যার অভাব বরাবরই থেকে যাচ্ছে। এর ফলেই সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস রচনায় তাই এ জেলা এখনো খুব বেশীদূর এগুতে পারেনি।

এরপরে আসে তথ্য বিকৃতি ও তথ্য বিভ্রান্তির কথা। কোন প্রাচীন নিদর্শন বা অসাধারণ কোন মূর্তি, মুদ্রা বা শিল্পকর্ম অথবা অজ্ঞাত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোন নিদর্শন পাওয়ার বা আবিষ্কৃত হওয়ার উত্তেজনায়, আনন্দে বা আবেগে অনেক গুণী মানুষও তথ্য বিকৃতি ঘটান। অনেক সময় যুক্তিটা তাৎক্ষণিকভাবে ঠিক হলেও সত্য। যদিও প্রকৃত সত্য তার থেকে অনেক দূরেই থেকে যায়। কেউ কেউ অপরের আবিষ্কারকে নিজের বলে চালিয়ে দেন। এক্ষেত্রে আবিষ্কারক এবং ব্যাখ্যাকার ভিন্ন লোক হন। কেউ কেউ গবেষণার নামে একস্থানের নিদর্শন অন্য স্থানের বলে থাকেন। এক অঞ্চলের উপকরণ অন্য অঞ্চলের বলে লেখা হচ্ছে। আবিষ্কার ও গবেষণার কৃতিত্ব দেখানোই এর উদ্দেশ্য।

আবার যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা গবেষক বা লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ তাঁর কাছে কোন নিদর্শন গেলে তিনি স্বভাবতই তাঁর লাইনেই এর ব্যাখ্যা দেন। এর ফলে একই নিদর্শন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছে বিভিন্ন ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হয়। তা হোক। কিন্তু ইতিহাস বিঘ্নিত হল।

চব্বিশপরগনা সুন্দরবনের লোকায়ত জীবন আদি কৌম ও বৌদ্ধ-জৈন সংস্কৃতি পুষ্ট। আবার বৌদ্ধ জৈন মূর্তিগুলির Iconographical পার্থক্যগুলি ও দেবদেবীগুলিকে সবাই জানেন না – সেজন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেসব মূর্তিকে বৌদ্ধমূর্তি বলে নির্দেশ করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে জৈন বিশেষজ্ঞগণ অনেক বৌদ্ধমূর্তিকে যুক্তিজালে আবদ্ধ করে জৈনমূর্তি বলেছেন। পরিচিত মূর্তিগুলির ক্ষেত্রে এগুলি হয় না– কিন্তু ব্যতিক্রমী মূর্তিগুলির ক্ষেত্রে এ বিভ্রম থেকেই যাচ্ছে।

আঞ্চলিকভাবে স্থানীয় প্রত্নসংগ্রাহকদের সঙ্গে বহিরাগতদের Chance Finding এ পাওয়া প্রত্ন নিদর্শন, মূর্তি, মুদ্রা, পটারী ইত্যাদি পাওয়া বা সংগ্রহ করা নিয়ে ছায়া যুদ্ধ চলে আসছে। স্থানীয় সংগ্রাহকদের কাছে থাকলে আমাদের মত আঞ্চলিক ইতিহাসকারদের দেখা ও তথ্য সংগ্রহের সুবিধা হয়। কিন্তু বহিরাগত বিশেষ করে কলকাতা, দিল্লি, জয়পুর ইত্যাদি স্থানের সংগ্রাহকদের টিকির নাগাল আমরা পাই না। তাছাড়া সারা জেলায় এমনভাবে এদের জাল বিছানো আছে যে প্রাচীন কোন মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী পাওয়া মাত্র বহু টাকার বিনিময়ে এগুলি বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় সংগ্রাহকদের অর্থবল বা লোকবল কিছুই নেই। সামগ্রিকভাবে জেলার ইতিহাসের ক্ষতি হচ্ছে। আরও আশঙ্কার কথা কালিদাস দত্ত মহাশয়ের সময় থেকেই বোঝা গেছে যে সমগ্র জেলা প্রত্ন-চোরাকারবারীদের কব্জায় চলে গেছে। সাম্প্রতিককালে বহু মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী এদেরই কৌশলে বাইরে চলে গেছে। এর মধ্যে বোলিবামনী (বারুইপুর থানা) গ্রামের মহামূল্যবান কালো ব্যাসাল্টপাথরের জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তিটি, মাধবপুরের

(রায়দীঘি থানা) নীলমাধব নামে বিষ্ণুমূর্তি, পুরকাইতচকের শক্তি শিব লিঙ্গটি, ঘাটেশ্বরার অপর ২টি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি, শিবকালীনগরের (কাকদ্বীপ) অষ্টধাতুর বিশালাক্ষী মূর্তি চোরাশিকারীদের দ্বারা অপহৃত হয়ে গেছে। হয়ত দেখা যাবে এগুলি আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন বা জার্মানির কোন সংগ্রহশালায় বা কোন ধনীর বৈঠকখানায় শোভা পাচ্ছে। দেখা যাবে এইসব প্রত্নসামগ্রীর ভিত্তিতে গবেষণাধর্মী ইতিহাস লেখা হচ্ছে। অবশ্য তা লিখলে ভবিষ্যতে কিছু কাজ হবে কিন্তু শোভা বাড়ানোর এন্টিক হিসাবে থাকলে ইতিহাসের কোন প্রয়োজনে লাগে না। আজও আমরা দেখতে পাই ব্রিটেন, জার্মানী থেকে বাংলা পুঁথি আসছে অক্ষয় কয়াল মহাশয়ের কাছে পাঠোদ্ধারের জন্য। অনুশোচনার শেষ নেই। মানুষের মধ্যে প্রত্ন-ইতিহাস সচেতনতার অভাব এবং দারুন সরকারী শৈথিল্যের দরুন দেশের ইতিহাস আজ চুরি হয়ে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলার আছে। সাধারণভাবে আঞ্চলিক ইতিহাসকাররা জেলার উৎকৃষ্ট প্রত্নসমৃদ্ধ অঞ্চলে গেলে কোন নিদর্শন দেখতে পাবেন না। স্থানীয় লোকেরাও মুখ খোলে না – কেন না তারা চেনে পয়সা, 'লেখক' 'ইতিহাস' এসব অর্থহীন শব্দ মাত্র। আবার একশ্রেণীর নকল কারবারীদের সন্ধান পাওয়া যায় – বিশেষ করে চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে। এরা প্রায় একইরকম দেখতে পোড়ামাটির নকল মূর্তি, যক্ষ, যক্ষিণী, খেলনা, পুতুল ইত্যাদি অত্যন্ত সাবধানে পর্যটকদের দেখায় এবং আসল মূর্তি বলে অনেক 'নকল' চালান করে দেয়। এব্যপারেও সতর্ক থাকা দরকার।

ক্ষেত্রানুসন্ধানে যথাযথ বয়স্ক, ইতিহাস বা প্রত্ন-সংস্কৃতি সচেতন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এসব নদী খাল অঞ্চলে যাতায়াত এক বিরাট সমস্যা ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার; তারপরও সচেতন মানুষের অভাবে বিড়ম্বনা লেগেই আছে। ঠাকুরঘরের প্রত্ন মূর্তিটির ছবি তুলতে দিতে রাজী হন না অনেকেই। পুঁথিগুলি অনেক ক্ষেত্রে ঠাকুরঘরে তেল-জল-সিঁদুরে নষ্ট হয়ে গেছে বা যাচ্ছে তাও কেউ হাতছাড়া করতে চান না। এগুলির জন্য অনেক সময় দামও চান প্রচুর। মন্দির বা ঠাকুরঘরের মূর্তিটির ছবি যদিও বা তুলতে দেন কিন্তু ফুল, মালা অবরণ বস্ত্রাদি বিমোচন করতে কিছুতেই চান না – ফলে মূর্তির সঠিক পরিচয়, বয়স ইত্যাদি নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। আবার কোন কোন সংগ্রাহক মূল্যবান কোন মূর্তি বা স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা অত্যন্ত গোপনে রেখে দেন – ফলে ইতিহাস বিঘ্নিত হয়। তাঁদের এই না দেখানোর পেছনে হয়ত এই কারণ থাকে যে এগুলি লেখা হলে প্রচারের আলোয় আসবে ফলে তাঁদের অর্থ-স্বার্থে বা সংরক্ষণে অসুবিধা হবে। আবার অন্যদিকে ঐ পুরাবস্তুর বিষয়ে লেখা হলে বা ছবি ছাপা হলে সেটি তিনি অন্যত্র বিক্রি করতে পারেবেন না। সেটিকে রেখে দিতেই হবে। সব সংগ্রাহকই তো নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক নন!

আগেই বলেছি, চব্বিশ পরগনার প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি অনেক মূল্যবান উপকরণ যোগাতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ বিভ্রান্তিও আছে। যেমন পীর গোরাচাঁদ, দক্ষিণ রায়, বনবিবি, বড়খাঁগাজী, মোবারক গাজী ইত্যাদি বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি, লোকগাথা ও পালাগানে যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর উপকরণের সমাবেশ দেখা যায়। পালাগান ও লোকগাথাগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের লেখা এবং প্রায় প্রত্যেকেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দিয়ে তথ্য পরিবেশন করেছেন। আবার বিশেষজ্ঞগণের কেউ কেউ এঁদের মানুষ, ধর্মপ্রচারক, পীর, যোদ্ধা, সামন্তরাজা ইত্যাদি বলেছেন। কারোর অভিমত – এরা কল্পিত দেবতা। এছাড়া সমসাময়িক

শাসকদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে, তাঁদের সময়কালের অন্যান্য ঘটনা ও পরিস্থিতির সঙ্গে তার মিল নেই। মদন রায়, প্রতাপাদিত্য নিয়েও বিভ্রান্তি আছে।

অন্যদিকে চব্বিশ পরগনা জেলার প্রেক্ষাপটে সরকারী বেসরকারী সংগ্রহশালাগুলিতে রক্ষিত মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্ত যুগ থেকে পাল-সেন যুগ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রত্ন-উপাদান পাওয়া যাচ্ছে তাদের পুনর্মূল্যায়ণ ও পর্যালোচনা দরকার। তাছাড়া প্রাপ্ত প্রস্তরলিপি, তাম্রলিপি, লিপিফলক এবং পোড়ামাটির লিপিফলক ও সীলগুলিকে যথাযথ প্রেক্ষাপট বিচার বিশ্লেষণ করলে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান মিলতে পারে। ফলে জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার অনেক সমস্যা মিটতে পারে। আর এ ব্যাপারে আমরা পূর্বের মতই সহানুভূতিশীল অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ গৌতম সেনগুপ্ত, ডঃ প্রণব কুমার নস্কর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের উদার সহানুভূতি, উৎসাহ ও সাহায্য পাবো বলেই আশা করি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় জাদুঘর, এশিয়াটিক সোসাইটি, রাজ্য প্রত্ন বিভাগ তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন বলেই আশা রাখি।

পুরাতত্ত্ব, পুরাবস্তু ও ইতিহাস সচেতনতা সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের মতই জাগ্রত করার সঠিক প্রয়াস ও প্রচার চালাতে হবে। জেলার প্রত্নবস্তু ও লোকসংস্কৃতিকে সংরক্ষণের আওতায় আনতে বাস্তব প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ছাত্রাবস্থা থেকে প্রত্ন-ইতিহাস মনস্কতা গড়ে তুলতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত প্রত্ন সংগ্রহশালাগুলিতে ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া আবশ্যিক হওয়া দরকার। সংগ্রহশালাগুলিকে তদুপযুক্ত ব্যবস্থা করতে ক্যাটালগ তৈরি, প্রদর্শনী কক্ষের সুব্যবস্থা করা, নাম, যুগ, সংগ্রহস্থল ইত্যাদির পরিচয় সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। সংগ্রহশালাগুলির পরিবেশ ও আলোর উন্নত ব্যবস্থার প্রয়োজন। জেলার প্রত্নসামগ্রী যাতে বাইরে চলে না যায় তার জন্য আশু ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

সর্বশেষ বলি আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহে অনেক সমস্যা আছে — থাকবেও। তার মধ্যেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আর, ইতিহাসের শেষ কথা বলে কিছু নেই। নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে এবং প্রত্ন ও অন্যান্য নিদর্শন হাতে আসার ফলে এবং তাদের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে যে সব তথ্য হাতে আসবে তাতে ইতিহাসের আজকের ধারণার বা আপাত সত্যটি পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে যেতেই পারে। কাজেই সমস্যা আছে বলে বিভ্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই — একনিষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠ সাধনাই ঐতিহাসিক সত্যকে সার্থকভাবে প্রকাশিত করবে বলে বিশ্বাস করি।

— o —

চব্বিশপরগনার স্থানিক ইতিহাস, এপ্রিল ২০০১, সোনারপুর মহাবিদ্যালয়

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার মন্দিরশিল্প

ভূমিকা ঃ

ভৌগোলিক পরিবেশে জেলাটি সমুদ্র উপকূলীয় নিম্নভূমি। দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটায় পুষ্ট মাকড়সার জালের ন্যায় পরিব্যপ্ত বহু নদী খাড়িতে ভরা ম্যানগ্রোভ বনভূমি অধ্যুষিত সুন্দরবন অরণ্যাঞ্চল। এই সুন্দরবন অঞ্চলের ক্রমক্ষীয়মান সংরক্ষিত অভয়ারণ্য ও মনুষ্যবসতি অঞ্চলকে নদী ও সাগরের তীব্র লবণাক্ত জল থেকে বাঁচাতে বেশ কিছু কৃত্রিম উঁচু উঁচু বাঁধ তৈরী করা হয়েছে। জেলার উত্তরাংশ আদিগঙ্গা, পিয়ালী, বিদ্যাধরী, হুগলী ইত্যাদি গঙ্গার কয়েকটি নিম্নশাখার জলধারায় পুষ্ট হত। বর্তমানে ভাগীরথী গঙ্গার মূলশাখা আদিগঙ্গা প্রায় মৃত। একমাত্র কাটানো গঙ্গা-হুগলী এই জেলার পশ্চিম সীমা নির্দেশ করে প্রবাহিত হচ্ছে। এটিকে মূলত সরস্বতী-রূপনারায়ণ-দামোদরের মিলিত দক্ষিণ শাখার অবশেষ বলা চলে। কিন্তু নবাবী আমলে আদি গঙ্গা বা মূল গঙ্গার স্রোত থেকে একটি খাল কেটে ঐ মরা নদীর সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়ার ফলে আদিগঙ্গা দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং হুগলী ধারা প্রবল হয়ে ওঠে।

আদিগঙ্গা ভিত্তিক সভ্যতা ঃ

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন নদী ভিত্তিক সভ্যতাগুলির মত বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশপরগনা অঞ্চলে প্রাচীন জনপদ ও উন্নত নগর সভ্যতার নিশ্চিত উপস্থিতি নজরে পড়ে প্রায় মৃত এই আদিগঙ্গা ও তার বহু শাখা বিধৌত নদী কূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে। এমনকি সমুদ্রোকূলবর্তী অঞ্চলে বহু জাহাজ ঘাট ও বাণিজ্য বন্দর গড়ে উঠেছিল, পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌ-বাণিজ্যের প্রয়োজনে। কারণ আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার বাণিজ্যই জনবসতি ও উন্নত শিল্পনগরী এবং গ্রাম-সভ্যতার জন্ম দেয়; ধর্ম ও সংস্কৃতি নানা সভ্য মানুষের এবং সভ্যজগতের সংমিশ্রণ ঘটায়। দক্ষিণ বাংলায় আদিগঙ্গা, পিয়ালী-বিদ্যাধরী, সরস্বতী-দামোদর-রূপনারায়ণ ইত্যাদি নৌবহ নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত এইসব নদী মোহনাগুলির নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে খৃঃ পূঃ শতকগুলি থেকে অনেকগুলি সুউন্নত জনপদ ছিল। জৈনবৌদ্ধ ধর্মীয় এবং প্রাচীন ভাগবতীয় ধর্মমতের একটা প্রবাহ এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছিল। এই ধারাকে আমরা মৌর্য, গুপ্ত, পাল সেন যুগ পর্যন্ত জৈনবৌদ্ধ তান্ত্রিক এবং পঞ্চোপাসনাসহ নানা ধর্মীয় ধারার পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে দেখি। তৎপরবর্তী কালের ধারায় আমরা তুর্কী বা ইসলামী প্রভাব, চৈতন্যপ্রভাব, শাক্ত প্রভাব এবং পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ্য করি।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় এইসব ধর্মীয় প্রভাবই মঠ মন্দির নির্মাণে মুখ্য প্রেরণা যোগায়। সে কারণেই দেখি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় মঠ মন্দির, বিহার, উপাসনাগার ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার মন্দিরশিল্প ও মন্দির নির্মাণ পরিকল্পনা ঃ

যে কোন মন্দির নির্মাণেই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে — থাকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য। আর এই উদ্দেশ্য সাধারণত এককেন্দ্রিক হলেও বহুত্বব্যঞ্জক হয়ে থাকে। মঠ-মন্দির নির্মাণ তাই বহু কারণের উপর নির্ভরশীল। কাঁচামাটির মন্দির ও বাঁশ কাঠের মন্দির ছাড়া পাকামন্দির নির্মাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিন্তা করতে হয় ঃ

১) বিশেষ বিশেষ ধর্ম ও উপাসনা রীতি, পদ্ধতি এবং প্রেরণা

২) ঐ বিশেষ ধর্মের একটি বিশেষ সংঘবদ্ধ জনসংখ্যা বা জনগোষ্ঠী
৩) আর্থিক সঙ্গতি ও পৃষ্ঠপোষকতা
৪) মঠ বা মন্দির নির্মাণে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ
৫) রাষ্ট্রীয় ধর্ম ও ধর্মবিষয়ে উদারতা এবং ধর্মীয় অনুশাসনের বাধ্যবাধকতা
৬) মঠ বা মন্দির পরিচালনা ও পূজা অর্চনা বিষয়ে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সৃষ্টির আগাম প্রচেষ্টা
৭) মঠাধ্যক্ষ বা মন্দিরের পুরোহিতের নিয়োগ ও তার নির্দেশ
৮) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা সংঘগত উদ্যোগ
৯) উপাস্য কোন্ দেবতার প্রতিষ্ঠা হবে; পরিকল্পিত মন্দিরে সেজন্য দরকার একটি শাস্ত্রীয় দেবদেবীর মূর্তির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার অগ্রিম পরিকল্পনা
১০) ঐ মূর্তি নির্মাণ-শিল্পীর অনুসন্ধান ও নির্বাচন এবং মূর্তি নির্মাণে ব্যবহৃত উপাদান যথা মাটি, কাঠ, পাথর, ধাতু বা অন্য কিছু মাধ্যম নির্দিষ্ট করা
১১) মন্দির শৈলীর পরিকল্পনা এবং তদুপযুক্ত উন্মুক্ত ও প্রশস্ত স্থান নির্বাচন এবং সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান
১২) পুষ্করিণী ও কূপ খনন, বৃক্ষরোপণ, ফুল ও ফলের বাগান তৈরী, পুরোহিত-আবাস বা বিহার নির্মাণ
১৩) মন্দির নির্মাণে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে সেটির স্থায়িত্বের পরিকল্পনা
১৪) মন্দিরের স্থায়িত্ব বিষয়ে উপযুক্ত ও দক্ষ বাস্তুকার, মন্দির শিল্পী, দক্ষ ও অদক্ষ উপযুক্ত কারিগরদল, সূত্রধর ও মৃৎশিল্পীর অনুসন্ধান
১৫) মন্দির তৈরীর উপযুক্ত উপাদান, যথা ঃ মাটি, বাঁশ, কাঠ, ইট, পাথর, ধাতু ইত্যাদির যোগান
১৬) মন্দিরগাত্র বা বহির্দেশ এবং অভ্যন্তরীণ অংশের শিল্প পরিকল্পনা এবং সুষমা সৃষ্টির সমৃদ্ধকরণ বিষয়ে পরিকল্পনা।

মন্দিরের সঠিক ধারণা ঃ

বাস্তব দৃষ্টিতে উপাদানগুলি যাইহোক, একটি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আধ্যাত্মিক ভাবধারা দেবালয় স্থাপনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। দ্বিধাহীন নিশ্চিত একটি চেতনা দেবালয় স্থাপনের পবিত্র ধারণাকে বর্দ্ধিত করে। দেবকল্পনার পবিত্র ভাবধারায় পুষ্ট হয় দেবালয় ধারণা। তাই উপাদান তথা ইট, কাঠ, পাথরে গড়া ব্যঞ্জনাময় ভাষার রূপক হল দেবালয়। দেবমন্দিরের চূড়া যেন তার গগনস্পর্শী আধ্যাত্মিক জীবনধারায় ঈশ্বরের অন্তহীন সীমারেখার অভিব্যক্তির মূর্ত রূপকল্পনা। মানুষের হৃদয়ে পরিপুষ্ট যে দেবতা, দেবালয় বা মন্দিরের হৃদয়ে তথা মন্দির অভ্যন্তরে বা গর্ভগৃহে স্থাপিত হয় সেই মূল দেবতার দর্শনধারী দিব্য মূর্তি। তাই দেবালয় বা স্থাপিত দেবমন্দির মানুষের হৃদয়েরই মূর্ত আবেগ।

আমরা জানি 'This human body is the Temple of God'। ভারতীয়রা বিশ্বাস করে

আত্মা এবং ঈশ্বর অভিন্ন এবং ঈশ্বরের মত আত্মাও অমর (?)। সেই ঈশ্বররূপী অদৃশ্য আত্মাকে বাস্তবায়িত করতে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে দেবতার দিব্যমূর্তিকে। এই প্রতিষ্ঠিত 'দেবতা-হৃদয়' যা দেহ বা অবয়বরূপ মন্দিরের অভ্যন্তরে বিরাজ করে। 'মন্দির' মনুষ্যদেহের একটি কাল্পনিক কিন্তু বাস্তবায়িত বাহ্যিক রূপ। এজন্যই মন্দিরের গঠন প্রক্রিয়ায় নিম্ন থেকে শীর্ষ পর্যন্ত নানা মানবিক প্রত্যঙ্গগত নামকরণ করা হয়। যেমন পাদ, বাড়, মস্তক বা শীর্ষ ইত্যাদি। আবার এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই আমরা কাল্পনিক স্বর্গনিবাসী দেবলোকের সঙ্গে মনুষ্যলোকের বা মর্ত্যের যোগাযোগ গড়ে তুলতে চেয়েছি। স্বর্গ ও মর্ত্যের ভেদাভেদ মুছে দিতে চেয়েছি। মন্দিরশীর্ষ তাই 'বিমান' নামে চিহ্নিত। এই বিমান হচ্ছে আকাশের অন্তহীনতাকে কল্পনার জগত থেকে বাস্তব নৈকট্যে নামিয়ে আনার সার্থক প্রয়াস। উর্ধ্ব, গগনের অন্তস্থলে কোথাও যদি স্বর্গ থাকে তাহল 'বিমান'; মন্দির শীর্ষের মাধ্যমে তার যোগাযোগ অবশ্যম্ভাবী। মন্দিরের এই শীর্ষ বা চূড়ার সার্থকতা এখানেই।

মন্দির যুগে যুগে ঃ

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় আমরা দেখি যে প্রায় পাঁচহাজার বছর আগের এক উন্নত নাগর সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন। পোড়ামাটির ইটে তৈরী বাসস্থান, সুউচ্চ প্রাসাদ, চওড়া চওড়া রাস্তাঘাট, মাটির নীচের পয়ঃপ্রণালী, ভোজনাগার, পানশালা, স্নানাগার, রন্ধনশালা, কবর, দুর্গ, বাঁধ ইত্যাদির স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন। হরপ্পা সভ্যতায় দেবমূর্তি মৃন্ময় ফলকে দেখা যায়। কিন্তু সঠিকভাবে জানা যায় না যে মন্দিরে রেখে দেবতার পূজা হত কিনা।

আর্য বা বৈদিক যুগে মন্দির ছিল না। যজ্ঞের অগ্নিতেই দেবকল্পনা করা হত। তাদের কাছে আদিত্য, সূর্য, ঊষা, অগ্নি, সরস্বতী, বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদি নামে প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা প্রাধান্য পেত। তারা গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি এবং মন্দির নির্মাণ বিষয়ে জ্ঞাত ছিল না। স্থানীয় নাগ, অসুর, পক্ষী, দ্রাবিড় ইত্যাদি জাতির প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার সঙ্গে আর্য সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটে। খৃষ্টপূর্ব সময়েই ভারতের প্রায় সব অংশে এই আর্য ও স্থানীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের মিশ্রণ ও মেলবন্ধন ঘটে। সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনে, জীবন দর্শনে, ধর্মে ও দর্শনে এবং সংস্কৃতিতে বিপুল সংঘাত সত্ত্বেও এক মিশ্র সংস্কৃতি ও শিল্প মিলনের সমৃদ্ধধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে পৌরাণিক যুগ হয়ে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগগুলিতে। এই ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শিল্পবোধের সম্মিলিত প্রবাহধারা সমকালীন মানুষকে মন্দির স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্প রচনায় নিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করেছে।

মন্দিরের ধারণা সম্ভবত পৌরাণিক পরবর্তী যুগে। 'গৃহ' শিল্পের প্রচলন হলেও দেবমন্দির সম্বন্ধে ধারণা অনেক পরে এসেছে। সম্ভবত চৈত্য বা সমাধি ও স্তূপ মন্দিরেরই প্রবর্তন হয়েছিল প্রথম দিকে। রামায়ণ-মহাভারতের বর্তমান রূপ পরিগ্রহণের বহু আগে 'মানব-ধর্মশাস্ত্র'-এ মূর্তিপূজা এবং মন্দিরের কোন উল্লেখ নেই। কেননা মনু স্বয়ং ব্রাহ্মণকে 'সামগ্রিক' হতে বলেছেন —ব্রাহ্মণের বেদ গান ব্যতীত মন্দিরে দেবার্চনা করা নিষিদ্ধ ছিল।

মন্দির শিল্প কি ঃ

এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে মন্দিরশিল্প বলতে আমরা যা বুঝি তাকে মোটামুটি

তিনটিভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

১) মন্দিরের স্থাপত্য শিল্প বা মূল মন্দিরটির আকৃতি বা গঠন

২) মন্দিরের বহিরঙ্গের শিল্প সুষমা অর্থাৎ মন্দিরের বাহিরের অংশে প্লাস্টার বা প্লাস্টার পরবর্তী সময়ে দৃষ্টিনন্দনভাবে চিত্রিত, খোদিত, রেখিত বা ফলকায়িতকরণ

৩) মন্দির অভ্যন্তরের মূল দেবতার মূর্তি ভাস্কর্য - তার সুঠাম গঠন, কাষ্ঠ, প্রস্তর, মৃত্তিকা, ধাতু বা অন্য কিছু দিয়ে তৈরী, যা মানুষকে আকর্ষণ ক'রে ভক্তি রসার্দ্র ও শ্রদ্ধা প্রণত ক'রে তুলবে।

মন্দিরশিল্প ঃ

দেবমন্দিরের দৈর্ঘ প্রস্থ উচ্চতা, ভিত্তি, দেওয়ালের ঘনত্ব, চাতাল, দরজা, আঙ্গিক, বৈচিত্র্য, গাত্রাভরণ, শৈলী, পাদপীঠ, জাঙ্ঘ, মধ্য-অংশ, চূড়া, শীর্ষ ইত্যাদি স্থাপত্য রীতি–বৈচিত্র্যের অঙ্গ এবং মূর্তিভাস্কর্য ও বহিরাভরণ – সব কিছুই নির্ভর করে ইতিপূর্বে উল্লিখিত কারণগুলিসহ মূল তিনটি বিষয়ের উপর। তাহল অঢেল অর্থ, উপযুক্ত স্থাপত্য বিশারদ এবং ঐ স্থাপত্য বিশারদের পরিকল্পনা যথাযথ রূপায়ণে সক্ষম হাতে কলমে কাজ করা শিল্পী বা মিস্ত্রী (Mason) অর্থাৎ একাজ করতে গেলে একান্তভাবে প্রয়োজন দক্ষ রাজমিস্ত্রীর, যার সুনিপুণ অভিজ্ঞতা স্থাপত্য বিশারদের কাজকে সঠিক মাত্রায় পূর্ণতা এনে দেবে। সঙ্গে চাই একদল দক্ষ সাহায্যকারী। এই সবকিছুর সমন্বয়ে একটি দেবমন্দির যা সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে মানুষকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

পৃষ্ঠপোষকতা ঃ

দেবমন্দির যেহেতু ধর্মীয় উপাসনাক্ষেত্র, তা হিন্দু জৈন বৌদ্ধ মঠ মন্দির, মসজিদ বা গীর্জা যাই হোক না কেন তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হয় বহু অর্থের। তাই এগুলিকে ব্যক্তিগত ধর্ম আচরণকারীর একক প্রেরণায় না হয়ে প্রায়শই অর্থবান, জমিদার, সামন্তরাজা, রাজা বা সম্রাটদের দ্বারাই নির্মিত হয়েছে। অনেক সময় ধর্মভাবনা বা ধর্মচেতনার কথা প্রচারিত হলেও এইসব জমিদার, রাজা তথা সম্রাটদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে ধর্মীয় আফিমে মদত দিয়ে শাসন ব্যবস্থার প্রতি প্রজাগণকে সহনীয়ভাবে রাজশক্তির বা প্রভুত্ববাদের আওতায় আনা এবং এইভাবে (প্রতারিত করে) পূজা পার্বণ থেকে পাওয়া অর্থে (কর না বসিয়েও) রাজকোষ পূরণ করা। মৌর্য আমল থেকে রাজকোষে অতিরিক্ত অর্থাগমের উপায় হিসাবে মন্দির নির্মাণ এবং দেব মন্দিরের অর্থে কোষাগার পূরণ করাকে অর্থশাস্ত্রের নির্দেশ হিসাবে গ্রাহ্য রীতি বলে মান্যতা প্রাপ্ত হয়ে আসছে। মৌর্যযুগে ভারতে মন্দির স্থাপনের প্রচলন যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুরনির্মাণ পদ্ধতির, স্থাপত্যের এবং চারুশিল্পের প্রাথমিক আভাষ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে এবং তৎপরবর্তীকালে গৃহে বা সামাজিক ধর্মীয় উৎসবে আর্যানুবর্তীগণের কোন প্রকার মন্দিরের প্রয়োজন ছিল না। অন্যদিকে স্থানীয় অধিবাসীদের মন্দির পরিকল্পনার প্রথম স্তরে দেখা যায় স্তূপ এবং বেদী বা পাদপীঠ জাতীয় মাটির তৈরী উচ্চ আসন নির্মাণের প্রবণতা। সেখানেই লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি (পোড়ামাটির বা কাঠের) স্থাপন করে পূজা করা হত ।

এ বিষয়ে কিছু কিছু নীতি নির্ধারিকা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইঙ্গিতে বলা আছে। তবে সে

সময় বৃহদাকৃতির দেবমন্দির অপেক্ষা জনসাধারণের জন্য চৈত্য এবং বেদি বা বেদিকা তৈরী হত বেশী বেশী করে। অবশ্য ধর্মাচরণের ব্যাপার থাকলেও মূল বিষয় ছিল রাজকোষ পূর্ণ করা – তা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে যেমন ভাবেই হোক। দেবতাদের ধন সম্পত্তির উপর কড়া নজর রাখার জন্য মৌর্যযুগে 'দেবতাধ্যক্ষ' নামক এক বিশেষ উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত হতেন। তাঁরা দেবমন্দিরগুলি এবং দেবস্থানগুলি থেকে যথাযথ অর্থ গোপনে একত্রিত করে রাজকোষে জমা দিতেন (অর্থশাস্ত্র – কোশাভিসংহরণম্, পৃঃ ২৯, ড. রাধাগোবিন্দ বসাক অনূদিত, কলকাতা, ১৯৬৭, VOl-II)। কাজেই মৌর্য যুগে রাজ আজ্ঞায় এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দেবমন্দির তথা মঠ, মন্দির, চৈত্য ইত্যাদি নির্মিত হত তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসময় বেশীরভাগ মঠ-মন্দির ছিল বৌদ্ধমঠ, স্তূপ বা চৈত্য; ছিল মঠাধ্যক্ষ, বিহার এবং শস্য সংগ্রহশালা। মৌর্য রাজাদের প্রাসাদ অনেক সময় কাঠের তৈরী হত (যদিও শ্রেষ্ঠীদের বাসগৃহ প্রস্তর নির্মিত) কিন্তু মঠ, মন্দির বা স্তূপগুলি প্রস্তর নির্মিত হত। জৈন-বৌদ্ধ ব্যবসায়ীদের দ্বারা নির্মিত মঠ-মন্দিরগুলি প্রস্তর নির্মিত হত। এ–জেলায় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন সেরকম বৃহৎ কোন মন্দির বা দেবালয় ছিল কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। কিছু অনুমান মাত্র করা যায়। সুন্দরবনের সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে যে সব ইষ্টক নির্মিত গৃহভিত্তি, প্রাসাদ, মঠ-মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া গেছে সেগুলির বেশীরভাগই গুপ্ত, পাল, সেন যুগের, অথবা চন্দ্র ও বর্মন রাজাদের সময়ের থেকে প্রতাপাদিত্যের সময়কার। কিন্তু পাথরপ্রতিমার গোবর্দ্ধনপুরের ইষ্টক প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এবং তিলপীর (জয়নগর) গৃহভিত্তি ইত্যাদি প্রত্ননিদর্শনগুলি আমাদের ভাবিয়ে তুলছে। ইষ্টকগুলির আয়তনাদি দেখে এগুলি মৌর্যযুগের সময়কার বলে মনে হয়। কিছু কিছু পোড়ামাটির মাতৃকামূর্তি, যক্ষিণী, পটারী, অন্যান্য টেরাকোটা ফিগার ও জীবজন্তুর মূর্তিগুলি মৌর্য ও মৌর্যপূর্ব যুগের সঙ্গে অনেকাংশে সঙ্গতিপূর্ণ। এই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে গঙ্গারিডি সভ্যতার কথা, যাদের অস্তিত্ব মৌর্যপূর্ব থেকে কুষাণ পরবর্তী যুগ পর্যন্ত ছিল বলে বিদেশীদের বর্ণনা থেকে জানা যায়। মৌর্য সাম্রাজ্য যে 'পুড্নগল' পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা বাংলাদেশে প্রাপ্ত মহাস্থানগড় (বগুড়া) শিলালিপি থেকে বোঝা যায়। সাক্ষ্যহিসাবে দ্বীপবংশ, টলেমি, প্লিনী, ডিওডোরাস ও পেরিপ্লাস গ্রন্থকার প্রভৃতিকে দেখানো যায়। হরিনারায়ণপুরের মত গোবর্দ্ধনপুর আটঘরা, বাইশহাটা প্রভৃতি অনেক প্রত্নস্থলে পাওয়া পোড়ামাটির দেবদেবী, জৈন ও বৌদ্ধ মূর্তি, ছোটবড় স্তূপ ইত্যাদি অনেকগুলি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় থেকে খৃষ্টীয় কয়েক শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত বলে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অনুমিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে সেখানে মঠ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সুদৃশ্য সব স্তূপ গাত্রে বা অভ্যন্তরে ঐ সব টেরাকোটা মূর্তি লাগানো থাকত। votive হিসাবেও এগুলির ব্যবহার ছিল। কাজেই এখানে দেবালয় থাকলে তা তৎকালীন ভারতীয় ধারার অনুরূপ ছিল একথা বলা চলে। সমসাময়িক কালে খৃঃ পূর্ব যুগ থেকে বাসুদেব বিষ্ণুপূজার প্রচলন ছিল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। একবিষ্ণু, পঞ্চবিষ্ণু এবং চতুর্বিষ্ণু (চতুর্ব্যূহ) পূজক গোষ্ঠীর প্রত্নতাত্ত্বিক ও শাস্ত্রিয় পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি এজেলার পাথরপ্রতিমা, গোসাবা (সুন্দরবন) ও সাপখালি অঞ্চলে যথাক্রমে একটি (পোড়ামাটির) পঞ্চবিষ্ণু পট্ট ও একটি বিষ্ণুপদচিহ্নযুক্ত বেদী (দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল — কৃষ্ণকালী

মণ্ডল, পৃঃ ১০৩-১১৪, কলকাতা, ২০০২) এবং একটি প্রস্তর পদচিহ্ন বেদী পাওয়া গেছে। কিন্তু যেটা বলা প্রয়োজন তা হল ধর্মীয় বিশ্বাসের এইসব খৃঃ পূর্ব যুগের ধারণার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখানে পাওয়া যাওয়ায় সমসাময়িক কালে যে এসব অঞ্চলে এই সমস্ত দেবমূর্তির আবাসস্থল হিসাবে অবশ্যই দেব মন্দিরেরও প্রাচুর্য ছিল একথা বলা চলে।

মন্দির ও স্থাপত্যরীতি ঃ

মন্দির বা দেবালয়ের গঠন প্রকৃতি নিয়ে কিছু বলার আগে আর একটা বিষয় একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার ভূ-গঠন এবং ভূমিস্তর খুবই নরম। এ অঞ্চলের দীর্ঘ ভূমিস্তর নরম বালি ও কাদামাটি দিয়ে গঠিত। নদী ও সমুদ্রস্রোত প্রায় সর্বত্র। নদীগুলিতে লবণাক্ত সমুদ্রজলের প্রাবল্য এবং জোয়ার ভাঁটার টানে ভূমিক্ষয় অবিরত এবং নদীর উভয় দিকে বহুদূর পর্যন্ত তার প্রভাব সুদূর প্রসারী। একই সঙ্গে সভ্যতা ও জনপদ, বন্দর, নগর ও মঠ মন্দির গড়ে উঠেছিল এই সব অঞ্চলেই। কাজেই অন্য অঞ্চল অপেক্ষা এ-অঞ্চলে সু-উচ্চ মন্দিরগড়া এবং তার দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া কঠিন ছিল। তাছাড়া নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই প্রতিকূল লবণাক্ত ঝোড়ো আবহাওয়া, প্রবল বারিপাত, বন্যা ও সাইক্লোন প্রবল প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে গত চারশ বছরে প্রায় নব্বই বার বন্যা সাইক্লোন বা ঘূর্ণীঝড়ে এই সমুদ্রোপকূল অঞ্চল সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া ভূমিকম্প এবং ভূ-অবনমনে বহু অংশ মাটির নীচে বসে গেছে অথবা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তাহলে দুহাজার বছরের অবস্থা কি সাংঘাতিক ছিল!

এই পরিস্থিতিতে কোন সু-উচ্চ দেবালয় বা মন্দির গৃহাদির অস্তিত্ব দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। উত্তর ভারতীয় নাগর স্থাপত্যরীতির অনুসরণে এ-অঞ্চলে শিখর দেউল গড়ার প্রবণতা রয়েছে। দেবতাদের জন্য পঞ্চবিমানযুক্ত রথ ব্রহ্মা রচনা করেছিলেন। এ-থেকেই আসে শিখর দেউল, বিশেষত পঞ্চরত্ন মন্দিরের পরিকল্পনা। অবশ্য বাংলার নিজস্ব (স্থানীয়) প্রভাব কিছুটা স্বাতন্ত্র হলেও সর্বভারতীয় রীতির সঙ্গে মন্দিরের নানা পদ্ধতির একটা মিশ্র রীতি এখানে গড়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার মন্দিরগুলি স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্যের দিকে থেকে নিম্নরূপ ঃ

১) শিখর বা রেখ দেউল ঃ

মন্দিরের গর্ভগৃহের চাল ক্রমশ সরু হতে হতে উর্দ্ধে উঠে একটি বিন্দুতে মিলিত হয় এবং একটি শিখর বা চূড়ার সৃষ্টি করে — ক্রমহ্রাসমান একটি বক্র রেখাই এই জাতীয় মন্দিরকে একটি অপূর্ব সৌন্দর্য দান করে। এই জাতীয় মন্দিরকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এর শীর্ষ দেশ।

২) ভদ্র বা পীড় দেউল ঃ

এ জাতীয় মন্দিরের চাল ধাপে ধাপে উপরে উঠে যায়। এর ফলে তাদের আকৃতি ছোট হতে থাকে ; ফলে সৃষ্ট চালের আচ্ছাদন - রেখার বহির্ভাগ একটি পিরামিডের আকৃতি পায়। সর্বশেষতম চালের উপরে থাকে কলস ও ঘন্টা।

স্তূপশীর্ষভদ্র দেউলে একটি স্তূপের মত চূড়া থাকে এবং **শিখরশীর্ষ ভদ্র দেউলে** একটি শিখর মন্দিরচূড়াকে অলংকৃত করে শোভাবর্দ্ধন করে। বস্তুতপক্ষে এই দুই জাতীয় (স্তূপশীর্ষ ও শিখর শীর্ষ) মন্দির দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় এখন আর দেখা যায় না।

৩) রত্নমন্দির ঃ

এই শৈলীর মন্দিরে অনাবৃত ছাদটিকে অন্যভাবে না ঢেকে তার উপর একটি চূড়া তৈরী করা হয়। শিল্পকর্মটি খুব দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকলে তবেই সৃষ্টি করা সম্ভব। সৃষ্ট এই চূড়ার সংখ্যা ধরেই মন্দিরটিকে একচূড় বা রত্নমন্দির , পঞ্চ (চূড়) রত্ন মন্দির বা নবরত্ন মন্দির বলা হয়। এই মন্দিরগুলির উচ্চতাও রত্নগুলির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। একটি চূড়া অর্থাৎ মূল চূড়াটি এই জাতীয় রত্ন - মন্দিরের প্রাণ। কোন মন্দিরের একতলায় মূল রত্নসহ চারটি কোণে চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট রত্ন বা চূড়া থাকে। এটি পঞ্চরত্ন মন্দির। আবার আর একটি 'তল' বাড়িয়ে দিলে সেখানে আর মূল রত্ন বা চূড়াটির থাকার সম্ভাবনা থাকে না, তখন দ্বিতীয় তলের উপরে চলে আসে মূল চূড়াটি এবং সেক্ষেত্রে প্রথম তলের চারকোণে তৈরী ঐ চারটি চূড়াতো থাকলই উপরন্তু দ্বিতীয় তলের চারকোণে চারটি চূড়া এবং এর মধ্যস্থলে মূল বৃহত্তম চূড়াটি নির্মিত হয়। অর্থাৎ প্রথম তলে চারটি এবং দ্বিতীয় তলে পাঁচটি মোট নয়টি চূড়া সমন্বিত এই মন্দিরই নবরত্ন মন্দির। অর্থাৎ একটি তল বাড়লে চারটি 'রত্ন' বাড়বে। তাই তৃতীয় তল বিশিষ্ট রত্নমন্দির হবে ত্রয়োদশ রত্নমন্দির, চতুর্থতল বিশিষ্ট হলে সপ্তদশ রত্নমন্দির ইত্যাদি। বাস্তবে নবরত্নের পরে রত্ন মন্দির দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় বিরল। রেখ, পীড় ও চালা রীতির নির্মাণ কৌশল পৃথকভাবে এবং একত্রে অথবা যুগ্মক্ষেত্রে -- একত্রে রত্ন মন্দির নির্মাণে সাহায্য করে। কাঠের তৈরী রথগুলিতে ত্রয়োদশ, সপ্তদশ রত্নমন্দিরের নিদর্শন দেখা যায়।

৪) চালামন্দির ঃ

চালাযুক্ত কুঁড়েঘরের অনুকরণে যে মন্দিরগুলি এ অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তৈরী হয় সেগুলি চালা মন্দির বা বাংলা মন্দির নামে পরিচিত। দুইটি চাল যুক্ত মন্দিরকে এক বাংলা (বাংলো থেকে?) বা দোচালা মন্দির বলে। সাধারণত চারটি চালযুক্ত মন্দির চারচালা মন্দির এবং ঐ চারচালা মন্দিরের অনুরূপ মন্দিরের উপরে চারটি ছোট চাল বা চালা যুক্ত করে তৈরী যে মন্দির তাকে আটচালা মন্দির বলে। অনেকটা আটচালা দ্বি-তল ঘরের মত। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় আটচালা মন্দিরেরই আধিক্য; যদিও চারচালা, বাংলা এবং রেখ বা রত্ন দেউল এবং শিখর দেউল কিছু কিছু আছে।

মিশ্ররীতির দেবদেউলও ঃ কিছু দেখা যায়। এছাড়া ভারতে ইউরোপীয় সভ্যতার আগমনের ফলে বিশেষ করে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীগণের আগমন এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য হওয়ায় এ অঞ্চলেও স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য শিল্পে ইউরোপীয় প্রভাব বিস্তার লাভ করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী তথা বর্তমান কাল পর্যন্ত সে প্রভাব কমবেশী রয়েছে। এদেশে তৈরী চার্চগুলি এবং অট্টালিকা ও মন্দিরাদিতে ফ্যান লাইট লাগানো, নানা বিদেশী কারুকার্য করা এবং গথিক আর্ট প্রয়োগ এসবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বারুইপুর, বিষ্ণুপুর, মগরাহাট, খাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের চার্চগুলি এবং ঐ সময়কার

এতদঞ্চলের জমিদার ও ধনবান ব্যক্তিদের বসতবাড়ি ও ঠাকুরদালান গুলিতে এইসব শিল্প নমুনা বিদ্যমান। বারুইপুর, বাওয়ালী ও জয়নগরের জমিদার বাড়ীগুলিতে এমন দৃষ্টান্ত আছে।

এই সময়ের পূর্বে মুসলমান রাজত্বকালে কিছু পার্শিয়ান শিল্প ভাস্কর্যের - স্থাপত্যরীতি সহ **ডোম-চূড়ার রীতিতে** গঠিত মসজিদ মাজার সমাধিস্থল ইত্যাদি গঠন নৈপুণ্যের বিশিষ্ট ধারার প্রচলন ঘটিয়েছে। তবে অনেকের মতে এই জাতীয় স্থাপত্যের কিছুটা ভিত্তি এ-অঞ্চলে তার পূর্ব হতেই অনুসৃত হচ্ছিল। ঘুটিয়ারী শরিফের মাজার (মোবারক গাজী), গণিমা (মল্লিকপুর) , দানেশ শাহের ভগ্ন মাজার (চৌহাটি), মগরাহাট, ফলতা, বিষ্ণুপুর, উস্তি, ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলের মসজিদ, দরগা ও মাজারগুলি কমবেশী একই স্থাপত্যরীতিতে তৈরী। এই স্থাপত্যে মাঝে বা অন্যত্র একাধিক ডোম থাকে এবং চার কোণে চারটি সরুপিলার সূচালোভাবে উর্দ্ধমুখী হয়ে অবস্থান করে। সামনে ডোমের গায়ে এবং পিলারগুলিতে অনেকসময় সুদৃশ্য কারুকার্য করা হয়ে থাকে। কোন মূর্তি থাকে না; অনেক সময় আধুনিক মসজিদগুলিতে নানা রকমের রঙিন পাথর বসানো থাকে। ডোমগুলির গঠন নৈপুণ্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ক্রমশঃ সরু হয়ে ওঠা চারিদিকের পিলারগুলিতেও সূক্ষ্ম কিছু কিছু শিল্পকাজ এবং ধাপে ধাপে তার গোলাকার গঠন বৈচিত্র্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়।

ইতিপূর্বে আমরা **সমতল ছাদ বিশিষ্ট একতলা মন্দিরের** কথা উল্লেখ করেছি। এই মন্দিরগুলি সাধারণত কালী, শীতলা, নারায়ণী, চণ্ডী, দক্ষিণরায়, ধর্মরাজ, ধর্মঠাকুর ইত্যাদি দেবদেবীর মন্দির হিসাবে নির্মিত হয়েছে। অবশ্য কোথাও কোথাও কালী এবং ধর্মঠাকুরের (নড়িদানা, বারুইপুর) আটচালা মন্দিরও আছে ।

এই জাতীয় একতলা সমতল মন্দির ছাড়াও কোন কোন স্থানে **সমতল একতলা দালান ঘর** রয়েছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি মূল দেবমন্দিরের সঙ্গে তৈরী হয়; দেবস্থানটি ভিতরে থাকে যেখানে দেবতার মূর্তিটির অবস্থান বা গর্ভগৃহ। অন্যান্য কোন কোন দেবালয়ে যেমন মূল দেবমন্দিরের (তা যে কোন স্থাপত্য রীতির হোক) সঙ্গে বারান্দা বা চাতাল বা যাত্রীআবাস থাকে এগুলি ঠিক তেমন নয়। মূল দেবালয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বড় বড় মোটা মোটা লম্বাকৃতি থামের প্রাচুর্যেভরা দালান থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই দালানগুলি মূল মন্দির ভিত্তির সঙ্গে একই সঙ্গে নির্মিত হয়, সেক্ষেত্রে এই দালানগুলি একটু (অপেক্ষাকৃত) সংক্ষিপ্ত পরিসরের হয়, কিছুটা বারান্দার মত। কিন্তু বড় দালানগুলি দেবালয়ের সঙ্গে সংলগ্ন (মূলত সামনের দিকে) আলাদা করে তৈরী করা হয়। মূল বৈচিত্র্য এবং কারুকার্য মন্দিরগাত্রের ন্যায় সামনের অংশে , উপরে কার্নিশের নীচে এবং বিশালকৃতির এইসব গোল গোল পিলার বা থামগুলিতে থাকে। থামগুলির উপরের অংশে (ছাদের নীচে) এইসব পিলারে অত্যন্ত সুদৃশ্য কারুকার্য ও শিল্প নিদর্শন আছে। লতাপাতা, ফুল, মুকুটাবৃত মুখ, নানা রকম বেঁকি ইত্যাদি। বেশীরভাগ জমিদার বাড়ীর মন্দিরে বা মন্দিরদালানে এজাতীয় শিল্প পিলার বা থামগুলির উপরে দেখা যায়। বাওয়ালী মণ্ডল বাড়ী, জয়নগর, মজিলপুর, বহড়ু (মিত্র, ঘোষ, বোস, দত্ত প্রভৃতি), বারুইপুর (রায়চৌধুরী), রাজপুর, বেহালা (সাবর্ণ চৌধুরী) ইত্যাদি বহু জমিদার নির্মিত ঠাকুর বাড়ী বা মন্দির দালানগুলি এইরূপ গঠন প্রণালীর। সম্ভবত 'ঠাকুর দালান' কথাটি প্রচলিত হয়েছে এই

জাতীয় দেবমন্দির সংলগ্ন দেবদালান থেকেই।

আবার ঠিক জমিদার শ্রেণী নয় কিন্তু নানাভাবে ধনবান ব্যক্তিদের দুর্গা, কালী, চণ্ডী ইত্যাদি পূজার জন্য এক রকমের দেবস্থান আছে যেগুলি কে '**চণ্ডীমণ্ডপ**' বলে। এ জাতীয় দেবস্থানের তিন দিকে দেওয়াল (কাঁচা/ পাকা) একদিকে অর্থাৎ সামনে সারি সারি (প্রয়োজন মত) পিলার বা শক্ত কাঠের খুঁটি। এই ঠাকুরঘর বা চণ্ডীমণ্ডপগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দালান বা বারান্দা সমন্বিত হয়। বারান্দা এবং দেবস্থান একসঙ্গে পরিকল্পিত। বারান্দাগুলিও দেওয়ালহীন – খোলা অবস্থায় থাকে। সারা বারান্দায় প্রয়োজন মত পিলার বা শক্ত খুঁটি দেওয়া থাকে। এইসব চণ্ডীমণ্ডপ বা ঠাকুর দালানের ভিতর দেওয়ালে অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্তি, চিত্রাঙ্কিত কাহিনী বিশেষ করে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী চিত্র, যুদ্ধ চিত্র, গীতা চিত্র, সত্যবান সাবিত্রী-যম ইত্যাদি চিত্র চুন,সুরকী বালি দিয়ে তৈরী দেশীয় প্রথায় স্টুকোর কাজ আছে। এরকম একটি ঠাকুরদালানে বহুবর্ণরঞ্জিত সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি চিত্রভাস্কর্য রয়েছে সীতাকুণ্ড গ্রামের (বারুইপুর) প্রয়াত লোককবি দ্বিজপদ মণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে। বড়িশা ও বাওয়ালীর দালান তথা চণ্ডীমণ্ডপগুলি একাসনে দর্শণীয় ছিল।

প্রায় অনুরূপ একটি বিশাল মন্দিরের কাঠের পিলারগুলিতে (থামের মত) নানাপ্রকার কাহিনী চিত্র, ফুল লতাপাতা, মূর্তি ইত্যাদি দেখা যায় মহেশপুর গ্রামের হালদার বাড়ীতে। মন্দিরটি ছিল **বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির**। মূর্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি এখন নানা শরিকের গৃহে গৃহদেবতা হিসাবে পূজিত হচ্ছে কিন্তু মন্দিরটির ভগ্ন ভিত্তি এবং কয়েকটি কাঠের থাম ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। দেবস্থান নির্মাণ শিল্পে এ অঞ্চলের কাষ্ঠ নির্মিত রথ, ইষ্টক নির্মিত প্রাচীন দোলমঞ্চ এবং তুলসী মঞ্চ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

রথের কথা চূড়া-বিশিষ্ট রত্ন-মন্দির প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে একচূড় থেকে একবিংশচূড় বিশিষ্ট রথ চব্বিশপরগনায় দেখা যায়। সবই কাঠের তৈরী। বারুইপুর, জয়নগর, ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ, রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমা, বিষ্ণুপুর, মথুরাপুর, বজবজ, ফলতা, প্রায় সব থানায় এখনো যে সব রথ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাতে বোঝা যায় যে জমিদারী অধিগৃহীত হওয়ার পর জমিদারদের প্রবর্তিত রথের নির্মাণ- জৌলুস অনেক কমে গেছে – কোন ক্রমে পুরাতন রথ সংস্কার করে সামান্য রঙচঙ করে মেলার সময় টানা হয়ে থাকে। অধিকাংশ দেবদেবী, কৃষ্ণলীলা, চৈতন্য লীলা, পাখী, ময়ূর, লতাপাতা, ইত্যাদি মূর্তি আঁকা অর্থাৎ রথেই কাঠ খোদাই করা। বর্তমানে অনেক প্রাচীন রথ আর জমিদারদের সাহায্য পায় না, ফলে গ্রামের লোকেরা চাঁদা তুলে রথের মেলার সেই ঐতিহ্যকে বজায় রাখার চেষ্টা করছে। পাথরপ্রতিমা এবং অন্যত্র এরকম প্রচেষ্টা দেখা যয়। অনেকক্ষেত্রে অন্যভাবে রথটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে জনগণের আকর্ষণের চেষ্টা করা হচ্ছে। জয়নগর মিত্রবাড়ীর কাছে এরকম প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তবে মূল মূর্তি জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার মূর্তি সর্বক্ষেত্রে প্রায় একই প্রকার।

দোল মঞ্চ ঃ

অধিকাংশ প্রাচীন (ইষ্টক নির্মিত) দোলমঞ্চ চারচালা বা আটচালা মন্দিরের মত উপর অংশটি। নীচের ভিত্তিটার উপরে প্লিন্থ লেভেলটি অনেকক্ষেত্রে বেশী উঁচু। কয়েকটি আবার

আটচালা, মন্দির ভিত্তিও প্লিন্থ লেভেলের মতই তৈরী। প্রাচীনকালের সমতল একতলা ছাদের উপর আরও প্রায় একতলা সমান উঁচু করে তৈরী উপরটা চারচালা মন্দিরের মত গঠন রীতির হলেও চারিদিকে চারিটি দরজার মত (অপেক্ষাকৃত বেশী স্থান) অনাবৃত থাকায় ঐ সকল স্থানে দাঁড়িয়ে দোলের সময় অনুষ্ঠানাদি করার পক্ষে সহায়ক হয় এবং অপেক্ষমান জনতার দৃষ্টিও ঐদিকে প্রসারিত হয়। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার সবচেয়ে প্রাচীন দোলমঞ্চটি সম্ভবত বারুইপুরের পুরাতন বাজারের (জলট্যাঙ্কের কাছে) দোলমঞ্চটি। শ্রীচৈতন্যদেব আটিসারায় (মহাপ্রভুতলা - - বারুইপুর পুরাতন বাজার) আসেন ১৫১০ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এই দোলমঞ্চটি তৎপূর্বেই নির্মিত ১৩৭৩ শকাব্দ বা ১৪৫১ খৃঃ। এটিই সম্ভবত বারুইপুরের প্রাচীনতম ইষ্টক নির্মিত সৌধ যেটি এখনো অন্তত বহাল তবিয়তে রয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠা লিপিটির বিষয়ে অনেকে সহমত নন।

সমতল একতলার উপর তৈরী চারচালা এই দোলমঞ্চটি এককালে যে খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল তা বোঝা যায়। এখনো এর গঠন ও শিল্পকার্য দেখার মত। প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে – সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায়। এ রকম দোলমঞ্চ হরিনাভি-রাজপুর, জয়নগর-মজিলপুর, বাওয়ালীর জমিদার মণ্ডল বাড়ীতে দেখা যায়। অবশ্য বাওয়ালীর দোলমঞ্চের প্লিন্থ লেভেল এত উঁচু নয় – যেন একটি স্বাভাবিক চারচালা দেবালয়।

তুলসীমঞ্চ ঃ

ইটের তৈরী নানা রকমের তুলসীমঞ্চ দেখা যয়। নিত্যদিন পূজা বা সন্ধ্যারতির জন্য একটু সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে তুলসী মঞ্চ আছে। হরিবাসর, দোল বা বিশেষ উৎসব যাদের হয় এবং হরিনাম সংকীর্তন করান এমন গৃহে একটি বড় সড় তুলসী মঞ্চ দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর নীলাচল যাত্রাপথে আদিগঙ্গা কূলে কূলে তাঁর বাণী প্রচার ও নাম মাধুর্যের প্রয়োগের ফলে গড়িয়া, বারুইপুর, মথুরাপুর, ছত্রভোগ ইত্যাদি অঞ্চলে প্রত্যক্ষভাবে এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে নববৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃতি ঘটে। তার ফলে প্রাচীন ভাগবতীয় বৈষ্ণব এবং এই নব বৈষ্ণব সম্প্রদায় মিলিতভাবে প্রায় সারা দক্ষিণবঙ্গে বিস্তৃততর হয়। তাই ঘরে ঘরে বালকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, বিশ্বম্ভর, জগন্নাথ ও নানা প্রকারের কৃষ্ণ বিষ্ণুমূর্তি, নিতাইগৌর, শ্রী চৈতন্য মূর্তি ও চৈতন্য পাদপীঠ পূজার প্রচলন রয়েছে। বেশীরভাগ গৃহদেবতা বিষ্ণু বা রাধাকৃষ্ণ বা রাধামাধব। অনেক জমিদারদের গৃহদেবতাও তাই। তুলসী মঞ্চ ছোট খাঁট থেকে কিছুটা বৃহৎ আকারের হতে বিভিন্ন বাড়ীতে দেখি। তবে নামগান, হরিবাসর ও নিত্য সন্ধ্যার জন্য তুলসীমঞ্চ খুব বড় হয় না, প্রায় তিন-সাড়ে তিনফুট থেকে পাঁচ ফুটের মধ্যেই অধিকাংশ তুলসীমঞ্চ হয়। গঠন বৈচিত্র্যে এই মঞ্চগুলি নানা রকম হয়। একটু লম্বাটে চারচালা মন্দিরের মত গঠনই বেশী। মাথায় থাকে উপরে নীচে পাপড়ি নামানো পদ্ম। ভিত্তি একটু উঁচু ও চওড়া। ভিত্তির ঠিক উপরে বা মধ্যভাগে প্রদীপ বসানো বা কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র (নারায়ণ) দেবমূর্তি বসানোর জন্য অভ্যন্তরীণ একটি তেকোণা খোপ থাকে। মঞ্চগাত্রে নাম সংকীর্তন বা নানা দেবলীলা কোথাও কোথাও থাকে। বর্তমানে সিমেন্টে তৈরী এই সব মঞ্চ নানা দেবলীলা ও মূর্তিশোভিত শ্বেত পাথর বসিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়।

ব্রোঞ্জ বা মিশ্রধাতুর ঢালাই মঠ-মন্দির

এ অঞ্চলে খুব কমই দেখা যয়। সাধারণত সিংহাসন, ঠাকুর রাখার ছোট বড় আসন ও আসবাবপত্র তথা পূজার উপকরণাদি তৈরীতে ব্রোঞ্জ বা মিশ্রধাতুর ঢালাই কাজ দেখা যয়। জমিদার গৃহাদিতে স্বর্ণ, রৌপ্য বা রত্ন সিংহাসন দেবাসন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ব্রোঞ্জ, তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য বা অষ্ট ধাতু নির্মিত দেব-মূর্তিও অনেক বাড়ীতে আছে। শ্বেতপাথর, কষ্টি পাথরের মূর্তিও প্রচুর। এগুলি বেশীরভাগই গৃহদেবতা। তবে অষ্টধাতুর বা পিতলের মনসা, শীতলা, চণ্ডী, নাগদেবতা বাসুকীর (পিতল কলসের উপর মুণ্ডমূর্তি) দেখা যায় নামখানার শীতলা মন্দিরে, মনসা দ্বীপের মনসা মন্দিরে (নাগ মন্দিরের কাছে)। পাথরপ্রতিমা থেকে প্রাপ্ত সুন্দর ধাতব বুদ্ধমূর্তিটি বরবুদুরে প্রাপ্ত অনুরূপ বুদ্ধমূর্তি ও শিল্পকলার আদি উৎস বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কঙ্কণদীঘি তথা মণিরতট এলাকায় অনেকগুলি ধাতব ছোট বড় মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে বেশ কিছু আছে জৈন এবং বৌদ্ধ, বৌদ্ধতান্ত্রিক বারাহি ইত্যাদি দেবতা মূর্তি।

একচূড় রথ মন্দিরের মত প্রায় আড়াই ফুট উচ্চতার বড় মাপের সুদৃশ্য শিল্পকলা শোভিত একটি **ধাতব (ব্রোঞ্জ) মন্দিরের** প্রতিকৃতি রয়েছে সাগরদ্বীপের প্রসাদপুরের বিশালাক্ষী মন্দিরের দ্বিতীয় কক্ষে। এ-জেলার অন্য কোথাও এতবড় প্রাচীন ধাতব মন্দির প্রতিকৃতি আছে বলে আমার জানা নেই।

মন্দিরের বহিরঙ্গ মন্দির শিল্পের একটি বিশেষ দিগদর্শন। যুগ অনুযায়ী মন্দির গাত্রের শিল্পকলার বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। মন্দির গাত্রের মুখ্য শিল্পকলা থাকে মূল দরজার দুই পার্শ্বে এবং উপরে। মন্দির কোণাগুলিতে পাতলা টালি বা ইট দিয়ে সম-ক্ষীয়মান ঊর্দ্ধগামী গঠন বৈশিষ্ট্যে একটি রেখার সৃষ্টি করে। রেখদেউল, চূড়াশীর্ষ দেউল বা আটচালা মন্দিরগুলিতে চারকোণ থেকে রেখাগুলির উৎস তৈরী করা হয়। দরজার শীর্ষে, দুই পার্শ্বে অনেক মন্দিরেই লম্বা লম্বা প্রস্তর খণ্ড ব্যবহার করা হয়। অনেক আটচালা মন্দিরে ইটের আর্চ তৈরী করা হলেও দরজার নীচের অংশটিতে (চৌকাঠের নীচের) কিছুটা লাল বা ধূসর রঙের বেলেপাথর বসানো গোবরাট থাকে। হয়ত এখানের কাঠটির দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে এড়াবার জন্যই পাথরের গোবরাট বসানো হত। টেরাকোটার মূর্তি, মন্দির, ফুল-ফল, লতাপাতা, গাছ, পক্ষী, বানর, অশ্ব, বৃষ, বিষ্ণু, চণ্ডী, বুদ্ধ, হস্তী, কৃষ্ণ, গোপাল, মুণ্ড, দেবদেবী, রাধাকৃষ্ণ, শিব, উমা, আঙুরগুচ্ছ, কুঁড়ি পদ্ম ও প্রস্ফুটিত পদ্ম, নানান রেখা, বেঁকি, বেড়াচিহ্ন ইত্যাদি ফলক মন্দির গাত্রগুলিতে লাগান হত। অনেক লৌকিক দেবদেবী, দেবতার শক্তিমূর্তি ইত্যাদি সহ লক্ষ্মী, কালী, বারাহি, শিব লিঙ্গ, বানর, নন্দী ভৃঙ্গি, দ্বারপাল, দ্বারপাল মুণ্ডমূর্তি ইত্যাদিও টেরাকোটার মন্দির ফলক হিসাবে প্রভূত প্রচলন এক সময় ছিল। পতাকা সহ ছোট ছোট মন্দির, ঘন্টা, কলকে ফুল, ময়ূর, টিয়াপাখীর টেরাকোটা ফলক বা তৈরী করা পঙ্খের কাজ অনেক মন্দিরেই দেখা যায়। টেরাকোটা অমিল হতে থাকলে পঙ্খের কাজ, চুনবালি-সিমেন্ট জাতীয় শক্ত মর্টার দিয়ে ও সুরকি মিশিয়ে নানা প্রকার আঁকি বুকি, লতা, ফুল, পুষ্পগুচ্ছ, দেবতা মূর্তি, জীব জন্তু মূর্তি, পরী ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে। প্রচুর পঙ্খের কাজ এখনো নানা মন্দিরে আছে। ইউরোপীয় শিল্পের প্রচুর প্রভাব পড়েছে ইংরেজ আমলের জমিদার শ্রেণীর মানুষের মন্দির ও গৃহাদি নির্মাণে।

গথিক শিল্প এবং সূক্ষ্ম শিল্পকলার প্রসার ঘটে দেবালয়গুলিতে এবং ঠাকুরদালানগুলিতে। বারুইপুরের চৌধুরীদের, জয়নগরের কোন কোন ঠাকুর দালান এবং মন্দির গুলিতে এই প্রভাব যথেষ্ট।

বর্তমানে সিমেন্ট দিয়ে বা R.C.C করে রেখ মন্দির, রেখ সহ চূড়ামন্দির, রত্ন মন্দির এবং আটচালা মন্দিরও কিছু কিছু তৈরী হয়েছে। এসব মন্দিরেও রয়েছে বেশ সুন্দর সুন্দর দেওয়াল চিত্র (আটিসারা মহাপ্রভুতলা)। পঞ্চরত্ন মন্দির হিসাবে রয়েছে সীতাকুণ্ডুর চিত্রশালী মঠের শিবমন্দির, কাছারী বাজারের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির (শ্বেত প্রস্তর সেটিং), কল্যাণপুরের কল্যাণ মাধবের মন্দির। এছাড়া রয়েছে ধামনগরের সমতল ছাদের উপর দীর্ঘ চূড়া বিশিষ্ট রাধাকৃষ্ণ মন্দির (এগুলি সবই বারুইপুরে)। রামকৃষ্ণ আশ্রম মন্দিরগুলি (বিশেষ করে নরেন্দ্রপুরে), ভারত সেবাশ্রমের মন্দিরগুলিও চূড়া বিশিষ্ট এবং ঘন্টা ও লতাসহ সুন্দর শ্রীমণ্ডিত। বোড়ালের ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির নবরত্ন মন্দির। প্রাচীন কাল থেকেই মন্দিরগাত্রের প্রতিষ্ঠা লিপিও একটি শিল্পকলা হিসাবে চিহ্নিত। পোড়ামাটির ফলক হিসাবে, প্রস্তরখণ্ডে বা প্লাস্টারের সময় মিস্ত্রীদের দ্বারা লিখিত মন্দির লিপি থেকে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কাল, প্রতিষ্ঠাতার নাম, অনেকক্ষেত্রে মন্দিরনির্মাণ শিল্পীর নাম, প্রতিষ্ঠিত দেবতার নাম এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ইত্যাদি অনেক কিছু জানা যায়।

জয়নগরের মিত্র গঙ্গার (আদিগঙ্গার) তীরে অবস্থিত **দ্বাদশ শিব মন্দিরের** সবকটিতেই প্রতিষ্ঠা লিপি আছে অথবা ছিল যে, তার চিহ্ন দেখা যায়। মন্দিরগুলি সবই আটচালা শিবমন্দির। তবে এখানেই মন্দিরের সামনে গঙ্গার পাড়ে একটি বেশ লম্বা কালোপাথরের বিষ্ণুমূর্তি ভগ্নাংশে (বর্তমানে আলাদা করে গাঁথা) রয়েছে। Hunter সাহেব একটি Report উল্লেখ করে বলেছেন যে এখানকার একটি প্রাচীন মন্দির গাত্রে মিথুন মূর্তি (টেরাকোটা) ছিল। বাস্তবিকই ক্ষেত্রানুসন্ধানে তা ধরা পড়ে। তবে এখানকার সব মন্দিরই এক সময়ের নয়। তাছাড়া একটি দোলমঞ্চসহ এখন মন্দিরের সংখ্যা চতুর্দশ। কোন মন্দির লিপিই এখন আর পাঠযোগ্য নেই। প্রাচীনতম মন্দিরটি ১৭৬৪খৃঃ তৈরী। অনেকগুলিতে এখনো টেরাকোটার কাজ আছে। গঠনও খুব সুন্দর এবং চালাগুলি নীচে পর্যন্ত নেমে এসে একটি সুষ্ঠু সমন্বয়ের সৃষ্টি করেছে। লতাপাতা, ছোট ছোট মুণ্ড মূর্তি, অলংকৃত প্রবেশ পথ, বড় বড় পদ্ম ও অন্যান্য ফুল। জোড়া জোড়া গোল গোল দ্বারস্তম্ভ (পিলার) এবং সূর্যরশ্মির প্রতীক দরজার মাথায় আর্চ সিস্টেম। দরজার পাশ গুলিতে শৃঙ্খল জাতীয় একথাক শিল্পকলা — উপরে ঢেকে দিয়েছে। তার পাশে মোটা মোটা সিকিভাগ ইটের মত বুটি দানার সৃষ্টি। অতঃপর দেওয়াল কোণগুলি টালি দিয়ে নেমে আসা চালার কোণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোণার সৃষ্টি করা হয়েছে। চোদ্দটি আটচালা মন্দিরের একটি দোতলা সমান উঁচু দোল মঞ্চ (কিন্তু চালা চারটি)। সবগুলি শিল্প কাঠামো এবং অঙ্কিত শিল্প ও টেরাকোটা শিল্প এক নয়। একটি দুটি মন্দিরে এখনো প্রচুর টেরাকোটা লতা, বৃক্ষপত্র (লম্বা ডাঁটিতে খেজুর পাতার মত এক গুচ্ছ), বড় বড় গোলাকার পদ্ম, পনেরোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের একটি সারি ইত্যাদি রয়েছে। সবই দরজার উপরের অংশে। উপরের চার চাল নিম্ন চালাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মন্দির শীর্ষে তিনটি করে স্বল্পায়ত চূড়া রয়েছে। সবগুলিতেই

শিবলিঙ্গ বর্তমান।

দেরবেড়িয়ায় (মজিলপুর) দুটি শিবমন্দির ছিল। একটি ভেঙে নিকটস্থ ঝিলের মধ্যে পড়ে আছে, আর একটি ভগ্ন দশায় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে এখনো দণ্ডায়মান। আটচালা — স্বল্প দৈর্ঘের মন্দিরটিতে কিন্তু প্রচুর টেরাকোটা কাজ ছিল, এখনো কিছু রয়েছে। ভাঙা মন্দিরটিতে অনেকটা নীলাভ পাথরের শিবলিঙ্গটি (সাদার মধ্যে ছিটে নীল) এই মন্দিরের কালো পাথরের শিবলিঙ্গটির পাশে রাখা ছিল — সেটিও এখন ত্রিখণ্ডিত। প্রতিষ্ঠা লিপি আছে কিন্তু পড়া যায় না - এতটা ক্ষয় প্রাপ্ত।

প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছে ঃ

মুনি পক্ষর্ষি পৃথিবীমিতে শাকে চ।
অচ্যুতালয় শ্রীরাজচন্দ্রদেবেন কৃতঃ।।

১৭২৭ শকে অর্থাৎ ১৮০৫ খৃঃ রাজচন্দ্রদেব কর্তৃক নির্মিত। সম্মুখভাগে খুব সুন্দর ফুল, পদ্মপাতা ও পদ্ম, লতা, চক্র, প্রজাপতি এবং নানা নক্সা এখনো আছে।

একই রকম আটচালা মন্দির **বারুইপুরের জোড়া শিব মন্দির** — হালদার চাঁদনী অর্থাৎ পুরন্দরপুরে আদিগঙ্গা তীরে খোপাগাছির জমিদারদের তৈরী নারায়ণীশ্বর ও রামনাথেশ্বর শিবমন্দির।

প্রতিষ্ঠা লিপি ঃ

দক্ষিণেরটি ঃ

"নেত্র যুগাব্ধি তারেশ শাকে
য়দং মন্দিরং কৃতং নারায়ণীশ্ব
রস্য। শ্রী কালিচরণ শর্ম্মণা।।" — ১৭৭৩ শক বা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ।

উত্তরেরটি ঃ

"ত্রিযুগাব্ধীন্দু শাকেহত্র
নির্মিত মন্দির সুভা রামনাথেশ্ব
রস্য শ্রী কালিচরণ শর্ম্মণা।" — ১৭৭৩ শক অর্থাৎ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত।

(বিস্তৃত বিবরণ ঃ দক্ষিণ চব্বিশপরগনা আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ — কৃষ্ণকালী মণ্ডল, পৃঃ ৬৪ – ৭৫, দ্রষ্টব্য)।

পাটেশ্বরীর মন্দিরটি আটচালা (ডায়মণ্ডহারবার থানা)। প্রতিষ্ঠা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। এখন আর শিল্পকর্ম বলে কিছুই নেই। মসৃণ সিমেন্ট প্লাস্টার করে মন্দিরটিকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

আমতলার কাছে **গোবিন্দপুরের আটচালা শিবমন্দিরটি** ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তৈরী। বেশ শিল্প সজ্জিত ছিল, এখন ভগ্নদশা। পদ্মাসনে উপবিষ্ট গণেশ, যোদ্ধা, শিকারী কর্ত্তৃক মৃগের পশ্চাদ ধাবন, একটি বিচিত্র মাতৃকামূর্তি ইত্যাদি শিল্প সৃষ্টিগুলির অন্যতম।

রাজারামপুরের আটচালা মন্দিরটিও ভগ্নজীর্ণ দশাগ্রস্ত। প্রতিষ্ঠা কাল ১৭৮৮ খৃঃ। পোড়ামাটির অলংকরণ, রাম রাবণ, বানর ভক্ষণরত দানব বা কুম্ভকর্ণ, প্রসাধনে

নারী, দেবকীর সন্তানপ্রসব, অগ্নিকুন্ডের পাশে বৃদ্ধদ্বয় ইত্যাদি চিত্রিত।

কামারপোলের (সরিষাহাট) কাছে কয়েকটি **প্রাচীন আটচালা মন্দির** রয়েছে। সবগুলিতে শিল্পকর্ম বিশেষ নেই। নিকটবর্তী আটচালা ঘনশ্যাম মন্দিরটি ১৭৯৯ খৃঃ নির্মিত। কিছুটা গঠন বৈচিত্র্য আছে।

বাওয়ালীর মণ্ডল বাড়ীর অনেকগুলি **মন্দির** জীর্ণ হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সময়ে তৈরী মন্দির গুলির সংখ্যা দশটি। ইংরেজ আমলে তৈরী নাট মন্দির, জলটুঙ্গী বা নাচঘর ইত্যাদি আছে। একটিই মাত্র নবরত্ন মন্দির ১৭৯৪ খৃঃ তৈরী। জীর্ণ। এককালে প্রতিষ্ঠা লিপির স্থান সহ সম্মুখভাবে প্রচুর শিল্প কার্য ছিল। সামনে রয়েছে বড় বড় পিলার দেওয়া নাটমঞ্চ। এটি ছিল গোপীনাথ মন্দির। রাসমঞ্চ পিলার দেওয়া পাশ্চাত্য ঘরানার রাধাকান্ত মন্দিরটি আটচালা অলংকরণ সমৃদ্ধ। প্রতিষ্ঠা ১৭৭১ খৃঃ।

প্রতিষ্ঠা লিপি হল ঃ

"শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৯৩, সন ১১৭১ সাল, (১১৭৮ ?) ইং ১৭১৭ খৃঃ
নায়েক শ্রী হরানন্দা মণ্ডল, কারিগর শ্রী বুলাচন্দ্র মিস্ত্রী।"

এই মন্দিরের সামনেও নাটমন্দির রয়েছে। ইউরোপীয় কারুকার্য যথেষ্ট। বৈষ্ণব হওয়ায় মণ্ডলদের সব মন্দিরই প্রায় রাধাকৃষ্ণ নামধেয়। একটি মাত্র আটচালা শিব মন্দির। তাও কিছুটা দূরে। অলংকরণ নেই। দোলমঞ্চটি জঙ্গলাকীর্ণ ও জীর্ণ। দূরের নাচঘরটি জলটুঙী নামে খ্যাত। বিশাল সানের পুকুরের মাঝখানে এটি ইউরোপীয় প্রথায় নির্মিত।

বাখরাহাটের আটচালা কৃষ্ণরাইজীর মন্দিরটি ১৭৩৪ খৃঃ নির্মিত। এটি কৃষ্ণচরণ মণ্ডল কৃত এবং মিস্ত্রী নন্দদুলাল।

আটচালা মন্দিরগুলির মধ্যে সাম্প্রতিককালে তৈরী মন্দিরগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে ১৯২৫ খৃঃ তৈরী ঢেউ খেলানো আচ্ছাদন যুক্ত এবং ময়ূর, পাখী, ফুল, চক্র ইত্যাদি অলংকরণ সমৃদ্ধ জয়রামপুরের শিব মন্দিরটি। পঙ্খের কাজ এবং চুন, সুরকি, বালি ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। আধুনিক কালের নবরত্ন মন্দিরগুলির মধ্যে স্তূপশীর্ষ মিশ্ররীতির নবরত্ন মন্দির হল বোড়ালের ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির। নির্মীয়মান মহাপ্রভু মন্দির নবরত্ন, বারুইপুর; পঞ্চরত্ন বিশালাক্ষী মন্দির, বারুইপুর।

প্রাচীন আটচালা মন্দিরগুলির মধ্যে কেশবেশ্বরের মন্দির বিখ্যাত। এই মন্দির নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। মন্দিরটি জমিদার কেশব রায়চৌধুরী কর্তৃক ১৭৪৮ খৃঃ নির্মিত। মিস্ত্রী বাসুদেব। বারাশতের **আদ্যামহেশ** (১২০৪-১২১৫ বঙ্গাব্দ) ও গদামথুরার **গোবিন্দেশ্বর মন্দিরটি** কেশবেশ্বরের সমসাময়িক। আদ্যমহেশ এর নাম কৃষ্ণরাম দাসের (১৬৮৬ খৃঃ) রায়-মঙ্গল কাব্যে জানা যায়। বারুইপুরের কল্যাণেশ্বরের মন্দিরের নামও সেখানে আছে।

অম্বুলিঙ্গ শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে (১৫৪৬ খৃঃ)। পাইকানের (ফলতা) বুড়োশিব মন্দিরটি ১১৮৮ বঙ্গাব্দে এবং বর্তমান **বোল সিদ্ধির** (কেশবেশ্বরের চেয়ে প্রাচীনতর সময়ে মূল মন্দিরটি নির্মিত) মন্দিরটি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে তৈরী।

বাপুলী বাজারের পাঁচটি আটচালা শিব মন্দিরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রতিষ্ঠালিপি ছিল। কিছু শিল্পকর্ম এখনো অবশিষ্ট আছে। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তৈরী।

মন্দিরময় দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় আটচালা মন্দির এবং এরূপ শিবমন্দিরই সংখ্যায় বেশী। সারা দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জুড়ে এরূপ অসংখ্য শিব মন্দির আছে।

অনেক রেখ দেউল ছিল সম্ভবত একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। একটি মাত্র রেখ দেউল এখনো দাঁড়িয়ে আছে তা হল জটার দেউল। বর্তমান রায়দীঘি থানায়। রায়দীঘি (মণি নদী) নদী পেরিয়ে পরপারে কঙ্কণদীঘিতে নেমে হাঁটা পথে যাওয়া যায়। এখন ইটপাতা রাস্তা হওয়ায় জটার দেউল পর্যন্ত ভ্যানে (সাইকেল ভ্যান) যাওয়া যায়। তবে সব সময় ভ্যান যায় না – ব্যবস্থাক্রমে যাওয়া যায়।

সুন্দরবনের ১১৬ নং লাটে একটি উচ্চভূমির উপর পঞ্চরথ ভিত্তি বিশিষ্ট (A.S.I) নিম্ন অভ্যন্তরীণ গর্ভগৃহ যুক্ত আটচালা এই সুপ্রাচীন রেখ দেউলটি এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমুদ্র সান্নিধ্য, লবণাক্ত জলবায়ু, বারিপাতের প্রাচুর্য, সেঁত সেঁতে নিম্নভূমি ও বনময় পরিবেশ, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, বন্যা, অধিকাংশ সময় নিম্নচাপ এবং নদীবাঁধ ভাঙার তাণ্ডব সত্ত্বেও এই রেখ দেউলটি এখনো তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে – এটা এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। জটার দেউলের নিকটে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে একটি তাম্রলিপি পাওয়া যায়। তাম্রলিপিটি থেকে জানা যায় যে ৮৯৭ শকে অর্থাৎ ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়ন্ত চন্দ্র এই মন্দিরটি তৈরী করান (List of Ancient Monuments in the Presidency Division - P221 – 222)।

হিন্দুযুগে বাংলাদেশে যে চারটি শৈলীর মন্দির তৈরী হত তা হল, ক) রেখ বা শিখর দেউল, খ) পীড়া বা ভদ্র দেউল, গ) শিখরশীর্ষ পীড়া বা ভদ্র দেউল এবং ঘ) স্তূপ শীর্ষ পীড়া বা ভদ্র দেউল। রেখ বা শিখর শৈলীর মন্দিরই নির্মিত হয়েছিল বেশী। অন্তত তাদের বিভিন্ন নিদর্শন দেখে তো তাই মনে হয়। প্রাচীন বাংলায় এই রেখাচর্চার প্রভাব কিন্তু এসেছিল ভিন্ন প্রদেশ থেকে। "উড়িষ্যার রেখদেউল নির্মাণ রীতিটি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিল বাঙলার মন্দির স্থপতিরা" (চব্বিশ পরগনার মন্দির–অসীম মুখোপাধ্যায়)।

রেখ দেউলগুলির প্রধান চারটি অংশ ঃ পিষ্ট বা তলপত্তন, বাড়, গণ্ডী এবং মস্তক। তলপত্তন অর্থাৎ ভিত্তিটি নীচে থেকে এমনভাবে উঠেছে যে তা দেখা যায় না, মনে হয় যেন বিমান বা দেউলটি ভিত্তি ছাড়াই সোজা উপরে উঠে গেছে। জটার এই মন্দিরের ক্ষেত্রেও তাই। বাড় অর্থাৎ মধ্যমভাগের তিনটি অংশ ঃ পাদ, জাঙ্ঘ ও বরণ্ড। এই মধ্যভাগে জটার দেউলে কয়েকটি আনুভূমিক রেখার সৃষ্টি করা হয়েছে যা বন্ধনা নামে পরিচিত। এই বন্ধনার উপর ও নীচ এই দুইভাগ এখানে আছে – উপরের ভাগ উপর জাঙ্ঘ এবং নীচের অংশ তল জাঙ্ঘ। রেখ দেউলের গণ্ডী তার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের প্রতীকগুলি ধরে রাখে। গণ্ডীর মধ্যে ক্ষুদ্র দেউল, চৈত্য -অলিন্দ ও পুষ্প পত্রের সৃষ্টি করে সুষমামণ্ডিত করা হয়। এক্ষেত্রেও তাই ছিল। রেখ দেউলের মস্তক চারটি ভাগে বিভক্ত ঃ বেঁকী, আমলক, কলস ও পতাকাদণ্ড। জটার দেউলের মস্তক অংশ অর্থাৎ শীর্ষদেশ ভগ্ন ছিল না, একে গুপ্তধন প্রাপ্তির আশায় ভাঙা হয়েছিল। শীর্ষদেশ তাই পরবর্তী কালে কোনভাবে জোড়াতালি দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

বাড় ও গণ্ডী গাত্রে প্রচুর অলংকরণ ছিল। পঞ্চাঙ্গ বাড়, এবং রথপগ ছিল তিনটি অর্থাৎ মন্দিরটি ছিল ত্রিরথ আসন মন্দির। গণ্ডীর গায়ে ক্ষুদ্র দেউল এবং অসংখ্য চৈত্য-অলিন্দ যে ছিল সেকথা বলা হয়েছে। অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গশিখর এক একটি সরলরেখায় উপর দিকে উঠে গেছে। আদিতে এই মন্দিরটি অপূর্ব সুন্দর ছিল। ভূমি আমলক ও মার্জিত রথপগ বিন্যাসে জটার দেউলের আকৃতি একটু শিরা বিশিষ্ট প্রায় গোলাকার মন্দিরে পরিণত করেছে। ভূমিগত আকৃতি একই রেখায় অবস্থিত না হলেও এটি প্রায় বর্গাকৃতি ভূমির উপরে অবস্থিত। কেননা এর দৈর্ঘ ও প্রস্থ প্রায় ৩২ ফুট করে। অভ্যন্তরীণ গর্ভগৃহের পরিমাণও প্রায় ১০ ফুট x১০ ফুট(বস্তুত ১০'৯" x ১০'৯")। প্রবেশ পথ সর্দাল রীতিতে নির্মিত মন্দিরের পূর্বগাত্রে প্রায় ১৬ ফুট উঁচু এবং প্রস্থ ৯.৫ ফুট। চারিদিকেই দশ ফুট পুরু দেওয়াল। এজন্যই বহির্গাত্রের পরিমাণ এক এক দিকে ৩২ ফুট। উচ্চতা প্রায় ১০০ ফুট। পাতলা ইটে গাথুনি মর্টার চুন, সুরকী এবং বিশেষ ধরনের গাছ পাতার রস বা ক্বাথ। এই চুন শামুক পুড়িয়ে তৈরী করা হত।

অনেকেই জটার দেউলকে 'ত্রি-রথ' মনে করেন – কেননা ভিত্তিভূমি ত্যাগ করে বিমান যখন উর্ধমুখে যাত্রা করে তখন এই রথের সৃষ্টি হয়। রথ এবং পগ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

উর্ধগামী সৃষ্ট রেখ মধ্য বন্ধনী, পগ এবং এগুলির সৃষ্ট খাঁজ রূপসৃষ্টির এক বিশেষ শৈলী চিত্র। মন্দিরটি দেখতে হলে অনেকক্ষণ সময় লাগে এবং এর শিল্প সৌন্দর্যে হতবাক হতে হয়। মন্দির গাত্রে শিল্প কাজ কিছু কিছু এখনো লক্ষিত হয়। ফুল, গোল পদ্ম কোন কোন অংশে রয়েছে। সরু সরু ইট দিয়ে রেখ এবং বিন্দুমালা সৃষ্টি; সৃষ্ট দুটি রেখর মাঝখানে ভিতরে তৈরী হওয়া খাঁজগুলি রেখগুলির স্পষ্টতা দিয়ে একটি বিশেষ মর্য্যাদার শিল্প সৃষ্টি করেছে। বাঁধনী বা বলয়গুলি একাধারে মন্দিরটিকে যেমন স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করেছে তেমনি দর্শককে শিল্প সৌন্দর্যে আপ্লুত করেছে; যেজন্য জটার দেউল আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি। মন্দিরটির আবিষ্কর্তা কালিদাস দত্তের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়, কেননা তাঁর প্রচেষ্টায় সরকার এবং ASI এটির সংরক্ষণ করে যদিও তা যথেষ্ট নয়। এরকম মন্দির হল বহুলাড়ার ইচ্ছাই ঘোষের মন্দির এবং পুরুলিয়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির। কথিত যে জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ার ফলে একটি জটাধারী বাঘ বাস করত বলে এটিকে জটার দেউল বলে। কেউ বলে বাবাজটাধারী শিবের মন্দির বলে জটারদেউল বলে। আবার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের মত অনেকেই একে জৈন মন্দির বলেন। কেউ কেউ এই মন্দিরকে বৌদ্ধদেউলও বলেছেন (Pagoda)।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার অনেক স্থলেই পাল যুগের এই জটার দেউলের মত দেউলের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে। যেমন বনশ্যাম নগর, ভরতগড়, বিরিঞ্চিবাড়ী, নলগোড়া ইত্যাদি। সাগরে এরূপ একাধিক ধ্বংসাবশেষ আছে। তার মধ্যে মন্দিরতলা ও রথবাড়ি উল্লেখযোগ্য। **মন্দিরতলার ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি** পালযুগের বলে অনুমিত। কিছুদিন আগে ক্ষেত্রানুসন্ধানের সময়ে মন্দিরতলার মন্দিরের ধ্বংস স্তুপের মধ্য থেকে মন্দির গাত্রে একটি মন্দির শিল্পের সন্ধান মিলেছে; বর্তমান প্রবন্ধকারের সঙ্গে ছিলেন নরোত্তম হালদার প্রমুখ অন্য গবেষক গণ। দেওয়াল গাত্রে আগে থেকে হিসেবমত তৈরী করা কয়েকটি সামান্য খোদিত ইট গাঁথুনির সময় পরপর সাজিয়ে তৈরী। তাতে উভয়দিকে পত্র বিশিষ্ট একটি বৃক্ষশাখা—পল্লব যেন উঠে

গেছে। একটি স্পষ্ট আকৃতি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন একটি বড় প্রজাপতি সবে উড়ে এসে দেওয়াল গাত্রে বসেছে। সুন্দর একটি শিল্প এবং সার্থক এর সৃষ্টি (দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বিস্মৃত অধ্যায় – কৃষ্ণকালী মণ্ডল,১৯৯৯)।

প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরে বলা যাবে আগে মন্দিরবাজারের কেশবেশ্বর মন্দির সম্বন্ধে একটু বলে নিই।

কেশবেশ্বর শিব মন্দিরটি প্রাচীন মুড়াগাছা পরগনার পাটদহের বিখ্যাত জমিদার কেশব রায়চৌধুরীর কর্তৃক ১৭৪৮ খৃঃ নির্মিত। এই মন্দিরটির নির্মাণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রভূত বিত্তশালী জমিদার রাজা কেশব রায়চৌধুরী অপুত্রক ছিলেন। তাঁর দুই মহিষী পুত্র বরলাভের আকাঙ্খায় আশুতোষ শিবের কঠোর পঞ্চতপাব্রত উদযাপন করেন। ব্রতের শেষে দেবাদিদেব মহাদেব রাজা কেশব ও তাঁর রাণীদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে পুত্রলাভের বর দান করেন। রাজার প্রার্থনায় রাজি হয়ে মহেশ্বর লিঙ্গরূপ ধারণ করে তাঁর রাজ্যে অবস্থান করতে স্বীকৃত হন। তারই নির্দেশ মত কেশব নিজে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাট থেকে লিঙ্গমূর্তি এনেছিলেন। মন্দির নির্মাণার্থে রামচন্দ্রপুরের শিল্পী বাসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব দেন। বানচাপড়া বা বাইনচাওড়ার জঙ্গল পরিষ্কার করে কেশবেশ্বর মন্দিরটি নির্মিত হয়। বিভিন্ন স্থানের বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বোলসিদ্ধি গ্রামের সিদ্ধপুরুষ বাণেশ্বর ন্যায়রত্ন।

দক্ষিণ বাংলার অধিকাংশ শিবমন্দিরের মত বাণচাপড়ার কেশবেশ্বর শিব মন্দিরও একটি আটচালা বৈশিষ্ট্যের বিখ্যাত মন্দির। বস্তুত সমসাময়িক বা কিছু আগে পরে যে সব আট চালা মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং এখনো ভালো অবস্থায় আছে (পুনঃ পুনঃ সংস্কার সত্ত্বেও) সেগুলির মধ্যে কেশবেশ্বর মন্দিরকেই সবদিক থেকে উৎকৃষ্ট বলা চলে। তবে গঠন শৈলীর নিরিখে চালাগুলি যতটা বক্রতা পাওয়া উচিত তা পায়নি। প্রথম চারটি চাল যেমন সোজা ভাবে নেমে এসেছে তা একটু সামঞ্জস্যহীন। আবার মন্দিরের অবয়বের তুলনায় প্রথম চারটি চালা উপরে উঠে গিয়ে যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। ফলে সেখানে মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে একটি বৃহৎ শূন্যস্থান থেকে গেছে। তাই সেখানে তুলনামূলকভাবে একটি চওড়া আয়তকার প্ল্যাটফর্ম তৈরী হয়েছে মনে হবে — যেখান থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট চারটি দেওয়াল উঠে গেছে এবং তার শীর্ষদেশ থেকে ক্ষুদ্রাকৃতি চারটি চালা নেমে এসেছে। তুলনামূলকভাবে উপরের চালাগুলি কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মন্দিরটির উপরোক্ত ভাবে গঠন শৈলীর সামান্য ত্রুটি থাকলেও সামগ্রিকভাবে মন্দিরটি সুন্দর এবং সুঠাম। বিশাল আয়তনের এই মন্দিরটি আয়তকার। আয়তন ৪১ ফুট ৪ ইঞ্চি x ৩৩ ফুট ১ ইঞ্চি। মাটির উপর থেকে চাতাল বা প্লিন্থ লেভেল ছয়ফুট এবং শোনা গেল মাটির ভিতরের ভিত প্রায় ৮ – ১০ ফুট এবং বিশাল চওড়া ও উঁচু করে গাঁথা। আসনের উচ্চতার চেয়ে দেওয়ালের উচ্চতা কম হওয়ায় মন্দিরটিকে কিছুটা খর্বাকৃতি মনে হয়। অন্যদিকে দেওয়ালের আসনের তুলনায় আচ্ছাদনটি বেশ ছোটো। দ্বিতীয় স্তরের চারচালাটি কিছুটা শোভন হলেও খর্বাকৃতিই এবং চারচালার চালগুলির সুশোভন বক্রাকৃতি – বৈশিষ্ট্যগুলি সঠিকভাবে নেই।

নীচের চালগুলির মতোই প্রায় খাড়াভাবেই নেমে এসেছে। শিখর চালাটি নীচের আয়তনের সঙ্গে সঠিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে, যে কথা আগেই বলা হয়েছে যে, শিখর ও মূল মন্দিরচালার মাঝখানে যে সামতলিক ক্ষেত্রটি তৈরী হয়েছে তাতে একটি খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে; এতে মূলমন্দিরের সৌন্দর্যের অঙ্গহানি ঘটেছে। এটি গেল গঠনরীতির বহির্বিভাগীয় সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি। অন্যথায় সাধারণভাবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে বিশালবপু এই আটচালা মন্দিরটি একটি সৌন্দর্যের আকর বিশেষ।

মন্দির হিসাবে এটি সাধারণ পর্যায়ের নয়। এককভাবে দেওয়াল উঠে গিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহ সৃষ্টি করেনি। মূল মন্দির – দেওয়ালের তিনদিকে (পূর্ব,দক্ষিণ এবং উত্তর) মূল চাতাল (Plinth) এবং মন্দির গর্ভগৃহের দেওয়াল-এর মাঝখানে আচ্ছাদনযুক্ত অতিরিক্ত একটি দালান বা অলিন্দ আছে অর্থাৎ তিনদিকেই এই তিনটি অলিন্দ বিদ্যমান। এই অলিন্দগুলির তিনদিকের দেওয়ালেই তিনটি করে প্রবেশ পথ আছে, এগুলি চারটি করে বৃহদাকার অথচ খর্বাকৃতি সুন্দর পিলার দিয়ে তৈরী। চারটি ঐ রকম পিলারের মাঝখানে যে তিনটি খিলান বিদ্যমান সেগুলি অনেকটা অর্ধবৃত্তাকার – এর উপর অংশটি কিছুটা সূচালো। মোটা দেওয়ালের এই পিলারগুলি উভয় দিক থেকেই এই খিলানগুলি রক্ষা করছে। খিলানগুলির সামনের অংশটির অর্ধাংশ অর্থাৎ মূল পিলারগুলির মধ্যস্থল-এর (প্লিন্থ থেকে প্রায় ছ'ফুট উপরে) উপর থেকে আরম্ভ হওয়া সূচালো মুখ বিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার অংশটি খাঁজ কাটা একটি বিশেষ ধারায় তৈরী। মন্দির শৈলীর যতরকম শিল্প বৈচিত্র্য দৃশ্যমান তা এই পিলারগুলির উপরে অবস্থিত (প্রায় ছয় ফুট উপর থেকে) মন্দির আচ্ছাদনগুলি নেমে আসা স্থানগুলির মধ্যে। প্রসঙ্গত বলে রাখি দক্ষিণ বাংলার এই সময়কার এবং তার পরবর্তীকালে তৈরী আটচালা মন্দিরগুলির চারিদিকের চারটি কোণা এমনভাবে তৈরী করা হত যাতে একটি খাঁজ কাটা কৌণিক রেখার সৃষ্টি হয় উপর থেকে নীচ পর্যন্ত। সে কারণে অধিকাংশস্থানে মন্দির দেওয়ালের কোণ চারটিতে গাঁথার সময় মোটা টালির ব্যবহার দেখা যায়। তাতে ঠিক কোণাটি বরাবর যেমন একটি রেখার সৃষ্টি করে তেমনি তার উভয়পার্শ্বে খাঁজকাটা একটি সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। কেশবেশ্বরের মন্দিরটির গঠন প্রণালীও তার ব্যতিক্রম নয়। পূর্বোক্ত খিলান স্তম্ভ চারটির পরে এই মন্দিরটির কোণার পিলারগুলি আরম্ভ হয়েছে। তার মাঝখানে দুইথাক ছোট বড় লম্বালম্বি খাঁজের সৃষ্টি করে গঠনভঙ্গীটিকে একটি বিশেষ শিল্প সুষমা দান করা হয়েছে। কোণার পিলারগুলিও বিশাল আয়তনের এবং পূর্বোক্তরূপ খাঁজকাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত। কোণার স্তম্ভগুলিতে যে টালি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি একক নয়। প্রতি ক্ষেত্রে তিনটি করে টালি ব্যবহার করে আচ্ছাদন পর্যন্ত আটটি ব্লক তৈরী করা হয়েছে। প্রতিটি ব্লকের মাঝখানের প্লাস্টারিং উভয় দিকে আলাদা আলাদা দুটি মোটা রেখার সমষ্টি যুক্ত এক একটি পিলারের অবয়ব তৈরী করেছে। তার পাশে দেওয়ালের দিকে সুন্দর লম্বা লম্বা (অনেকটা ঘন্টাকৃতির) তিনটি করে বলয় বিশিষ্ট মোটা খুঁটির মত ডিজাইন তৈরী করা হয়েছে। দুদিকে এরকম দুটি সুরু খুঁটি মত ডিজাইন আকৃতির মধ্যে ভিতরে ঢোকানো চৌখুপী খোপাকৃতি দুই সারিতে তেরটি তেরটি হিসাবে বিদ্যমান। এই জাতীয় চৌখুপী মন্দিরাচ্ছাদন বা চালাগুলির নীচে প্রতিদিকে পাঁচটি পাঁচটি ব্লকে ভাগ করে প্রতিভাগে দুই সারিতে চারটি চারটি করে খোপ

রয়েছে। এর পরে উপর থেকে নীচে অর্ধবৃত্তাকার খিলান পর্যন্ত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। খিলানের উপরে তিন-চারটে রেখার সৃষ্টি করে পিলারগুলির মাঝখান পর্যন্ত এক একটি ব্লকের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার উপরে পূর্বোক্ত ঐ একইরকম বলয়যুক্ত দুই সারি মোটা রেখার সৃষ্টি করা হয়েছে খিলানগুলির উপরে একপাশ থেকে অন্যপাশ পর্যন্ত ব্লকগুলিতে। উপরে চালার নীচে যে খোপকাটা ব্লকের কথা বলা হয়েছে তার নীচে এবং খিলানগুলির উপরের অংশটির মধ্যে যে অংশটি রয়েছে সেখানেও একটি সুন্দর খাঁজকাটা লাইন দিয়ে দুটি ভাগে ভাগ করে ঐ গুলির মধ্যে যে আর্টের প্রকাশ, তাতে রয়েছে লতা, পাতা, ফুল — বিশেষ করে গোলাকার পদ্মের ছড়াছড়ি রয়েছে সমস্ত খালি অংশটিতে। তার উপরের ঐ গথিক অনুকৃতির পদ্মের কাজটিকে দূর থেকে এক একটি লতার মতো মনে হবে এবং তার নীচে ঐ পদ্ম ফুল। সামনের বহির্গাত্রে এরকম বারোটি এবং উত্তর-দক্ষিণ দিকে আটটি করে খোপে আটটি গোল পদ্ম রয়েছে। দক্ষিণে তার নীচে রয়েছে এক বলয় বিশিষ্ট গোলাকার অর্ধবৃত্তাকৃতিতে বাঁকানো (অনেকটা দু'পাশের তিন বলয় বিশিষ্ট উপরে নীচে বিস্তৃত মোটা পিলারের মত কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরু অনুকৃতির) দুটি করে 'বিট'। তার নীচে একটু ঢেউ খেলানো ঘন্টাকৃতি লম্বা চেন — তার নীচের অংশটিকে উপরে নীচে খিলানগুলির মাথা সহ দুই পিলারের মাঝখান দিয়ে উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি করে ব্লক এবং সামনে তিনটি খিলানে তিনটি করে ব্লক রয়েছে। দুই পার্শ্বদেশ অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণে ছোট ছোট এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য সামনের দিক অর্থাৎ পূবদিক অপেক্ষা অনেক কম। এই দুই দিকে খিলানও দুটি করে। কিন্তু এই দুই দিকে প্রতিটি ব্লকের উভয় দিকে দুটি দুটি চারটি বিশাল আকৃতির চার থাক দল বিশিষ্ট প্রস্ফুটিত গোলাকার পদ্মের ডিজাইন এবং তাদের সৌন্দর্য অনেকক্ষণ ধরে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে হয়। পাশেই এর উপরের ক্রমহ্রাসমান বিস্তৃত চারটি করে রেখা (নীচেরটি অপেক্ষাকৃত কম বিস্তৃত) তৈরী করা হয়েছে এবং তার উপরে বলয়-লতা ও পদ্ম এবং তারও উপরে যে বলয় বিশিষ্ট গোলাকার রেখার সৃষ্টি করা হয়েছে তা এক কথায় অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত তো হয়েছেই উপরন্তু এগুলোর উপর থেকে নেমে আসা বৃষ্টির জলস্রোতের গতিকে প্রতিপদে পদে প্রতিহত করে শিল্পকাজগুলিকে এবং সৃষ্টি সৌন্দর্যকে রক্ষা করে চলেছে। এই দুই দিকের বড় পদ্মগুলির দুই পাশে উপর নীচেও রয়েছে একই রকমের ক্ষুদ্রাকৃতি অজস্র পদ্মের সারি। সবদিকে খিলানের উপর দিকের মোটা চওড়া এবং বেশ পুরু পিলারগুলিতেও উপর নীচে অনেকগুলি করে খাঁজের সৃষ্টি করা হয়েছে উভয়দিকে এবং ঠিক মাঝখান দিয়ে কোণার দিকের মূল পিলারের মত একটি করে (অপেক্ষাকৃত সরু) গোলাকার (অনেকগুলি করে) দ্বি-বলয় যুক্ত অভিনব পিলার সৃষ্টি করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। পার্শ্ব পিলারের কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য কাজের সঙ্গে প্যাঁচানো দড়ির মত কাজ করা সরু পিলারও লক্ষ্য করা যায়। এগুলি দিয়েই খিলান ব্লকের পার্শ্বরেখা তৈরী হয়েছে এবং এগুলিতে চারটি করে পদ্ম দিয়ে বলয় তৈরী করা হয়েছে। এরই সঙ্গে যুক্ত উপরের গোলাকার লতা প্যাঁচানো আকৃতির সরু গোলাকার রেখায় দশটি করে এবং অপর দিকের নিম্নে চারটি করে পদ্ম আছে। এরই নিম্নে এবং ভিতরের দুই পাশে অপর যে দুটি Space বা থাক আছে সেখানে প্রথম থাকটির উভয়দিকে উপর নীচে পাঁচটি করে এবং উত্তর দক্ষিণে আড়াআড়ি দশটি করে ক্ষুদ্রাকৃতির

প্রস্ফুটিত পদ্ম তৈরী করা হয়েছে। তার নিম্নের Space টিতেও ঐ একইভাবে পাঁচটি এবং দশটি করে প্রস্ফুটিত পদ্মের সারি রয়েছে। এগুলি সামনের তিনটি স্তম্ভের খিলানের ব্লকেই রয়েছে। ঐ দুই সারি পদ্মের নীচে রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা ও ফুল দ্বারা নির্মিত কারুকার্য। এই ফুলগুলি ছোট, মাঝারি ও বড় — নানা আকৃতির প্রস্ফুটিত পদ্ম। কিছু কিছু লতা ও পাপড়ি আছে — মাঝে নানরকম রেখার সৃষ্টি করা হয়েছে। আর প্রতিটি ব্লকের খিলানের উভয় পার্শ্বে সরু সরু তিনটি রেখায় এবং তার উপরে নিম্নগামী দুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্ররেখায় এক একটি পতাকা শোভিত সুন্দর আটচালা মন্দিরের প্রতিকৃতি তৈরী করা হয়েছে। উভয় দিকে এরকম মন্দির প্রতিকৃতির সংখ্যা দশটি দশটি করে কুড়িটি। সামনের তিনটি ব্লকের প্রতিটিতেই এরকম আটচালা মন্দিরের প্রতিকৃতি রয়েছে। পদ্মফুল, রেখা এবং অন্যান্য ডিজাইনগুলি পঙ্খ ও স্টুকোর কাজ। অত্যন্ত যত্ন ও ধৈর্য সহযোগে দীর্ঘ সময় ধরে মননশীল শিল্পীর সৃষ্টি কল্পনার বাস্তব রূপায়ণ এটি। টেরাকোটা ফুল ও অন্যান্য কাজও কিছু রয়েছে। পাঁচ-ছয়টি টেরাকোটা মূর্তিফলক এখনও মন্দির গাত্রে অবশিষ্ট আছে। এগুলির বেশীরভাগই সামনের ঐ তিনটি খিলান ব্লকের একেবারে নীচে অবস্থিত; সবগুলিই ঐ খর্বাকৃতি সামনের চারটি পিলারের মাঝখানে একদম নীচের থাকে লাগান। মূল চারটি পোড়ামাটির মৃত্তিকাফলক রয়েছে সামনের ঐ চারটি মূল পিলারের শিল্পায়নের নিম্নস্থলে (প্লিন্থ লেভেল থেকে প্রায় সাত ফুট উপরে অবস্থিত)। দ্বিতীয় পিলারের (দক্ষিণ দিকের) এবং তৃতীয় পিলারের (উত্তর দিকের) উপর লাগান ঐ টেরাকোটার ব্লক দুটির প্রত্যেকটিতে একটি পুরুষ দেবতার মূর্তি এবং তার পাশে প্রণামরত এক পূজারিণী বা দেবীমূর্তি জোড় হস্তে ত্রিভঙ্গ অবস্থানে দণ্ডায়মান। পুরুষ দেবমূর্তিটির মুকুটাবৃত মস্তক, নিম্ন ডান হাতটি দেহের সঙ্গে একটু বেশী ব্যবধানে একটি বক্রাকৃতিতে ঝোলান, নিম্ন বাম হাতটি ঐ দেবীর দিকে প্রসারিত। পরনের বস্ত্রাঞ্চলগুচ্ছ দুই পায়ের ফাঁকে দৃশ্যমান; চতুর্ভূজ মোটা সোটা দোহারা চেহারা। দেবী বা পূজারিণী মূর্তিটি জোড় হস্ত, মুকুটাবৃতা, সালংকারা, বস্ত্রাঞ্চল পশ্চাদ্গামী, ত্রিভঙ্গ অবস্থান। দুটি ব্লকের উপরে একটি করে হস্তীমূর্তি উভয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে (যদিও ব্লক দুটির অবস্থান মাঝখানের আলাদা আলাদা দুটি পিলারের উপর)। ব্লকের মধ্যস্থিত মূর্তিগুলি এত অধিক পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত যে তাদের সঠিক পরিচয় নির্দেশ করা যায় না। অপর দুটি টেরাকোটা ফলক প্রথম (দক্ষিণ দিকের) ও চতুর্থ পিলারের (উত্তর দিকের) উপর লাগান। এই মূর্তি ফলকের উপর কোন হস্তী বা অন্য কোন ফিগার নেই। ফলক দুটির মূল মূর্তিটি দেবীমূর্তি, দ্বিভঙ্গে দণ্ডায়মানা, চতুর্ভূজা, মুকুটাবৃতা। সম্ভবত ইনি তাঁর বাহনের উপর দণ্ডায়মানা। সম্মুখে পূজারিণী জোড়হস্তে দ্বিভঙ্গে দণ্ডায়মানা। তাঁর বস্ত্রাঞ্চল পশ্চাৎদেশে দোদুলামান। এই দেবীর পরিচয়ও সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় না মূর্তিটির ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য। এছাড়াও এই ব্লকগুলির একপাশে রয়েছে একটি করে ময়ূর, সুন্দর ফুল, লতাপাতা ইত্যাদি। উত্তরদিকের পিলারের নিম্ন সানুদেশে ময়ূর, ফুল, লতাপাতা এবং 'ওম' চিহ্ন অঙ্কিত। দক্ষিণ দিকের কয়েকটি পিলারের নীচে, মাঝখানে এবং উপরে ছোট বড় পদ্মফুল এবং অন্যান্য ফুলের ব্লক করা টেরাকোটা ফলক লাগান আছে। লাগান আছে জোড়া ময়ূর ময়ূরীর টেরাকোটা ফলক, চৌকোণা (ভেন্টিলেটার টাইপের) স্টার আকৃতির চার পাঁচটি ফলক, বৃহদাকৃতির কয়েকদল

বিশিষ্ট প্রস্ফুটিত গোলাকার পদ্মফলক ইত্যাদি। দালানের ভিতরে দেবতার সম্মুখ দরজার উপরের দেওয়ালে নানারকম ফুল, লতাপাতা, বুটি,বলয় বিশিষ্ট সরু মোটা রেখা ইত্যাদি আঁকা আছে। এখানে কোন টেরাকোটা ফলক দেখা যায় নি। সবই পঙ্খ, চুন ও প্লাসটারিং — এর কাজ। বাইরের পিলারে ও অন্যত্র লতাপাতা ও আলপনার মত অলংকরণ রয়েছে। অসীম মুখোপাধ্যায়ের 'দক্ষিণ চব্বিশপরগনার মন্দির' বইটি থেকে জানা যায় যে উপরোক্ত মূর্তিফলকগুলি সেবিকা বেষ্টিত বিষ্ণু ও চণ্ডীর। কালিদাস দত্ত এই মন্দিরে বহু পৌরাণিক দৃশ্য, পশু, পাখী ইত্যাদি দেখেছিলেন। মন্দিরের শিল্পকার্য ও গঠন শৈলী সম্বন্ধে অসীম মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য ঃ "আয়তন বা অঙ্গসজ্জায় এই মন্দিরের অভিনবত্ব ফুটে ওঠেনি। অলিন্দ পরিকল্পনাতেই অভিনবত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। গর্ভগৃহ এবং অলিন্দের দেওয়াল সরদাল দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয়েছে। সম্মুখভাগে সরদালের সংখ্যা দুটি। অন্য দুদিকে একটি। প্রতিটি সরদালের উপরে স্থূলদেহ,খর্বাকৃতি স্তম্ভ দণ্ডায়মান। এই স্তম্ভ উপরের গম্বুজের ভার বহন করছে। এই অভিনব পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য ছিল। শিল্পী বাসুদেব তাঁর কীর্তিকে স্থায়িত্ব দান করতে চেয়েছিলেন। বিশালায়তন মন্দিরের দেওয়াল কেবলমাত্র খিলান ও স্তম্ভের উপর দার্ঘকাল নির্ভর করবে না, সম্ভবত এই রকম কোন আশঙ্কা তাঁর মনে দেখা দেয় এবং সরদালের সাহয্যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি করে গর্ভগৃহ ও অলিন্দের দেওয়ালের পতন রোধের ব্যবস্থা করেন। অলিন্দের আচ্ছাদনকে স্থায়িত্ব দানের জন্য এই সরদালের উপর শক্তিশালী খর্বাকৃতি স্তম্ভ বসানো হয়, স্তম্ভগুলি আচ্ছাদনকে ধারণ করে আছে। বাহ্যিক গঠনের ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও আয়তন, অঙ্গসজ্জা এবং অভিনবত্বে মন্দির বাজারের এই কেশবেশ্বর মন্দির চব্বিশপরগনা তথা পশ্চিমবাংলার আটচালা মন্দিরশৈলীর এক উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় দৃষ্টান্ত।"

এই সঙ্গে একটু যোগ করতে চাই। সরদাল সিস্টেমের দালান মন্দিরের পরিকল্পনা শিল্পীর বাস্তব পরিকল্পনায় এসেছিল এই কারণে যে তখনকার দিনে বড় বড় জমিদারবাড়ীর দালানকোটা বাড়ীগুলি তৈরীর অভিজ্ঞতা এই শিল্পীর ছিল। তাছাড়া আচ্ছাদন চালার ভার এই দালান কোঠাগুলির ওপর পড়ায় মূল মন্দিরের দেওয়াল গর্ভগৃহ বরাবর উঠে গেলেও একই উচ্চতায় দালান দেওয়ালগুলি উঠতে পারেনি। ফলে মন্দিরের চেহারা এরকম বেঢপ হয়েছে এবং সেখানে ত্রুটির জন্য নয়, সঙ্গত কারণেই চালা মন্দিরের গঠনরীতিতে কিছু ব্যতিক্রম হয়েছে। মন্দিরের স্থায়িত্বের প্রশ্নই শিল্পীকে প্রভাবিত করেছে ফলে গঠন রীতির ব্যাকরণ এক্ষেত্রে মানা সম্ভব হয়নি। আর তাই আজও আমরা এই মন্দিরটিকে এখনো সুস্থ দেখি। অবশ্য নির্মাণ কাল ১৭৪৮ খৃঃ হলেও (বাংলা ১১৫৫) তিনটি ফলক থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে এবং ১৪০২ বঙ্গাব্দে দুইবার সংস্কারিত ও পুনঃসংস্কারিত হয়েছিল। মূল প্রতিষ্ঠালিপিটি সংস্কৃতে লেখা আর একটি ফলক থেকে জানা যায় ঃ

"আকাশাব্ধি রস ক্ষৌনি মিতে শাকে শিবালয়ং

ভূপ শ্রীকেশবোকার্ষিদ্বাসুদেবেন শিল্পীনা।"

– ১৬৭০ শকাব্দে (বা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে) রাজা কেশবের আদেশে শিল্পী বাসুদেব কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হইল।

গর্ভগৃহে শ্বেত পাথরের প্রায় দুই ফুট উঁচু বেদীর উপর বড় আকৃতির কালোপাথরের শিব লিঙ্গটি দেবীপট্ট সহ বসানো। দেবীপট্টের মুখ উত্তর দিকে। মানতকারীরা সোনা রূপার চোখ ইত্যাদি দিয়ে গেছে। কয়েকটি রৌপ্য ও লৌহ নির্মিত ত্রিশূল রয়েছে। কালোপাথরের তিন চারটি নন্দী (ষাঁড়) বেদীর নীচে বসানো। এখানেও দুটি লিপি ফলক রয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার আর একটি ভিন্ন শিল্পরীতির মন্দিরের কথা বলা প্রয়োজন। এদুটি হল **জগদীশপুরের** (মন্দিরবাজার থানা) পিরামিড আকৃতির **শিখর শীর্ষ রেখ দেউল**। ইটের ভাঁজে ভাঁজে আনুভূমিক মন্দিরগাত্রে (নীচে থেকে উপরের সরলরেখায় নয়, পাশাপাশি) রেখার সৃষ্টি করেছে। প্রতি দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে খাঁজ করে আর একটি করে উদ্ভূত রেখা মন্দির চূড়ায় মিশে গিয়ে চারটির পরিবর্তে আটটি রেখার সমন্বয় সাধন করে (বেঁকির পরিবর্তে) একটি শীর্ষ বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। এর উপরে কলস ও পতাকা দণ্ড। টেরাকোটা বা অন্যকোন কাজ নেই — অন্তত সংস্কারাদির পর এখন নেই। দুটি মন্দিরের পশ্চিমের মন্দিরটি অর্থাৎ ভুবনেশ্বর মন্দিরটি ৮-৬-১৩৭৩ বঙ্গাব্দে ঝড়ঝঞ্ঝায় ভেঙ্গে পড়ে এবং ২-১১-১৩৭৩ বঙ্গাব্দে মন্দির পুনর্নিমাণে হাত দেন সেবায়েত ডাঃ ভূষণচন্দ্র নস্কর এবং তা সম্পন্ন হয় ৪-১২-১৩৭৬ বঙ্গাব্দে (মন্দিরলিপি)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা উপযুক্ত স্থপতি শিল্পী বা মিস্ত্রী না পাওয়ায় নতুন মন্দিরটি ঠিকভাবে পুরাতনটির মত হয়নি। পুরাতন মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ এখনো কাছেই পড়ে আছে। অভগ্ন প্রাচীন মন্দিরটি যোগেশ্বর মন্দির। গর্ভগৃহে দুটি মন্দিরে চারফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কালো কষ্টিপাথরের দুটি শিবলিঙ্গ প্রস্ফুটিত দুটি বিশদল পদ্মের (কালো পাথরের) আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। একই পাথরের কারুকার্য খচিত গোবরাট। মন্দির দুটি সম্ভবত ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। এ-জাতীয় মন্দির দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় আর কোথাও নেই।

সম্পূর্ণ অন্যধরনের একটি **শিবমন্দির** আছে সাগরদ্বীপের **নরহরিপুরে**। কচুবেড়িয়া থেকে বাসে জোড়ামন্দির স্টপেজে নামলেই এই মন্দিরটি দেখা যাবে রাস্তার কাছেই। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটির বিশেষত্ব এর সংক্ষিপ্ত বর্গাকৃতি একতলা সমান প্রাচীরের উপর ক্রমাগত শীর্ণ হয়ে ওঠা দীর্ঘ রেখ দেউল — যার বেসমেন্ট রেখাসহ মূল চারিটি রেখা একটি শীর্ষ চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছে এবং সারা দেহে ক্রমাগত উচুঁ নীচু ভাঁজের সৃষ্টি করেছে ঢেউ খেলানো ভাবে। গাঁথুনিতে একটার পর একটা ইটের কাটান দিয়ে (ভিতরে বাহিরে) এবং বাহিরের দিকে (Alternative Line –এ) ইটের Projection দিয়ে উর্দ্ধমুখে গেঁথে তোলা হয়েছে। উপরে আমলক এবং দণ্ডাদি। এই মন্দিরে উড়িষ্যারীতি সুস্পষ্ট। অসীম মুখোপাধ্যায় এই জাতীয় মন্দিরকে 'রেখ বাংলা' বলেছেন (চব্বিশ পরগনার মন্দির, পৃঃ ১৯ - ছবি নীচের বাঁদিকে)। স্টুকো, সিমেন্ট, চুন সুরকী ইত্যাদি দিয়ে তৈরী মন্দির গাত্রে বিশেষ করে দরজার উপর অংশে ও সামনের দেওয়ালে ও কোণাগুলিতে রাধাকৃষ্ণ, শিব, নন্দী, পাখী ইত্যাদির মূর্তি আছে।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার মন্দির শিল্পের সঠিক হদিশ দিতে গেলে বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রয়োজন। বহু গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রাচীন শৈলীর মন্দির ও তার শিল্প সুষমা আলোচনা বহির্ভূত হয়ে থাকল। সময়ান্তরে তা আলোচনা করা যাবে।

প্রাচীন মূর্তির সঙ্গে দেবালয়ের সম্পর্ক ঃ

প্রাপ্ত প্রাচীন ভগ্ন-অভগ্ন মূর্তিগুলির সঙ্গে দেবালয়গুলির একটা সম্পর্ক নিশ্চয় ছিল। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় এরূপ প্রাচীন বহু দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ যেমন রয়েছে তেমনি পাওয়া গেছে প্রচুর দেবমূর্তি। এ বিষয়ে সামান্য কিছু আলোক পাত করা যাক।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় কোথায় কোথায় কি কি রীতির মন্দিরের প্রাচুর্য ছিল তা প্রত্নউৎখনন ব্যতীত বলা সঠিক হবে না। শুধু ধর্মীয় প্রভাবের কথাই বলা চলে। কুষাণ যুগ পর্যন্ত টেরাকোটা মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পনিদর্শন আমরা এ-অঞ্চলে পাই, একই সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে তিলপীর একটি পুকুরের ১৫ ফুট তলদেশ থেকে প্রায় ২০ ইঞ্চি x ১০ ইঞ্চি শক্ত সলিড সাদাটে ভারীপাথরের দুটি গড়েয়া বা চৌকি পাওয়া গেছে। একটি সলিড পাথর কুঁদে এই চৌকি তৈরী — উপরের প্লেট এক ইঞ্চি থেকে নেমে এসে পায়াগুলি তিন ইঞ্চিতে শেষ হয়েছে। এগুলি পূজারবেদী হিসাবে বা দেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। বহু প্রাচীন কাল থেকে দক্ষিণ ভারতে এবং অন্যত্র সমাধির উপরে এগুলি চাপানোর রীতি ছিল। বারুইপুরে এরকম ৩টি গড়েয়া পাওয়া গেছে (বারুইপুর সংগ্রহশালা)। গোবর্দ্ধনপুর থেকে স্লেট পাথরের (পাতলা) ভাঙা যে মূর্তির মস্তক সহ সম্পূর্ণাংশ পাওয়া গেছে সেটির মস্তকে নীচের দিকে দুই পার্শ্বে নেমে আসা কেশগুচ্ছ বেশ লম্বা ও সযত্নে কোঁচকানো (Curling) এবং পাট করা। সবশুদ্ধ মুখের আকৃতি অনেকটা 'স্ফিংস' এর মত — কিছুটা মিশরীয় শিল্পভাবনা রয়েছে। এ অঞ্চলে পাথরের যে সব প্রাচীনতম মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলি খৃষ্টীয় ৫ম থেকে ৮ম শতাব্দীর । বিষ্ণুমূর্তি (পাকুড়তলা ও অন্যত্র); সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যমূর্তি (৬ষ্ঠ – ৭ম শতক, কাশীপুর, জয়নগর / আশুতোষ মিউজিয়াম) এবং গঙ্গারিডি (কাকদ্বীপ) সংগ্রহশালা, কালিদাস দত্ত সংগ্রহ (রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালা), কাশিনগর ও খাড়ি সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রস্তর নির্মিত কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি ও অন্যান্য মূর্তিগুলি এই সময়কার। চেতলার কাছে পাওয়া লাল বেলেপাথরের তৈরী ক্ষয়প্রাপ্ত বুদ্ধ-মূর্তিটিও গুপ্ত আমলের। এছাড়া বোড়ালের প্রাচীন প্রস্তর ও ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া বিষ্ণু পাদপদ্ম (প্রস্তর নির্মিত, ৮ম শতাব্দী) , খর্বাকৃতি বিষ্ণুমূর্তি (প্রস্তর নির্মিত, ৮ম শতাব্দী) ফলক, অনন্তশয়নে বিষ্ণু এবং মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ প্রাক্‌মৌর্য থেকে সেন যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত কালের। বোড়ালের প্রাচীন মন্দিরগুলি বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী, বিষ্ণু, শিব ও হিন্দু তান্ত্রিক দেবদেবী মন্দির ছিল বলে সহজেই অনুমান করা যায়। অনুরূপভাবে আটঘরা (দমদমার ঢিবি) ও সীতাকুণ্ড অঞ্চলে যেভাবে বেশ কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি এবং জৈন ও বৌদ্ধ নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে নিশ্চিতভাবে এই সব মূর্তিগুলি ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে রেখেই পূজা করা হত। কাশিনগরের খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ- ৭ম শতাব্দীর কষ্টিপাথরে তৈরী (উপাদান - প্রস্তর, সংগৃহীত ঃ রাজমহল পাহাড়) সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যদেবতার মূর্তিটিও নিশ্চয় ইষ্টক নির্মিত মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। নৃসিংহ আশ্রম ও পাকুড়তলা, সাগরের মন্দিরতলা, খাড়ি ছত্রভোগ, কাশিনগর, কাকদ্বীপ (নীলমাধব), কঙ্কণদীঘি, পাথরপ্রতিমার বনশ্যামনগর, উত্তরসুরেন্দ্রগঞ্জ, বিরিঞ্চিবাড়ী, ভরতগড়, ভাঙড় প্রভৃতি যেসব অঞ্চলে যে সব বিষ্ণুমূর্তি, ব্রহ্মামূর্তি পাওয়া গেছে এবং ধ্বংসস্তূপ রূপে মন্দির এবং বৌদ্ধ বা জৈন মন্দিরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে সেগুলি প্রাচীনতার দিক থেকে গুপ্ত যুগ থেকে সেন যুগ পর্যন্ত সময়ের।

ঐ সময় ঐ সব অঞ্চলে ঐ সব দেবতা নিশ্চিতভাবে মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরতলার মন্দির পালযুগের বলে অনুমিত। **কপিলমুনির মন্দির** রামায়ণ মহাভারতের কালের পরে তৈরী হলেও অন্তত খৃঃ পূঃ একহাজার বছর আগের হওয়া সম্ভব। **উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জের** বা বুড়াবুড়ির তটের **প্রাচীন শিব মন্দিরটির** উপর তৈরী হয়েছে নতুন শিবমন্দিরটি (তটের বাজার)। তাছাড়া এখানে প্রমাণ সাইজের কালো পাথরের বেশ কয়েকটি দেবমূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলির বেশীরভাগই ভগ্ন। এগুলির মধ্যে দশাবতার বিষ্ণুমূর্তি, হরিহর মূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি, একশত আট শিবলিঙ্গ ফলক, নৃত্যরত অষ্টভুজ গণেশ, শিবলিঙ্গ, বরাহ অবতার ইত্যাদি মূর্তি রয়েছে। এই মূর্তিগুলির বেশীরভাগ পালযুগের। বহুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখানে ছিল এবং এখনো কিছু আছে। মন্দিরের দ্বারবাজু এবং লিন্‌টাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল এমন বেশ কিছু চৌকো লম্বা লম্বা প্রস্তর নির্মিত খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে। এই প্রস্তর খণ্ডের দু' একটিতে অঞ্জলিবদ্ধ গরুড়মূর্তি খোদিত দেখা যায়। তটের বাজারে যেহেতু সারি সারি অনেকগুলি গৃহ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সে জন্য অনুমান করা যায় যে এখানে অনেকগুলি মন্দিরই ছিল। এখানকার প্রাচীন একটি মন্দিরের ভিতর থেকে একটি শিবলিঙ্গ খুঁড়ে বার করা হয়েছিল এবং তার উপরেই নতুন একটি শিব মন্দির তৈরী করে শিবালয় হিসাবে পূজার্চনা করা হচ্ছে। অন্যমূর্তিগুলি সবই খণ্ডিত ও টুকরো টুকরো — তাই এগুলির এখন পূজা হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু প্রস্তর ভাস্কর্যগুলি সবই প্রায় পালযুগের শিল্পকলা সমৃদ্ধ। এখানে এবং জি—প্লটের অন্যত্র বিভিন্ন সাইজের পোড়ামাটির পাতলা চওড়া চওড়া বৃহদাকৃতির ইষ্টক পাওয়া গেছে; আটঘরা এবং দক্ষিণ চবিশপরগনার অন্যান্য স্থলেও এরূপ ইট পাওয়া গেছে। যেগুলি মৌর্য-গুপ্ত যুগের বলে অনুমিত। চন্দ্রকেতুগড়ের দেউলিয়া বা দেবালয়ে গুপ্ত যুগের যে মন্দিরটি উৎখনন করা হয়েছে, এরকম মন্দির দক্ষিণ বঙ্গে তথা দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বেশ কয়েকটি পরিচিত প্রত্নস্থলে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ছাটুয়া অঞ্চল, বারুইপুরে, কালিঘাটে, গোসাবা অঞ্চলে, মন্দিরতলায়, বাইশহাটায়, তঠের বাজারের কাছে প্রাপ্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলি গুপ্ত ও শশাঙ্কের সময় নির্দেশ করে। তাছাড়া দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রায় সর্বত্র পাওয়া নানা ধরনের 'পাঞ্চমার্ক কয়েন' মৌর্যযুগের বলে স্বীকৃত। সপ্তম - অষ্টম শতাব্দীর বা পরবর্তীকালের প্রচুর ব্রোঞ্জ-মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণ চব্বিশপরগনায়। এগুলির অনেকগুলিই জৈন-বৌদ্ধ মূর্তি, বৌদ্ধ তান্ত্রিক (বারাহি, তারা ইত্যাদি) মূর্তি। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এগুলি রয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর দ্বি-ভূজ শিবের (হর) একটি পূর্ণাঙ্গ ব্রোঞ্জমূর্তি (ডান হাতভাঙা) মণিরতট থেকে পাওয়া গেছে। সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় শতাধিক প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণুমূর্তিই পাওয়া গেছে; সেগুলির মধ্যে তিন-চার ফুট উচ্চতার অনেকগুলি মূর্তি আছে। এইসব মূর্তিগুলির কয়েকটি মাত্র গুপ্ত যুগের বাকী সবই পাল ও সেন আমলের বলে চিহ্নিত। মণিরতটের ব্রোঞ্জের চতুর্ভুজা সরস্বতী মূর্তি ও দুটি অর্ধনারীশ্বর মূর্তি (বা বৌদ্ধ হারিতী মূর্তি) প্রাক্‌গুপ্ত যুগের বলে অনুমিত। তাছাড়া নলগোড়াতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের ২টি বিষ্ণুমূর্তি, উমামহেশ্বর মূর্তি, ২টি বৌদ্ধদেবীমূর্তি, ২টি হারিতী মূর্তি ও হরপার্বতী - গণেশ সহ মূর্তি বিশেষ মন্দিরে রেখেই পূজা হত বলে ধারণা করা যায়। এঅঞ্চলে অনেকগুলি প্রস্তর খোদিত ও ধাতব নরসিংহ মূর্তি, মাতৃকা মূর্তি বিশেষ মন্দিরে পূজিত হতেন বলে ধারণা করা যায়। বেহালা,

বোড়াল, সোনারপুর, ভাঙড়, বারুইপুর, আটঘরা, সীতাকুণ্ড কাজির ডাঙ্গা (চক্রমধ্যে বিষ্ণুমূর্তি - নৃত্যভঙ্গিমায়), সরিষাদহ, জয়নগর, দুর্গাপুর (অষ্টধাতুর একটি ও কালো পাথরের একটি বিষ্ণুমূর্তি), বাইশহাটা, বাড়ীভাঙা, রায়দীঘি, কঙ্কণদীঘি (প্রস্তর মূর্তি ছাড়াও নানা দেবদেবীর অনেক ব্রোঞ্জ মূর্তিও এখানে পাওয়া গেছে), খাড়ি, মাধবপুর -- কাশিনগর (বিষ্ণুমূর্তি ছাড়াও এখানে পার্শ্বনাথের মূর্তি এবং কুষাণ মুদ্রার মত কিছু প্রাচীন মুদ্রাও পাওয়া গেছে), পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন (উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জসহ) দ্বীপ, মাণিকনগর (নৃসিংহ আশ্রম - কাকদ্বীপ), পুকুরবেড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যে প্রস্তর নির্মিত প্রমাণ সাইজের বিষ্ণুমূর্তি (কোন কোনটি কিছু ছোট এবং কোনটি ফলক) পাওয়া গেছে তার গঠনশৈলী সবই প্রায় গুপ্ত পাল ও সেন যুগের ভাস্কর্যের অনুরূপ এবং নিঃসন্দেহে এগুলির বেশীর ভাগই রাজকীয় (কোন কোন স্থলে সামন্ত জমিদারদের) সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অর্থানুকূল্যে সুদৃশ্য সুউচ্চ দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় প্রস্তর নির্মিত [illegible] বহু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে -- যেগুলির [illegible] শিল্পশৈলী [illegible] ভাঙড়ের রঘুনাথপুর থেকে যেমন [illegible] শিল্পরীতির) মূর্তি, ধারা থেকে বিষ্ণু মূর্তি (মতান্তরে, সূর্যমূর্তি - [illegible] হাতিশালা থেকে একটি [illegible] পাথরের সাড়ে [illegible] (৭-৩১ [illegible] পাওয়া গেছে [illegible] বারবাস্তা থেকে [illegible] আকারে [illegible] মূর্তি [illegible] দেবতা) -- ও পাওয়া গেছে (আশুতোষ মিউজিয়াম)। [illegible] (দেবতা) নেমীনাথের, ঘাটেশ্বরা থেকে ঋষভনাথের ([illegible] মিউজিয়াম [illegible] নিকটবর্তী [illegible] থেকে পার্শ্বনাথের (বোড়ালগাড়ি গ্রামে [illegible] সাড়ে তিন ফুট কালো পাথরের মূর্তি. [illegible] প্রায় [illegible] উচ্চতার [illegible] পার্শ্বনাথ (২৩তম জৈন তীর্থঙ্কর) মূর্তি ([illegible] বনিয়ার [illegible] মন্দিরের একটি [illegible] ও বর্তমানে অনন্তদেব বলে পূজিত), কঙ্কণদীঘি থেকে প্রাপ্ত কালো পাথরের তৈরী এবং ব্রোঞ্জের তৈরী কয়েকটি জৈন মূর্তি, দক্ষিণ বারাশতের সেন পাড়ার গাছতলায় অনাদরে রক্ষিত লাল বেলেপাথরের ক্ষয়িষ্ণু পার্শ্বনাথ ছাড়াও অনেকগুলি জৈন মূর্তি রয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এইসব জৈনতীর্থঙ্কর দেবতাগণ কোথাও অনন্তদেব, কোথাও ধর্মঠাকুর (বোড়ালবামণি), কোথাও মনসারূপে (দক্ষিণ বারাশত) পূজা পাচ্ছেন এখনো। কিন্তু, একসময় এই দেবমূর্তিগুলিকে দেবমন্দিরে রেখেই পূজা করা হত। দক্ষিণ উপকূলীয় নদী ও সমুদ্রবন্দর এলাকায় বা সামন্ত (ডোম্মনপাল) রাজাদের রাজধানীতে বা রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বা বন্দর-বাণিজ্য এলাকায় এই সব দেবমন্দির গড়ে উঠেছিল। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং স্থানীয় ধনী জৈন ব্যবসায়ী অথবা বৌদ্ধ ব্যবসায়ীদের অর্থ সাহায্য ও ধর্মাচরণ এইসব জৈন বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের প্রেরণা জোগাত নিশ্চয়। বন্দর অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যিক কারণে আগত বহিরাগত ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্যও এই সকল স্থানে দেবালয় স্থাপিত হত। তাছাড়া জৈন সন্ন্যাসী ও ধর্মাচারীগণের বিশ্রামের সাময়িক আশ্রয়ের জন্যও মঠ মন্দির তৈরী হত (বাইশহাটা, জটা)।

পাথরপ্রতিমার 'F' প্লটে পাওয়া রাক্ষসখালির (ব্রজবল্লভপুর) ডোম্মনপালের তাম্রশাসনে

প্রদত্ত বধোমহিত (ধামহিট্টা - V[Dh]amahitta) গ্রামের বাহিরে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। কেননা পাঠোদ্ধারে একথা জানা যায়। লিপিতে 'রত্নত্রয় বহিং' কথাটা আছে। তাম্রশাসনটি বৈশাখ ৯ (?), ১১৯৬ খৃঃ সম্পাদন করা হয়েছিল। বৌদ্ধবিহারের এই অবস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সমুদ্রনিকটবর্তী (সপ্তমুখীমোহনা) এই প্রত্যন্ত দ্বীপ অঞ্চলে। বিশেষকরে নিকটবর্তী G-Plot -এর তটের বাজার অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে পাল শিল্পশৈলীর অনেকগুলি কালো শক্তপাথরের দেবমূর্তি, কয়েক প্রকার বিষ্ণুমূর্তি (দশাবতার চাল চিত্রসহ), হরিহরমূর্তি, শিবলিঙ্গ ও একশত আট শিবলিঙ্গ ফলক, নৃত্যরত গণেশমূর্তি, বরাহ অবতার মূর্তি ইত্যাদি এবং গুপ্তযুগের ও শশাঙ্কের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা (শশাঙ্ক)। একথা অগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাইশহাটার মঠবাড়ীর মত অনেকগুলি মঠবাড়ী বা বৌদ্ধ মঠ ও বৌদ্ধ বিহার এঅঞ্চলে ছিল। বারাহি, ত্রিপুরাসুন্দরী, চামুণ্ডা, নরসিংহ, উমামহেশ্বর ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মীয় ধারাবাহিকতার নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। জটার দেউলের (৯৭৫ খৃঃ) মত সুউচ্চ রেখ বা চূড়া মন্দিরই বেশী ছিল। বনশ্যামনগরের ভগ্ন মন্দির, বিরিঞ্চিবাড়ীর মন্দির একই প্রকারের। মন্দিরতলার মন্দির এবং অন্যান্য বিষ্ণুমন্দিরগুলিও সর্বভারতীয় রীতি অনুযায়ী একই রকম চূড়াবিশিষ্ট সুউচ্চ মন্দিরছিল বলে সিদ্ধান্তে আসা যায়। সাগরের মত প্রাচীন স্থানে গুপ্তসম্রাটদের (সমুদ্রগুপ্ত?) কেউ কেউ (রঘুবংশ, কালিদাস) এবং লক্ষ্মণসেন মন্দির স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। লক্ষ্মণসেনের তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে লক্ষ্মণসেন গঙ্গাসঙ্গমে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়ে সেখানে গঙ্গাদেবীর মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। তৎকালীন অনেক রাজাই এখানে চৈত্য, ত্রিশূল স্থাপন ও দেবমন্দিরে স্বর্ণমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। সতীশচন্দ্র মিত্র এবিষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন যে ঐ গঙ্গামূর্তিটি প্রতাপাদিত্য যশোরে নিয়ে গিয়ে পুনঃস্থাপন করেছিলেন — যেটি পরবর্তী কালে অন্নপূর্ণা বলে পূজিত হচ্ছে। লক্ষ্মণ সেনের এরকম একটি প্রবণতা ছিল যে তিনি যেখানেই যেতেন সেখানে কোন না কোন মূর্তি প্রতীক স্থাপন করে আসতেন। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় যে প্রচুর বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে তার একটা বড় অংশই সেন রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত। সোনারপুর (বোড়াল), বারুইপুর, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, ডায়মণ্ডহারবার, কুলপী, মথুরাপুর প্রভৃতি থানা অঞ্চলে প্রচুর সেন আমলের বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। বারুইপুরের বিদ্যাধরপুরে ঐ সময়কার একটি বিষ্ণুমূর্তি ধর্মঠাকুর বলে পূজিত হচ্ছে। তাছাড়া পাল সেন আমলের অনেক বিষ্ণু (এবং অন্যান্য) মূর্তি ভগ্ন বা খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ডায়মণ্ডহারবারের আশুরালি গ্রামে এবং সাগরে ও কুলপী থানার করঞ্জলী অঞ্চলে এরকম কয়েকটি খণ্ডিত বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। আশুরালিতে মুণ্ডচ্যুত হাতপা কাটা বিষ্ণুমূর্তিটিকে জয়চণ্ডী বলে পূজা করা হচ্ছে। সাগরেও ঐরূপ কয়েকটি পাথরের টুকরোকে চণ্ডী, কালী, মনসা, শীতলা ও বিশালাক্ষী বলে পূজা করা হচ্ছে (ভাঙাবুড়ি)। ধবলাটের প্রসাদপুরের কাছারী বাড়ীর তিনটি কক্ষের একটিতে রয়েছে কষ্টিপাথরের তৈরী পাল শৈলীর একটি সুন্দর বিষ্ণু মূর্তি (একটি হাত সামান্য ভগ্ন)। অপরকক্ষে রয়েছে একটি ক্ষয়প্রাপ্ত প্রাচীনতর বিষ্ণুমূর্তি, একটি সূর্যমূর্তি, শিবলিঙ্গ, রাধামাধব (জমিদার প্রসাদ দাস দত্তের বংশের গৃহদেবতা), একটি শ্বেত পাথরের ঋষভনাথ (ও তাঁর বাহন ষাঁড়), একটি ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি এবং একটি ব্রোঞ্জের মন্দির প্রতিকৃতি (প্রায় ২ ফুট)। তৃতীয় আর

একটি কক্ষে আছে সাগরদ্বীপের সর্বপূজ্য দেবী বিশালাক্ষী। কালো কষ্টিপাথরে তৈরী সপ্তসর্পফণাছত্রে আচ্ছাদিত এই ভয়ংকর সুন্দর দেবী মূর্তি বিশালাক্ষী বলে পূজিতা হলেও ইনি বিশালাক্ষী নন দেবী গঙ্গার এক বিশিষ্ট কল্পরূপ মূর্তি (দক্ষিণ চব্বিশপরগনার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তি ভাবনা — কৃষ্ণকালী মণ্ডল, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ৯৭ - ১১৪)। এই মূর্তিগুলি পাল ও পাল পূর্ব ভাস্কর্য শৈলীর।

আমরা মন্দির শিল্পের আলোচনায় দেবমূর্তির কথা আংশিকভাবে কিছু বললাম কেন, তা হয়ত অনেকেই জিজ্ঞাসা করবেন। বস্তুত দেবালয় বা মন্দির শিল্প আলোচনায় তিনটি বিশেষ দিকের কথা আমরা বলেছি। এই সব দেবালয় এক একটি বিশেষ বিশেষ দেবতা কেন্দ্রিক হয়। অর্থাৎ দেবমন্দিরের মূল কেন্দ্রবিন্দুই হল ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতা। দেবতা অর্থাৎ ঈপ্সিত দেবদেবী কেন্দ্রিকই হল মূল মন্দির। তাই দেবতার মূর্তি বিষয়ে অর্থাৎ দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় পাওয়া দেবতাদের তথা দেবদেবীর মূর্তিগুলির এক ভগ্নাংশের কথা বলা হল। যদিও আরও বহু মূর্তি এই বিবরণের বাইরে রয়ে গেল। আরও একটা উদ্দেশ্যের কথা বলতে চাই — তা হল দক্ষিণ চব্বিশপরগনার মন্দির শিল্পের সন্ধানে দীর্ঘদিন যে ক্ষেত্রানুসন্ধান করে চলেছি তাতে দেখি যে সামান্য কয়টি মাত্র প্রাচীন মন্দির বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট রয়েছে। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবার মত বহু প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি রয়েছে। এই সব মূর্তি ভাস্কর্য ও তাদের শিল্প সমৃদ্ধি থেকে পরিষ্কার অনুমান করা যায় যে সেই দেবস্থান বা দেবালয়গুলি কত না শিল্প সুষমাসমৃদ্ধ ছিল। অর্থাৎ দেবমূর্তির মত দেবমন্দিরেরও যেমন আধিক্য ছিল তেমনি বিভিন্ন যুগের শিল্প সাধনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাই সম্ভবত এই মূর্তি পরিচয় থেকে বলতে পারি যে প্রায় মৌর্যযুগ থেকে পাল-সেনযুগ পর্যন্ত এবং তৎপরবর্তী কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ঐ সব দেবতা কেন্দ্রীক হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন তথা গাণপত্য, শৈব, ভাগবতীয়, তান্ত্রিকসাধনা ও শক্তি সাধনার কেন্দ্রস্থল হিসাবে মঠ, মন্দির, স্তূপ, স্তূপিকা, বিহার, সংঘ ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। আর সেগুলি সবই ছিল সে সময়ের পরিবেশ, ধর্মীয় সহনশীলতা, রাজকীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং অর্থানুকূল্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপযুক্ততা বিবেচনা সাপেক্ষে। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার মন্দির তার উপাদান ও গঠন বৈচিত্র্যে বাংলার মন্দিরশিল্পের আঞ্চলিক প্রভাব তো এড়াতে পারেনি,তৎসত্ত্বেও সর্বভারতীয় গঠনরীতি এবং শিল্প প্রভাবের অনুসারীই বলা চলে।

এই মূর্তি বিবরণে আমরা শুধু প্রস্তর নির্মিত ও ধাতবমূর্তির কথাই বলেছি — দারুমূর্তি এবং মৃন্ময়মূর্তির কথা বলা হয়নি। বারুইপুর সংগ্রহশালায় একটি অঙ্গারীভূত দারুমূর্তি দেখেছিলাম। এটি বিড়াল থেকে পাওয়া সুন্দর এক বিষ্ণুমূর্তি (চিত্র পৃঃ ১৬, দক্ষিণ চব্বিশপরগনা ঃ আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ এবং প্রত্নতত্ত্বে বারুইপুর দ্রষ্টব্য— কৃষ্ণকালী মণ্ডল, — প্রথম গ্রন্থের ক্যাপসানটিতে ভুলক্রমে দক্ষিণ গোবিন্দপুর থেকে প্রাপ্ত বলা হয়েছে)। মূর্তিটি এখন আর দেখার মত অবস্থায় নেই। এরকম অনেক দারুবিগ্রহ — প্রাচীন এবং আধুনিক অন্যত্র আছে। তবে সব দারু বিগ্রহ বড় মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল, এমন কথা বলা যায় না। বরং বেশীরভাগ দারুমূর্তিই গোলার ধারে সেবায়েৎ বা গৃহস্থের গৃহদেবতা হিসাবে নিজস্ব ঠাকুরঘরে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত

হত। তবে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার দু' একটি মন্দির এখনো আছে যাতে দেবতার দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত এবং এখনো পূজিত হচ্ছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় আটিসারার (বারুইপুর পুরাতন বাজারের মহাপ্রভুতলা) শ্রীচৈতন্য অনুরাগী পরম বৈষ্ণব অনন্ত পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভু মন্দিরে স্থাপিত দারুময় নিতাই-গৌর মূর্তি। শ্রীচৈতন্যদেব ১৫১০ খৃঃ এই অনন্ত সাধুর আশ্রমে নীলাচলে যাবার পথে নেমে সারারাত্রিব্যাপী কৃষ্ণ নামগান করেছিলেন (চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫০-৫৭, পৃঃ ২৬২, বসুমতী সং, ১৯৮৯)। অনন্ত গোস্বামীর তিরোধানের পর ভগ্নগৃহের মধ্যে চাপা পড়ে থাকে ঐ নিতাই গৌর দারুমূর্তি। অনেকদিন পরে বরানগর ও অন্যান্য স্থানের গোস্বামীগণ মহাপ্রভুতলা থেকে ঐ দারুমূর্তিদ্বয় উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নতুন গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, বর্তমানে যে দারুমূর্তি এখানে দেখা যায় তা সেই পুরাতন দারুমূর্তিই। বর্তমানে সেটি পাকা দালান কোটা (সমতল) সুউচ্চ এক সুবিশাল সুরম্য নবরত্ন মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে এবং মন্দির গাত্রে, অভ্যন্তরে এবং যাত্রীদালানে কৃষ্ণের বাল্যজীবনের ঘটনাবালী সহ চৈতন্যদেবের নানা লীলার দেওয়াল চিত্র এখানে খোদিত হয়েছে। সবই সিমেন্টের ঢালাই করা চিত্র শিল্প। সংখ্যায় এগুলি অনেক এবং বহু প্রকার উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত। চিত্র পরিচিতিও অনেক দেওয়াল লিখনে রয়েছে।

বারুইপুর মহাপ্রভুতলার পূর্বদিকে বারুইপুর - ক্যানিং বাসরাস্তায় কিছুটা এগিয়ে গেলেই পড়ে পুরাতন থানা, তারপরই বারুইপুর বিশালাক্ষীতলা। জমিদার রায়চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত (সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে) একতলা সমতল ছাদের মন্দিরে রয়েছে এই দারুময়ী বটুকশিবাসনা দণ্ডায়মান নৃমুণ্ডমালিনী দেবী বিশালাক্ষী। সম্ভবত বৈষ্ণব প্রভাবে এই দেবীর দুই দিকে দুটি কাঠের ব্লকে বিষ্ণুর দুই প্রকার দারুমূর্তি সংযুক্ত করা হয়েছে। দেবীমূর্তিটির সঙ্গে এগুলিতে প্রতিবছর সুন্দর করে রঙ করা হয়ে থাকে। কাঁটাবেনিয়ার বিখ্যাত বিশালাক্ষী মূর্তিটিও দারুময়ী। একটি একতলা সমতল ছাদবিশিষ্ট মন্দিরে এই দেবী অধিষ্ঠিতা। এটিও বেশ প্রাচীন মূর্ত্তি। পাশের কক্ষেই রয়েছে অনন্তদেব রূপে পূজিত কালোপাথরের বিখ্যাত পার্শ্বনাথ মূর্তিটি (দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বিস্মৃত অধ্যায়—কৃষ্ণকালী মণ্ডল, কলকাতা,১৯৯৯)। মনে রাখা দরকার যে প্রস্তর নির্মিত বেশীরভাগ জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিই পাল শিল্প শৈলীর, দু-একটি তৎপূর্ববর্তী কালের। ছত্রভোগের ত্রিপুরসুন্দরী মূর্তিও দারুময়ী। খাড়ির বিশাল অশ্বারোহী বড়-খাঁ গাজীর মূর্তিটি দারুময় এবং দেবী নারায়ণী মন্দিরের পাশেই স্বতন্ত্র একতলা সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দিরে স্থাপিত ও এখনো পূজিত। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির নতুন করে পুরাতন বিশাল মন্দিরের ভিতরে উপর পুনর্নির্মিত। কিন্তু এখানকার পুরাতন মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। খাড়ি একটি বহু প্রাচীন স্থান। খাড়ি, ছত্রভোগ, অম্বুলিঙ্গ, চক্রতীর্থ, কাশিনগর, মাধবপুর, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, নালুয়া, বাইশহাটা, মণিরতট অঞ্চলগুলি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান; জৈন, বৌদ্ধ, শৈব ও তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান — নানাযুগে। খাড়ি, খাড়িমণ্ডল ইত্যাদি নামের ।বভাগগুলি যুগে যুগে বিভিন্ন তাম্রশাসনে (সেন যুগ পর্যন্ত) উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও পাই ডাকার্নব প্রভৃতি প্রাচীন তান্ত্রিক গ্রন্থে। খাড়ি নামটিই সমুদ্র সান্নিধ্য বোঝাচ্ছে। নিকটবর্তী বকুলতলায় প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন তাম্রলিপিতে 'মণ্ডল'

নামক একটি গ্রাম দান প্রসঙ্গে "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী খাড়িমণ্ডলের" উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বন্দর, নগরী, হাট বা হট্ট, প্রশাসনিক একটি প্রধান কেন্দ্র, একটি প্রাচীন ধর্মস্থান ইত্যাদি হিসাবে সুপরিচিত ছিল। ডোম্মনপালের রাক্ষসখালি তাম্রলিপিতে 'পূর্বখাটিকা' এবং 'দ্বারহট্টের' উল্লেখ পাই। অন্য তাম্রলিপিতে 'পশ্চিমখাটিকার' কথাও জানা যায়। শিব এবং বিষ্ণুর আধিপত্য যেমন ছিল এক এক সময়ে তেমনি তান্ত্রিক দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। আবার ইংরেজ শাসনের পূর্বে ও পরে পর্যন্ত বড়খাঁ গাজী, দক্ষিণরায়, বনবিবি ও নারায়ণীর প্রভাবও অব্যাহত। ছত্রভোগের ত্রিপুরসুন্দরী দেবী এবং তাঁর মন্দিরকে আমরা এই প্রেক্ষাপটেই দেখব। এই প্রভাবশালী দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর প্রাচীন মন্দিরের পাতলা ইট, কারুকার্য করা সুদৃশ্য ইট, মন্দিরে ব্যবহৃত প্রস্তরবীম, লিন্টাল, দ্বারবাজু ইত্যাদি উদ্ধার করা গেছে। একটি বেশ মোটা চৌকো লম্বা প্রস্তর নির্মিত বীম পাওয়া গেছে। এটিতে তারা মূর্তি খোদিত। বেশ মোটা মোটা বড় বড় প্রস্তর খণ্ডও পাওয়া গেছে। দু-একটি বড় প্রস্তর খণ্ড মন্দির প্রাঙ্গণে পড়ে ছিল – বিশাল আকৃতির। উল্লিখিত কিছু প্রস্তরবীম, বিশেষ করে তারামূর্তি খোদিত বীমটি বিষ্ণুপুরের (দক্ষিণ) ডাঃ তুলসীচরণ ভট্টাচার্য সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এখানে একটি বিশাল দেবালয় ছিল – যা শুধু ইট দিয়েই তৈরী নয় অনেক প্রস্তর খণ্ডও এতে ব্যবহার করা হয়েছিল। দেবালয়টি পাল যুগ বা তৎপূর্ববর্তী বলে মনে হয়। **বারুইপুরের বড়দুর্গামন্দিরটির** কথা পৃথকভাবে অন্যত্র আলোচনা করেছি (প্রত্নতত্ত্বে বারুইপুর)।

বোড়ালের ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দির হয়ত একটু পরবর্তী কালের। সেই মন্দিরের গায়েও খোদিত ইষ্টক রাজী শোভাবর্দ্ধন করত। তবে বোড়ালের মন্দিরে এত প্রস্তর বীম ব্যবহার করা হয়েছিল বলে জানা যায় না। সম্ভবত ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরটি অন্য প্রাচীন মন্দিরের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা এখানকার প্রত্ননিদর্শনাদি প্রমাণ করে যে এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধ জনবসতি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর থেকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর। প্রত্নতত্ত্ববিদের অনেকেই এবিষয়ে একমত। আবার পাল সেন যুগের এবং তৎপরবর্তী কালের সভ্যতার চিহ্নাদিও বিদ্যমান। আদিগঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল ধরে কালিঘাট, বোড়াল, বারুইপুর, বহড়ু, বারাশত, জয়নগর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ, খাড়ি, চক্রতীর্থ হয়ে কাকদ্বীপ ও সাগর পর্যন্ত জনপদ ও উন্নত সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। একইভাবে ইছামতী, পদ্মা যমুনা, বিদ্যাধরী, পিয়ালী নদী এবং দামোদর, রূপনারায়ণ, সরস্বতী নদী বরাবরও নানান যুগে উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। জঙ্গলাকীর্ণ নদীতীরবর্তী অঞ্চল এক সময় তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে আদিগঙ্গা তীরবরাবর খাড়ি, ছত্রভোগ, জয়নগর , বারাশত, বহড়ু, বারুইপুর, বোড়াল ও কালিঘাট অঞ্চল বিশিষ্ট তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে বৌদ্ধযুগের শেষভাগে অবক্ষয় সময়ে এই তন্ত্রসাধনা বিস্তার লাভ করে। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে এই সময়টা ষোড়শ শতাব্দী থেকে। আবার বোড়ালের স্তূপ খননকালে প্রাপ্ত প্রস্তরনির্মিত অপূর্ব তারামূর্তি, কালীমূর্তি, সরস্বতী মূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি (খৃঃ ৮ম শতাব্দী, আশুতোষ মিউজিয়াম), অনন্ত শয্যায় বিষ্ণু (ভগ্ন), বিষ্ণু পাদ পদ্ম, শিব, নবগ্রহশিলা (বৃহৎ), টেরাকোটা প্রাচীন মূর্তি, পদ্ম, লতাপাতা এবং নানান ভাবে অলংকরিত পোড়ামাটির ইট ইত্যাদি, ইটের মন্দির ভিত্তি,

প্রাসাদ ভিত্তি ইত্যাদি প্রমাণ করে যে একটি ধারাবাহিক সভ্যতা বিকাশলাভ করেছিল এই নদী তীরে, যার শেষ পরিণতি জঙ্গলে, শ্মশানে লোকচক্ষুর অগোচরে নানা বৌদ্ধ তন্ত্রযানপন্থীরা বা পরবর্তী কালে তাদের অনুকরণে তান্ত্রিক, কাপালিক ও নাথপন্থী শৈব যোগীরা তন্ত্রসাধনা করত। এ কারণে কালীঘাট থেকে খাড়ি ছত্রভোগ পর্যন্ত আদিগঙ্গার উভয় তীরেই বহু তন্ত্রসাধনার স্থল গড়ে উঠেছিল। বারাহি, পর্ণশবরী (কঙ্কণদীঘি, ছত্রভোগ, রামনগর), চণ্ডী, কালী, বিশালাক্ষী, ত্রিপুরেশ্বরী, উমামহেশ্বর (রূপান্তর ভেদে), চতুঃশক্তিশিব (নাথ সম্প্রদায়?) মূর্তি (পুরকাইত চক), কৃষ্ণকালী (বৈষ্ণব প্রভাব যুক্ত?) দেবী (মালঞ্চ), তারা, বজ্রতারা, জয়চণ্ডী, নরসিংহ, বটুক ভৈরবী (বারুইপুর — বিশালাক্ষী) ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি এবং মিথুনমূর্তির অনেকগুলিই এই সাধনার অনুসারী।

যাইহোক, বোড়ালের মূল দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর মূর্তিও ছিল দারুমূর্তি। মাটি খুঁড়ে এই ভগ্ন দারুমূর্তি ও দেবীর 'যন্ত্র মূর্তি' পাওয়া গিয়েছিল। রামনগর থেকেও একটি চণ্ডীর যন্ত্রমূর্তি উদ্ধার করেছেন শ্রী হেমেন মজুমদার। জয়নগর মজিলপুরের অনেকগুলি দেবদেবী মূর্তি দারুময়। অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও এরূপ পোড়ামাটির অনেক মাতৃমূর্তি, দেবদেবী মূর্তি, যক্ষযক্ষিণী মূর্তি, কুবের মূর্তি, পঞ্চবিষ্ণু পট্ট, বিষ্ণু পাদ পদ্ম, বিষ্ণু ও বুদ্ধ, জৈনতীর্থঙ্কর মূর্তি, বারাহি, পর্ণশবরী ইত্যাদি পাওয়া গেছে। সেগুলি কোন ইষ্টক নির্মিত মন্দির নির্মাণ করে পূজা হত কিনা জানা যায় না। এগুলি সাধারণত Votive হিসাবে গৃহ পূজায় ব্যবহার করা হত বলে অনুমান করা হয়। তুলনামূলকভাবে এগুলি অনেক প্রাচীন। পরবর্তীকালে মন্দির নির্মাণ শিল্প গড়ে উঠলে এগুলি মূল দেবতা হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে মন্দিরগাত্রে মন্দির শিল্প হিসাবে ব্যবহৃত হত। মন্দিরাভ্যন্তরে ছলন (শলন) বা Votive হিসাবেও প্রদত্ত হত অথবা আবরণ দেবতা হিসাবে পূজিত হত।

প্রস্তর নির্মিত, ধাতু নির্মিত, দারুময় বা মৃন্ময় প্রাচীন দেবমূর্তি বা দেবতা সম্বন্ধীয় ফলক ও মূর্তিগুলির প্রাচুর্য রয়েছে। রয়েছে প্রচুর পোড়ামাটির ইট যা মৌর্যযুগ থেকে মধ্যযুগের ইটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; রয়েছে প্রচুর ইটের তৈরী পদ্ম, পত্র, চক্র, মালা, মুণ্ড, প্রস্ফুটিত বৃহৎ পদ্ম, লতা, আঙুর গুচ্ছ ইত্যাদি এবং মন্দিরে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকাদি, প্রস্তর বীম, গোবরাট, দ্বারবাজু। এ-সবই প্রমাণ করে যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় শিল্প সুষমা সমৃদ্ধ দেবালয় ছিল — প্রাকৃতিক কারণে অথবা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক হিংসায় যা আজ ধ্বংস হয়ে গেছে।

মোটের উপর বলা যায় মূল দেবতার যে সব মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে — তাদের প্রতিষ্ঠার জন্য কোন না কোন প্রকার মন্দির বা দেবালয় অবশ্যই তৈরী হয়েছিল। মন্দির ছাড়া এই সব দেব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। শত শত মূর্তি যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে মূল প্রতিষ্ঠিত দেবতা তো কয়েকশত হবে। কালের করালগ্রাসে সেই সব প্রাচীন মন্দির আজ ধ্বংস প্রাপ্ত — তাই সেই সব মন্দিরের শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়।

— সোনারপুর মহাবিদ্যালয় স্মরণিকায় প্রকাশিতব্য। কিছু অংশ —
"নিরগাসের সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র, মে-২০০২' সংখ্যায় প্রকাশিত (পরিমার্জিত)।

প্রত্নতত্ত্বে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার কৃষি

ভূমির গঠন ঃ

সকল দেশেই মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কোন না কোন নদীকে অবলম্বন করে। দক্ষিণ চব্বিশপরগনা হল পুণ্য সলিলা ভাগীরথী গঙ্গার মোহনাগামিনী আদিগঙ্গা, বিদ্যাধরী, রায়মঙ্গল, মাতলা, পিয়ালী, হুগলী, সরস্বতীর স্রোতধার পুষ্ট ব-দ্বীপাঞ্চল। নদীবাহিত পলি মাটিতে গড়া মূল মৃত্তিকা ভিত্তি। অবধারিতভাবেই - বিশেষত মোহনাঞ্চল বলে সমুদ্রখাড়ি থাকায় এবং জালের মত মূল নদীর শাখানদী ও উপনদীগুলি সমুদ্র - সংযোগ রক্ষা করায় সমুদ্রের লবণ ও বালিয়াড়ি মেশামিশি হয়ে গেছে, এবং তা দেশের অভ্যন্তরভাগে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত মূল মৃত্তিকার ভিত্তি প্রস্তুত করেছে। সমুদ্র সান্নিধ্য হওয়ায় ছোট ছোট নদীস্রোতগুলি জোয়ার ভাঁটার অধীনে আসে এমন কি অনেক স্রোতস্বিনী আছে যা দোয়ানিয়া বা একই সঙ্গে জোয়ারভাঁটার অন্তর্গত। ফলে মিঠে এবং নোনা জলের মিশ্রণে সমুদ্র সীমার কাছাকাছি থেকে আভ্যন্তরীণ কিছু দূর পর্যন্ত নদীতীরবর্তী অঞ্চলে "ম্যানগ্রোভ" বা 'লবণাম্বু' নামক এক বিশেষ প্রকার বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন গভীরতায় মৃত্তিকা গর্ভের ২৫-৩০ ফুট নীচে থেকে ৪০-৫০ ফুট নীচে লবণাম্বু বৃক্ষের যে মূল ও কাণ্ড পাওয়া গেছে তা আনুমানিক প্রায় পাঁচ থেকে আটহাজার বছর আগেকার। অন্যদিকে নামখানার মাত্র ৫.৭৫ ফুট গভীরতার কাদামাটির বয়স প্রায় ৩,৩০০ বছর। ক্যানিং অঞ্চলের মাটিও প্রায় সমসাময়িক (প্রায় ঐ গভীরতার) কালের বলে নির্ণীত। একটা বিষয় মনে রাখা দরকার তা হল, এই অঞ্চলের ভূমির গঠন সর্বত্র একই কালের নাও হতে পারে। জেলার পশ্চিমদিক অপেক্ষা পূর্ব দিকের কোন কোন অংশ অপেক্ষাকৃত নবীন। ভূতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে পলিমাটি, কর্দম, বালুকা দ্বারা গঠিত এই নবীন ভূভাগে কিছুটা পূর্বদিকে ঢালু রয়েছে।

কৃষি ঃ

নদী, নদীতীর, ভূমিগঠন এবং জলবায়ু ও পরিবেশ মনুষ্যবসতিকে সুনিশ্চিত করে। জনপদ এবং জীবন, বাঁচার এবং বসবাস করার উপযোগিতা মানুষকে স্থায়িত্বের ইঙ্গিত দিলে জীবন ধারণ এবং অর্থনৈতিক সুস্থিরতার জন্য প্রাথমিকভাবে কৃষির প্রয়োজন হয়েছিল। মানুষ তার অভিজ্ঞতার অনুসরণে নিজেকে কৃষিতে নিয়োজিত করে। সভ্যতার বিবর্তনে শিকারজীবী গোষ্ঠিগত মানবজীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় হল কৃষিতে মনোনিবেশ। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার কয়েকটি স্থানে শিকারী জীবনে অভ্যস্ত প্রাচীন যুগের গোষ্ঠী মানুষের ব্যবহৃত বেশ কিছু প্রস্তরায়ুধ. পাওয়া গেছে। হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, মন্দিরতলা (সাগরদ্বীপ), গোবর্দ্ধনপুর (পাথর প্রতিমা) প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর নিওলিথিক, মাইক্রোলিথিক এবং লৌহযুগের অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গেছে (দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল — কৃষ্ণকালী মণ্ডল)। এ সব দেখে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই অনুমান করেন যে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এসব অঞ্চলে, অন্তত, সাময়িকভাবে (Seasonal) নিওলিথিক যুগের মানুষের যাতায়াত ছিল। শিকার করা স্থলজ এবং জলজ প্রাণীর অস্থি, দাঁত, চোয়াল, করোটি ইত্যাদির অর্ধ-ফসিলীভূত অংশগুলিও প্রমাণ করে যে ঐ সব আদিম মানুষের এক সময় এঅঞ্চল গুলিতে আবির্ভাব ঘটেছিল। সুন্দরবনের ঐ সব অঞ্চলে আজও এক শ্রেণীর

চাষী, ভূমিহীন কৃষিমজুর, ভ্যানচালক ইত্যাদি জীবিকার মানুষের দেখা মেলে যাদের পদবী হ'শিকারী'। এরা সেদিনের সেই শিকারি গোষ্ঠী জীবনের স্মৃতি বহন করে আনছে কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। এ বিষয়ে গবেষণার জন্য নৃ-বিজ্ঞানী এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে। ভাষাতত্ত্ববিদদের সাহায্যও প্রয়োজন। একটা বিষয় বেশ পরিষ্কার যে এদের অনেক পরিবারের লোকেরা বলতেই পারে না যে তাদের কোন পুরুষ শিকারি ছিল। আবার চাষবাস ইত্যাদি কাজে এদের বেশ অনীহা লক্ষ্য করা যায়। জীবন ধারণের জন্যই যেন চাষবাস বা অন্য কাজে লেগে থাকা। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এরা এককালে শিকারি জীবন বেছে নিয়েছিল। অন্য দিকে সুন্দরবন প্রাকৃতিক নানা কারণে বারংবার ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। ফলে তার থেকে বেঁচে যাওয়া নিওলিথিক যুগের শিকারি গোষ্ঠীর কোন হদিস এদের জীবন থেকে পাওয়া যায় কিনা তারও চিন্তা করা প্রয়োজন। আদিতে এ-অঞ্চলে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির একটি সংমিশ্রণ ঘটেছিল বলে নৃ-তত্ত্ববিদগণ মনে করেন। অষ্ট্রিক জাতির অনেক শব্দই আজও আমরা ব্যবহার করি। দক্ষিণ বাংলার সেই আদিম যুগের অষ্ট্রিক বা অষ্ট্রিক মিশ্রিত জাতির যুগযুগান্তের মিশ্রণই আজকের বাঙালী। অষ্ট্রিক জাতির অবির্ভাব ব্যাপক কৃষি ও কৃষিজীবিকার সূত্র দেয়।

কৃষি ও জনবসতি ঃ

জনবসতির প্রাচীনত্ব থাকলেই কৃষির প্রাচীনত্বের কথা বলা চলে। আমরা ভূ-গঠনের কথা বলেছি। নিওলিথিক মানুষের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথাও বলেছি। আর ভূ-গঠনের সময়ের কথা ধরলে এবং প্রস্তরায়ুধ, অস্থিফসিলাদি ও লৌহ অস্ত্রাদির কথা যদি আমরা তুলনামূলক আলোচনায় আনি, তাহলে কিন্তু আমরা গোষ্ঠী মনুষ্যবসতির সম্ভাবনার দিকে যেতে পারি।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রাচীনতম জনবসতির যে কথা আমরা জানতে পারি তা হল গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থলের পুণ্য তীর্থক্ষেত্র হিসাবে সর্বভারতীয় পরিচিতি ও স্বীকৃতি। বর্তমান সাগরদ্বীপে গঙ্গার (ভাগরথী গঙ্গার) মোহনায় পুণ্যতীর্থটির অবস্থানক্ষেত্রে কপিল মুনির আশ্রম ছিল। অবশ্য অন্যত্র উল্লেখিত ঋ গ্বেদের কয়েকটি সূত্রে বঙ্গের পক্ষী এবং পণিদের কথা জানা যায়। প্রাকৃতিক নানা কারণে এই দ্বীপ জনবসতিশূন্যও হয়ে পড়েছে অনেক সময়, কিন্তু একেবারে জনশূন্য হয়নি, এমনকি গঙ্গাসাগরের তীর্থ ও মেলাও সম্ভবত বাদ পড়েনি। এসেছে Seasonal মানুষজন এবং আশেপাশের অঞ্চল ও জেলাগুলি থেকে তীর্থযাত্রীদের জন্য মেলার ব্যবস্থা করে কিছু উপার্জনেরও ব্যবস্থা করেছে। যাইহোক, যেটি বোঝার প্রয়োজন তা হল, মনুষ্যবসতি ছিল বলেই মহর্ষি কপিলের পক্ষে এই নিম্নবঙ্গীয় জলাভূমিতেও বসতি স্থাপন করে আশ্রম তথা চর্চাকেন্দ্র (সাংখ্য দর্শন) গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। কপিল মুনির সময় অন্ততপক্ষে রামায়ণের যুগ। আর তখন জীবিকার প্রয়োজনে মানুষকে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে আবশ্যিকভাবে জড়িত হতে হত। অর্থাৎ তৎকালের এ-অঞ্চলের (অসুর, পক্ষী, নাগ, শ্রেণীর) মানুষজনের অনেকেই যে চাষী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই অনার্যরা অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর হওয়ার সম্ভবনা। মহাভারতেও আমরা যুধিষ্ঠিরাদির গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানের কথা পাই। দক্ষিণ বঙ্গীয় এইসব অঞ্চল ভীম কর্ত্তৃক বিজিত হয়েছিল এবং রাজসূয় যজ্ঞের সময় এ-অঞ্চলের নৃপতিগণ উপহার সহ যুধিষ্ঠিরের দরবারে হাজির ছিলেন। শুধু তাই নয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ও বঙ্গরাজ বাসুদেব কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। কৃষিই এই

সমৃদ্ধির মূলে ছিল বলা যায়।

গঙ্গা নদীর বয়স পাঁচ হাজার বছর বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কপিল মুনির আশ্রম গঙ্গার স্রোত প্রবাহের আগের। মহারাজ সগরের সময় মহর্ষি কপিল তাঁর পৌত্র অংশুমানকে গঙ্গা আনয়নের উপদেশ দেন (সন্ধি ?)। কিন্তু রাজা সগর থেকেরাজা দিলীপ অনেক চেষ্টা করেও তা সম্ভব করতে পারেননি। শেষে ভগীরথ বহু চেষ্টায় স্রোতস্বিনী গঙ্গাকে এ-অঞ্চলে প্রবাহিত করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই গঙ্গার নাম ভাগীরথী। রামায়ণ কাহিনীতে যে ভৌগোলিক বিবরণ দেখি তাতে অম্বুলিঙ্গ-চক্রতীর্থস্থান পর্যন্ত এসে গঙ্গা শতধারায় বিভক্ত হয়ে সাগরের সঙ্গে মিশে গেছে।

এই কাহিনী থেকে যা জানা যায় তা হল অন্তত পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও এ অঞ্চলে কপিল মুনির বাস ছিল। নদীজলের অভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত ছিল। ভূমি গঠন এবং জনবসতি তো ছিলই। স্বভাবতই কৃষি তখন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারায় আবশ্যিকভাবে এসেছিল। কেননা কপিল মুনি অন্-আর্য লোকেদের মধ্যে বাস করলেও তারা সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত ছিল। অনেকে যুক্তি দিয়েছেন যে ভগীরথ গঙ্গার শুষ্ক মজা খাতকে সংস্কার করে পুনর্খনন করেন। সে কথা মেনে নিলে বলতেই হয় যে একটা নদী, বিশেষ করে গঙ্গা নদীর মত নদী অন্তত চার-পাঁচ হাজার বছরের কমে মজে যায় না। তাহলে তো এ-অঞ্চলের ভূমি গঠনের সব হিসেব ওলট পালট হয়ে যায় এবং সভ্য মানুষের উপস্থিতির সময় প্রায় দশ হাজার বছরও হওয়া সম্ভব। আর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সময়ও সেই সময়কার হবে।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির কারমাইকেল অধ্যাপক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ডঃ ব্রতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দক্ষিণ চব্বিশপরগনার ইতিহাস অন্বেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন "এই ভূ-খণ্ডে আবিষ্কৃত প্রত্ন বস্তুগুলির সাক্ষ্য অনুযায়ী এখানে মনুষ্যের উপস্থিতি বা বসতির ইতিহাস ক্ষুদ্রাশ্মীয় বা নবাশ্মীয় যুগ থেকে"। পরেশ দাশগুপ্তের প্রাগৈতিহাসিক বাংলা, (পৃঃ১১৪) গ্রন্থে বলা হয়েছে উপকূলীয় বাংলার লোকেদের সঙ্গে ক্রীট দেশীয় লোকেদের বাণিজ্য সূত্রে ৩,৫০০ বছর পূর্বেও যোগাযোগ ছিল। ভূমি গঠন, আদিম শিকারি মানুষের আগমন এবং গোষ্ঠীবদ্ধ কৃষি জীবনের অনেক পরেই আরম্ভ হয় ধন সম্পদ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বা বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি।

মেগাস্থিনিস্-এর ভারত বিবরণে গঙ্গারিডিদের দেশ, জাতি, দেশরক্ষা ব্যবস্থা, হস্তী বাহিনী, সৈনদল, শৌর্য বীর্যের কথা বলা হয়েছে কিন্তু এ-অঞ্চলের কৃষির কথা বিশেষ কিছু বলা হয়নি। তবে সার্বিকভাবে ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে কৃষকগণ ভারতীয় জনপদে বৃহত্তর শ্রেণী এবং এরা একাগ্র ভাবে সারা বছর নিজেদের (সপরিবারে) চাষে নিয়োজিত রাখে ও ফসল ফলায় একারণে মানুষের হিতকারী হিসাবে সকল প্রকার বিপদ থেকে রাষ্ট্রীয় ভাবে রক্ষা পায়। সমাজের হিতকারী এই কৃষক সম্প্রদায় তাদের ক্ষেতখামারের কাছে গ্রামেই বাস করে। কৃষকরা রাজাকে কর দেয় এবং উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ রাজকোষে জমা দেয়।

অর্থশাস্ত্রে ক[illegible] ঃ

মৌ[illegible] যুগে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কৃষি আধিকারিক ছিল। তাছাড়া কৃষির কর ইত্যাদি কমবেশী একইভাবে আদায় করা হত। তবে মেগাস্থিনিসের বিবরণে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে যে, এমন কি যুদ্ধের সময়ও শত্রু পক্ষ বা বিজয়ী সৈন্যরা শস্যক্ষেত্র কোনভাবেই

কথা বলা হয়েছে যে, এমন কি যুদ্ধের সময়ও শত্রু পক্ষ বা বিজয়ী সৈন্যরা শস্যক্ষেত্র কোনভাবেই ধ্বংস করত না। দক্ষিণ চব্বিশপরগনা ছিল গঙ্গারিডি জাতি ও গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। টলেমি এবং পেরিপ্লাস গ্রন্থে তার সমর্থন মেলে। গঙ্গারিডি ও প্রাসীর রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার সূত্র ধরে বলা যায় যে দক্ষিণ বাংলার এই অংশও রাজকীয় ক্ষমতায় ভারতীয় রাজনৈতিকতার কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি ছিল। গ্রাম ও নগর এবং বন্দরাদি মিলে তার অনেক আগে থেকেই এ অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী ছিল। শিল্প বাণিজ্যের ভিত্তিই ছিল কৃষি। তাই কৃষি কেন্দ্রিক এই অঞ্চল দেশের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের পথ সুগম করে তুলেছিল বলা চলে। প্রাক মৌর্য যুগের পরবর্তীকালে অর্থাৎ মৌর্য যুগেও বাংলা (দক্ষিণ চব্বিশপরগনাও) মৌর্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবত উড়িষ্যা মৌর্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাই মৌর্য সম্রাট অশোক উড়িষ্যা জয় করতে 'কলিঙ্গ' যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। টলেমি এবং পেরিপ্লাস গ্রন্থকারের অনুসরণ করে বলা যায় যে গঙ্গারিডি রাজ্যের অবস্থিতি সম্ভবত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। নানা প্রকার পাঞ্চমার্ক কয়েন, প্রচুর পাতলা-চওড়া ইষ্টক ইত্যাদির প্রাপ্তি এবং হরিনারায়ণপুর আটঘরা প্রভৃতি অঞ্চলে N.B.P পাওয়া যাওয়ার ফলে এ-অঞ্চল মৌর্য সংস্কৃতি পুষ্ট ছিল তাও বোঝা যায়। আর এই সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি ও কৃষির উন্নতি।

রঘু বংশে কৃষি ঃ

মহা কবি কালিদাসের রঘুবংশে কৃষি ব্যবস্থা তথা ধানচাষ সম্বন্ধে আধুনিককালে এ অঞ্চলে অনুসৃত একটি বিশেষ রীতি যে তৎকালেও প্রচলিত ছিল তা বোঝা যায়। রঘুবংশ কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দিগ্বিজয়ী রঘু বঙ্গ অভিযানকালে সুহ্মগণের দেশ অতিক্রম করে দক্ষিণ বাংলার বঙ্গদের জনপদ আক্রমণ করেন (৪/৩৫-৩৬)। গঙ্গা নদী মোহনায় দ্বীপ বেষ্টিত ভূমিভাগে বসবাসকারী অধিবাসীরা নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল। মহাকবি এখানে একটি উপমা ব্যবহার করেছেন। ধানগাছের চারা যেমন একবার (বীজতলা থেকে) উৎপাটন করে আবার প্রতিরোপন করা হয়, রঘুও তেমনি বিদ্রোহী রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত (নিহত) করে তদ্বংশীয় কাউকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে ছিলেন। কবির কৃষিকার্য সম্বন্ধে, বিশেষ করে বাংলার কৃষি পদ্ধতি (ধান্য বীজ উৎপাটন ও পুনঃপ্রোথিতকরণ বা রোপন) সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান যে ছিল তা বোঝা যায় উৎপাটন——প্রতিরোপন শব্দগুলি থেকে দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় বেশির ভাগ আমন ধান এই প্রকার পুনঃপ্রোথিত বা রোপন (রোয়া) পদ্ধতিতে আজও চাষ হয়ে থাকে। কিছু কিছু স্থানে অবশ্য 'বুনন' পদ্ধতিতেও চাষ হয়। চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে ধান চাষ যে আজকের পদ্ধতিতে হত তার প্রমাণ কালিদাস রেখে গেছেন। অন্যদিকে পেরিপ্লাস গ্রন্থে রপ্তানি দ্রব্যের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে কার্পাস ইত্যাদি চাষও এ অঞ্চলে হত বলে মনে হয়। বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদির চাষও হত। খনার বচনেও কৃষির কথা বহু ব্যাপকভাবে সর্বত্র প্রচলিত। এরও প্রাচীনত্ব রয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন 'সুত্ত'গুলিতেএবং বৌদ্ধ জাতক কাহিনীগুলিতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের যে কথা বলা হয়েছে তারও মূলে কৃষির উন্নতি।

কৃষক ও ভূমি ব্যবস্থা ঃ

গোষ্ঠী জীবনের পর সমাজ জীবনে নানা পরিবর্তন আসে। অষ্ট্রিক কৃষকের সঙ্গে দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে। ফলে নানা উত্থান-পতন চলতে থাকে। রাষ্ট্র

গঠনের দিকে সমাজ এগিয়ে যায়। যৌথ শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। দেশের সীমারেখার পরিবর্তন হতে থাকে। কৃষক সমাজ বৃহত্তর পরিবর্তনের মধ্যেও নিজ নিজ কৃষি সীমানায় কমবেশী আবদ্ধ থাকে। কৃষিভিত্তিক সমাজের উন্নতি কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। উৎপাদিত শস্যাদি নানাভাবে সংরক্ষণ করে ধন উৎপাদনে নিয়োজিত হত। বিনিময় প্রথা ও তৎকালীন মুদ্রাব্যবস্থার মাধ্যমে শস্যের আদান প্রদান ও ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এইভাবেই আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। নদী ও সমুদ্রপথের সান্নিধ্যে থাকায় সহজেই নানা প্রকার উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্য পণ্যে পরিণত হয়ে ধনবৃদ্ধিতে সাহায্য করত। মৌর্য পূর্ব যুগ থেকেই রাজকীয় শাসন ব্যবস্থা জোরদার হয়ে ওঠে। কৃষকের ওপর রাজকীয় ধনবৃদ্ধির চাপ বাড়তে থাকে। মূল আর্যরা সম্ভবত কৃষিকার্যে ব্যস্ত থাকত না।

ক্রমে 'রাজা'ই দেশ তথা ভূমির মালিক হন। কৃষক তাঁকে কর হিসাবে উৎপাদিত শস্যের এক চতুর্থাংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশ পর্যন্ত দিত। যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এই চাপ বৃদ্ধি হতে পারত। স্থানীয় শাসন কর্তাদের ধনবৃদ্ধির চাপেও কর বৃদ্ধি পেত। ফলে আরও বেশীজমি আবাদের আওতায় আসে। অনুর্বর জমি এবং বনাঞ্চল ধ্বংস করে কৃষিভূমির অন্তর্ভুক্ত হতো। রাষ্ট্রীয় গোলযোগ, অরাজকতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বন্যা, খরা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, ভূ-অবনমন ইত্যাদি প্রকৃতিক দুর্যোগ কৃষক জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলত।

গুপ্তযুগ থেকে ভূমিব্যবস্থা ঃ

গুপ্ত রাজত্বকাল থেকে সেন রাজত্বকাল পর্যন্ত নানা প্রকার ভূমি ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে সাধারণভাবে কোন ভূ-খণ্ড ভোগের জন্য স্বত্ত্ব বা অধিকার দিলে সেটি ভোগ-ভুক্তি বা জায়গীর হিসাবে চিহ্নিত হত। কিন্তু বংলায় ভুক্তি কথাটি মোটামুটি (বৃহৎ) প্রদেশ হিসাবে ব্যবহৃত হত। গুপ্ত আমল থেকে সেন আমল পর্যন্ত ভুক্তির উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন তাম্রলিপিগুলিতে। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও বর্ধমানভুক্তি নামে দুটি বিশেষ ভুক্তির উল্লেখ রয়েছে এগুলিতে। রয়েছে দণ্ডভুক্তির কথাও। পালসেন আমলে কঙ্কগ্রামভুক্তি নামক আর একটি ভুক্তির কথাও তাম্রশাসনে রয়েছে। নয়পালের ইরদা শাসনে দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত ভূমি বর্ধমানভুক্তির মধ্যে একীভূত করা হয়েছে (দশম শতক)। দক্ষিণ চব্বিশপরগনা নামক বর্তমান ভূ-খণ্ডটি গঙ্গারিডি, পুণ্ড্র, বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট প্রভৃতি নামধেয় রাজ্য বা অঞ্চলের সঙ্গে কোন না কোন সময় যুক্ত ছিল। পুণ্ড্রজনপদের কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং বৌধায়ন ধর্মসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এইসব দস্যু, অপবিত্রযোনি-কোমেরা (তৎকালীন আর্য মতে) বঙ্গ ও কলিঙ্গীদের, প্রতিবেশী ছিল। মহাভারতের মতে পুণ্ড্ররা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং সুহ্মদের ঘনিষ্ঠজাতি। মনু পুণ্ড্রদের ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলেছেন। মহাভারতের সভাপর্বে পুণ্ড্র এবং বঙ্গ উভয়কেই শুদ্ধজাত-ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। কর্ণ সুহ্ম, বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের পরাজিত করেছিলেন। জৈন কল্পসূত্রে 'কোটিবর্ষ' পুণ্ড্রবর্ধনের একটি প্রসিদ্ধ নগর। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের মহাস্থানগড় শিলালিপিতে 'পুড় নগল' কথাটির উল্লেখ দেখা যায়। এত কথা বলার কারণ এই যে, 'পৌণ্ড্র' নামক জনগোষ্ঠী দক্ষিণ চব্বিশপরগনার আদি বাসিন্দা যারা ক্ষত্রিয়জনিত কার্যে এবং শান্তির সময় কৃষিকার্যে ব্যাপৃত থাকত এবং এখানে দীর্ঘদিন তাদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। মহেন্দ্রনাথ

প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হয়েছিল। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সীমানা ও আয়তন নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। উত্তর বাংলা থেকে সুদূর উত্তরসীমা আরম্ভ হয়ে দক্ষিণের সুন্দরবন অঞ্চলের খাড়ি পর্যন্ত (বিভিন্ন সময়কালে)এর বিস্তৃতি। পাল ও সেন রাজত্বকালে বাংলার মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ অংশকে এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। তবে এখানে একটি পরিষ্কার সীমারেখাকে মেনে চলা হয়েছে— তা হল ভাগীরথী (গঙ্গা) অর্থাৎ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্ষেত্রে নদী আদিগঙ্গার পূর্বতীর বরাবর (সাগর পর্যন্ত) ভূ-ভাগ এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। অনেকগুলি 'মণ্ডল' বা বিষয় (অর্থাৎ জেলা) এবং কতকগুলি 'ভাগ', 'বীথী', 'খণ্ডল' বা খণ্ড ইত্যাদি (মহকুমা) এই পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে 'কোটিবর্ষ' যেমন ছিল, তেমনি ছিল ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল, সমতট, খাড়ি ইত্যাদি— যেগুলি বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় বা তার কাছাকাছি। বিজয়সেনের মল্লসারুল শাসন, নয়পালের ইর্‌দা শাসন, বল্লালসেনের নৈহাটি শাসন ও লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে বর্ধমানভুক্তির উল্লেখ রয়েছে। সমগ্র চব্বিশপরগনার ক্ষেত্রে এই বর্ধমানভুক্তিটি সুদূর উত্তর থেকে ভাগীরথী গঙ্গা বরাবর দক্ষিণ চব্বিশপরগনার আদিগঙ্গার পশ্চিমতীর ধরে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বখাটিকা বা পূর্বখাড়ি যেমন আদিগঙ্গার পূর্বতীরে, বর্তমান খাড়ি অঞ্চলের অঙ্গীভূত হয়ে বঙ্গোপসাগর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তেমনি পশ্চিম খাটিকা আদিগঙ্গা বরাবর তার পশ্চিমতীর ধরে বর্তমান খাড়ির পশ্চিম দিকের ভূমি তথা গ্রামগুলি সহ বঙ্গোপসাগর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার আঞ্চলিক ভূ-খণ্ডের আদিগঙ্গা বিভাজিত পশ্চিম দিক, সমুদ্র পর্যন্ত, এই বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আদিগঙ্গা দ্বারা বিভাজিত হওয়ায় খাড়ির পূর্বদিক পূর্বখাটিকা এবং পশ্চিম দিক পশ্চিমখাটিকা বলে চিহ্নিত। ডাকার্ণব গ্রন্থে খাড়ির পৃথক অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। খাড়িকে লক্ষ্মণসেনের বকুলতলা (সুন্দরবন) তাম্রলিপিতে ঐ একই পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়ি বিষয় বলা হয়েছে (নিঃসন্দেহে আদিগঙ্গার পূর্বভাগ)। কৃষি উৎপাদন থেকে বেশী বেশী কর আদায় করা এবং বনভূমিকে কৃষিভূমিতে বেশী পরিবর্তন করতে এই বিকেন্দ্রীকরণ শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল।

গুপ্ত আমলে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসনকর্তাকে 'উপরিক' বলা হত। পাল-সেন তাম্র শাসন গুলিতে 'মণ্ডল'-এর শাসনকর্তাকে 'মহামাণ্ডলিক' বলা হত। এঁরা মহারাজা উপাধি গ্রহণ করতেন।

ডোম্মনপালের রাক্ষসখালি তাম্রশাসনে পূর্ব খাটিকা এবং বৰ্দ্ধমানভুক্তির কথা বলা হয়েছে (১১৯৬ খৃঃ)। ইনি পূর্বখাটিকার একজন স্বাধীন সামন্তরাজা (পালবংশীয় রাজাদের সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না) ছিলেন। এখানেও পূর্ব খাটিকা ইত্যাদি বিভাগের নাম পাচ্ছি। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এখানে দ্বারহাট, ধামাহাটি ইত্যাদির নাম পাচ্ছি যেগুলি দিয়ে কৃষিপণ্য ও রপ্তানি হত।

রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে 'ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল' গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীদ্বয়ের মোহনা নিয়ে গঠিত এবং এর বিস্তৃতি (প্রাচীন) ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা (দক্ষিণ চব্বিশপরগনা) পর্যন্ত ছিল (পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ)। দেখা যাচ্ছে এই ব্যাঘ্র অধ্যুষিত বনভূমি অঞ্চলেও তখন রীতিমত চাষের আওতায় এসেছে।

দক্ষিণ চব্বিশপরগনার ভূমি বিভাগে তৎকালে গ্রামই ছিল ভূমি ব্যবস্থার সর্বনিম্ন

একক (Unit)। কিন্তু 'মণ্ডল' বা 'বিষয়ের' (যেমন ঃ খাড়ি মণ্ডল বা খাড়ি বিষয়) পরে এবং গ্রামের আগে আর একটি ভাগ ছিল। এটিকে 'চতুরক' বলা হয়েছে। 'চতুরক' কে বিশেষজ্ঞরা 'থানার' সমান বলেছেন। অর্থাৎ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি চতুরক। চতুরক সম্বন্ধে নলিনী ভট্টশালী মহাশয় একটি পৃথক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ "সেন আমলের চতুরকগুলির আকৃতি কতকটা অনুমান করা যায়। সমস্ত দেশটা জরিপ করিয়া উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমাভিমুখী এক এক কোণা বিশিষ্ট, সম্ভবত সমানায়তনের কতকগুলি চতুষ্কোণে সমগ্র দেশ বিভক্ত হইয়াছিল। .... প্রত্যেক চতুষ্কোণ বা চতুরক উহার অন্তর্গত কোন বিখ্যাত গ্রামের নামে নামাঙ্কিত হইত। চতুরকগুলি সভাবতই চারিটি চতুষ্কোণে বিভক্ত হইত। উহাদিগকে বলিত খাটিকা ....। দিক অনুসারে উহাদের এক একটি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ বলিয়া উল্লিখিত হইত।" অবশ্য সব বিশেষজ্ঞ এই সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে একমত কিনা জানা নেই। আরও ক্ষুদ্রতর ভাগগুলি হল 'পাটক' বা পাড়া। এই পাটকগুলির নাম থাকে। ভট্টশালী মহাশয় আরও বলেছেন, " কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি বুঝাইতেও যে পাটক ব্যবহার হইত, বঙ্গীয় শাসনগুলির আলোচনা করিলে তাহাই প্রতীয়মান হয়" (লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর তাম্রশাসন, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ৮৪-৮৮)। অর্থাৎ পাল-সেন আমলে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক আওতায় এনে কৃষি জমির বণ্টন ব্যবস্থা ও কর ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছিল।

ভূমিদান ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি ও মাপ ঃ

মৌর্য, গুপ্ত যুগ থেকে দেশের সমগ্র ভূমির মালিকানা যেহেতু রাজার, ভূমির দান, বিক্রয় ইত্যাদি হস্তান্তর রাজাদেশ ছাড়া সম্ভব ছিল না। শিলালিপি, তাম্রশাসনাদি থেকে একটি বিষয় কিন্তু পরিষ্কার যে ভূমি চাষের ব্যাপারে একচ্ছত্র অধিকার ছিল কৃষকের। ভূমি চাষ করা, তার সংরক্ষণ, বৃদ্ধিকরণ ও জঙ্গল পরিষ্কার করণ ইত্যাদি সব কাজটাই কৃষককে করতে হত। এইসব কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উৎপাদন এবং এই উৎপাদনের বৃদ্ধি করে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে অধিকতর সহায়তা করা। জমিতে কৃষকের এই অধিকার যেমন ছিল তেমনি রাজকোষ পূরণ করতে কৃষকের উপর যে প্রচণ্ড চাপ ছিল তা নিপীড়নেরই সামিল। বিশেষ করে যুদ্ধের সময়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা অন্য কোন প্রকার আপৎকালীন অবস্থায় ধনবৃদ্ধির প্রয়োজনে বা রাজকোষে অর্থাগমের প্রচেষ্টায় কৃষকের উপরই জুলুমটা বাড়ত। অন্যদিকে মৌর্য আমলের মহাস্থান শিলালিপি থেকে জানা যায় যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের এক্তিয়ারে অথবা সরকার প্রভাবিত ধর্মস্থানগুলিতে আপৎকালীন সাহায্যের জন্য খাদ্য ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত করা থাকত। বিপদের সময় বা বিশেষ প্রয়োজনে কৃষকদের খাদ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হত এবং ঐ সব খাদ্যভাণ্ডার থেকে খাদ্যশস্য (এবং অর্থ) সাহায্যও করা হত। অবশ্য এই সব সাহায্য সাময়িক এবং তা অবস্থার উন্নতি সাপেক্ষে ফেরৎ যোগ্য (মহাস্থান শিলালিপি)। সাধারণত কৃষিজমি দান বিক্রয় হস্তান্তর করা হত না। জমি মাত্রেই ক্রয় করতে হলে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে রাজাকে প্রার্থনা জানাতে হত আবেদন আকারে এবং কি জন্য জমি কিনতে চাওয়া হচ্ছে তার উদ্দেশ্যও পরিষ্কার করে জানাতে হত। পঞ্চম থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে ভূমি দান বিক্রয় সম্বন্ধীয় রীতির বিস্তৃত উল্লেখ দেখা যায়। একটি ছাড়া দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় অবশ্য এই পর্বের কোন শাসন বা লিপি

তার উদ্দেশ্যও পরিষ্কার করে জানাতে হত। পঞ্চম থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে ভূমি দান বিক্রয় সম্বন্ধীয় রীতির বিস্তৃত উল্লেখ দেখা যায়। একটি ছাড়া দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় অবশ্য এই পর্বের কোন শাসন বা লিপি পাওয়া যায়নি। তবে বাংলার অন্যান্য শাসনগুলি থেকে বিশেষ করে পাল-সেন আমলের তাম্রশাসনগুলি থেকে এবং দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসন, বকুলতলা তাম্রশাসন এবং ডোম্মনপালের রাক্ষসখালি তাম্রশাসন, জয়নাগের তাম্রশাসন এবং দক্ষিণ চব্বিশপরগনার কাছাকাছি প্রাপ্ত অন্যান্য তাম্রলিপি গুলি (দামোদরপুর তাম্রশাসনগুলি, বৈগ্রাম তাম্রশাসন, নৈহাটি তাম্রশাসন, তপনদীঘি তাম্রশাসন, আনুলিয়া তাম্রশাসন ইত্যাদি) থেকে ভূমি দান ও ক্রয় বিক্রয়, রীতি এবং নিয়মকানুনগুলি পরিস্ফুট হয়। আবেদনকারী তার উদ্দেশ্য জানানোর পর রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট অধিকর্তার (পুস্তপাল) কাছে পাঠিয়ে জমির প্রকৃতি, দখলীকার, অন্য কোন আবেদন আছে কিনা, ভূমির তৎকালীন মূল্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানতে চাইত। লক্ষ্যণীয় যে অধিকাংশ জমিই কেনা হচ্ছে (এবং যে সব জমি সরকার দান করছেন) দেবকার্যে ব্যবহারের জন্য বা কোন ধর্মাচরণের অথবা মন্দির নির্মাণের জন্য। অন্যদিকে দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন দুটিতে দেখি মহারাজা লক্ষ্মণসেন তাঁর রাজ্যাভিষেক বার্ষিকীতে (২য়-৩য় রাজ্যাঙ্কে) যশোবৃদ্ধি ও পুণ্যলাভের আশায় দুজন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করছেন। দান বা বিক্রয়ের রাষ্ট্রীয় যে আদেশ বা অনুমতি প্রদান করা হয় তা সাধারণত এই জাতীয় তাম্রলিপির আকারে Charter বা Deed (আদেশনামা বা দলিল) আকারে প্রজ্ঞাপিত করা হয়। এই প্রজ্ঞাপনের জন্য একজন 'দূত' থাকেন এবং সমগ্র আদেশই মহারাজাদের নামে বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকত। কিন্তু তা যেমন রাজকীয় পরিবারের উপস্থিতিতে সবাইকে (রাজপুত্র, রাজ্ঞী) জানানো হত তেমনি মহামন্ত্রী, সেনাপতি, স্থানীয় সব রাজপুরুষ, গ্রামপতি পর্যন্ত, ঐ এলাকার চাষ ও চাষীর স্বার্থরক্ষাকারীদের, এমনকি ক্ষেত্রকার, ক্ষেত্রকরণগণকেও (কৃষকদের) সবার উপস্থিতিতে জানানো হত। দানকৃত জমির পরিমাণ, চতুঃসীমা, মূল্য, মাপ, খাজনার পরিমাণ, উৎপন্ন ফসলের বার্ষিক মূল্য বা আয়, কৃষি, অকৃষি ও বাস্তুজমি— কতটা কি প্রকারের, এই দানকৃত (বা বিক্রীত) জমির মধ্যে যে উর্বর অনুর্বর জমি রয়েছে, রয়েছে পুকুর, ডোবা ইত্যাদি, রয়েছে তৃণভূমি, গোচর, রাস্তাঘাট, গোরু ও হাল যাবার (চাষের জন্য) পথ, রয়েছে বন, ঝোপঝাড়, এবং ফলের বাগান ইত্যাদি সবকিছু বলা থাকত। নিকটস্থ নদীখাল, জলাশয়, হাট, পারঘাট, জনপদ, মন্দির (রত্নত্রয় বহিঃ— বৌদ্ধ মঠ বা সঙ্ঘারাম, ডোম্মনপালের রাক্ষসখালি তাম্রশাসন) ইত্যাদিরও উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। দানকৃত (বা বিক্রীত) জমির প্রকৃতি, সীমা ও পরিমাণ জানানো হয়। পরিমাণ পুরো গ্রাম হলে সেই ভাবে বলা হয়: খণ্ড হলে সীমানার চারিদিকের বর্ণনা সহ মোট মাপও উল্লেখ করা হয়। যেমন গোবিন্দপুর তাম্রলিপিতে বলা হয়েছে : "......... এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন তদ্দেশীয় ব্যবহারিক ৫৬ হস্ত পরিমিত 'নল' দ্বারা সপ্তদশ উন্মাণাধিক, ৬০ দ্রোণ পরিমিত একখণ্ড জমি, প্রতিদ্রোণে ১৫ পুরাণ উৎপত্তি নিয়মে বার্ষিক ৯০০ পুরাণ আয় বিশিষ্ট বিড্ডার শাসন গ্রামটি বনজঙ্গল বৃক্ষাদি সহ (সঝাট বিটপ), জলস্থল, ডোবা-পুষ্করিণী এবং সুপারি নারিকেল বৃক্ষাদি সহ, চট্ট-ভট্ট প্রবেশ রহিত এবং সর্বপ্রকার উৎপীড়ন রহিত, তৃণপুতি ও গোচরভূমি পর্যন্ত .... সামবেদীয় .... শ্রীব্যাসদেব শর্মণ কে .... মাতাপিতা ও নিজের পুণ্যলাভে ও যশোবৃদ্ধির জন্য .... দান করা হল"।

রাজপুরুষ প্রভৃতি উচ্চপদাধিকারীদের সঙ্গে উপস্থিত হস্তী, অশ্ব, গোমহিষাদি পালনে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণ এবং জনপদবাসিগণকে ক্ষেত্রকরদিগকে (কৃষক), ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান পূর্বক জানানো হচ্ছে এবং আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে আপনারা সবাই (এই দান) অনুমোদন করুন। দানকৃত গ্রামটি হল বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতি পশ্চিম খাটিকার বেতড্ড চতুরকে বিড্ডার শাসন নামক একটি গ্রাম যার চতুঃসীমা হল পূর্বে জাহ্নবীর অর্দ্ধসীমা, দক্ষিণে লেঙ্ঘদেবসীমা, পশ্চিমে ডালিম্বক্ষেত্রসীমা, উত্তরে ধর্মনগর সীমা। অনুরূপভাবে লক্ষ্মণসেন দেবের সুন্দরবন তাম্রশাসন (বকুলতলা) থেকে জানা যায় যে এই শাসনটিতেও একই ভাবে সমস্তপ্রকার প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী, রাজপুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি, অধীনস্থ রাজা ও সামন্তরাজগণ, হস্তীআধিকারিক, স্থানীয় শাসক, গ্রাম প্রধান, পুলিশ প্রধান, নৌসেনাধ্যক্ষ, গোমহিষপালক প্রধান, প্রধান বিচারপতি, সমস্ত রাজপদোপজীবী, চট্টভট্ট জাতীয় জনপদ, ব্রাহ্মণ, ক্ষেত্রকরগণ (কৃষকগণ) প্রভৃতি সবাইকে যথাযথ সম্মান সহকারে জানানো হচ্ছে এবং আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত খাড়ীমণ্ডলের কান্তাম্লপুরচতুরকে পূর্বদিকে শান্ত্যাগারিক প্রভাস-শাসন-সীমা, দক্ষিণে চিতাড়ীখালের অর্ধসীমা, পশ্চিমে শান্ত্যাগারিক বামদেব-শাসনের পূর্বপার্শ্বসীমা, উত্তরে শান্ত্যাগারিক বিষ্ণুপাণি গাড়োলী ও কেশবগড়োলীদের (গহড়বাল?) ভূমি সীমা— এইরূপ চতুঃসীমাযুক্ত 'মণ্ডল গ্রামের' বাস্তুসহ মোট তিন ভূ-দ্রোণ, এক খাদিকা, তেইশ উন্মাণ আড়াই কাকিণী পরিমাণ একখণ্ডজমি বনভূমি, বৃক্ষলতাদি, উর্বর-অনুর্বর জমি, জলাশয় ও সুপারী-নারিকেল প্রভৃতি গাছপালা সহ, চট্টভট্ট প্রবেশরহিত এবং সর্ব প্রকার উৎপীড়ন ও দায়বদ্ধতা ছাড়া বার্ষিক পঞ্চাশ পুরাণ আয় প্রদানকারী এই ভূ-খণ্ড তৃণভূমি ও গোচর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই ভূমি নরসিংহধর দেবশর্মার পুত্র শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্মাকে ভূমিচ্ছিদ্র-ন্যায় অনুযায়ী নিজের ও পিতামাতার যশোবৃদ্ধির কারণে তাঁর রাজ্যাভিষেকের ২য় সংবতের মাঘ মাসের দশম দিনে যথাযথ নিয়মে দান করা হল। অপরপক্ষে ডোম্মনপালের রাক্ষসখালি তাম্রশাসনে দেখা যাচ্ছে, অযোধ্যা আগত পালবংশীয় মহাসামন্তাধিপতি মহারাজ ডোম্মনপাল স্বীয় মুক্তিভূমি পূর্বখাটিকা (পূর্বখাড়ি) অন্তঃপাতি শ্রীদ্বারহট্টকে সমুপস্থিত অনেক রাজা, রাজন্যক, রাজপুত্র, রাজ্ঞী, সপ্তঅমাত্য, দণ্ড নায়ক, আরোহক, রাজোপাদোপজীবী, প্রতিভাসী ও প্রাদেশিক আধিবাসীগণের উপস্থিতিতে বামহিট্টি (বা ধামহিট্টা) নামক একটি গ্রাম বন্ধুকৃত্য হিসাবে তাঁর মিত্র মহারাণক শ্রীবাসুদেব শর্মা (পুরুষোত্তমদেবের পুত্র) কে দান করছেন। এই গ্রামটির সন্নিকটেই রয়েছে একটি ত্রিরত্ন বা বৌদ্ধসংঘারাম (মঠ) এবং গ্রামটির জন্য কোন প্রকার কর প্রদান করতে হবে না। জল স্থল সহ খানাখন্দ এবং অনুর্বর জমি সহ, সঝাট-বিটপ, আম্র এবং মধুক(মহুয়া) বৃক্ষাদি সহ, চট্ট ভট্ট প্রবেশরহিত চৌহদ্দি চিহ্নিত প্রদত্ত এই গ্রামটির দানকার্য সবাই অনুমোদন করুক। বসবাসকারী ব্যক্তিগণ ও কৃষকগণ তাদের প্রদেয় কর, সেস ইত্যাদি যথাযথ প্রদান করে যথাস্থানেই অবস্থান করবে। কৃষকদের রাজাকে আর কর দিতে হবে না। এখানে জমির পরিমাণ দেওয়া নেই— পুরো গ্রামটিই দান করা হয়েছে ১১১৮ শকাব্দের (১১৯৬ খৃঃ) বৈশাখ মাসের ৯(?) (দিনে) তারিখে (EP. Indica. XXVII, Page: 123)।

বর্তমানে কাকদ্বীপ মহকুমার অন্তর্গত পাথরপ্রতিমা থানার মলয়া (JL-98) নামক গ্রামে প্রাপ্ত আনুমানিক ষষ্ঠ - সপ্তম শতকের রচিত (১৯৩১ খৃঃ প্রাপ্ত) কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)

'সেস'-এর কথা জানা যাচ্ছে।

কৃষি-উৎপাদন ও তাম্রশাসন ঃ

মোটের উপর এইসব তাম্রলিপি থেকে আমরা পাচ্ছি কৃষি জমির চাহিদা, জমি জরিপ ও মাপ-মান, মূল্য, উৎপন্নদ্রব্য এবং জমি থেকে বার্ষিক আয় ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে কৃষিজমি বিশেষত অকর্ষিত জমির দাম বাস্তু জমি ও কর্ষিত জমি অপেক্ষা বেশী। উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে ধানের কথাই প্রথমে আসে। বনভূমি ও জঙ্গল ছিল। তাতে কাঠ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হত। 'ঝাট-বিটপের' কথা প্রায় সব তাম্রশাসনে বলা হয়েছে। মলয়া তাম্রলিপিতে সর্বের উৎপাদনের কথা স্পষ্ট। সব তাম্রলিপিতেই প্রায় বলা হয়েছে উৎপন্ন ফলফলাদি ও পুষ্পরাজির কথা। গোবিন্দপুর তাম্রলিপিতে এবং সুন্দরবন (বকুলতলা) তাম্রশাসনে গুবাক ও নারকেল ইত্যাদি ফলফলাদির কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য তাম্রশাসনের অনুসরণে এবং সুপারি ইত্যাদির উৎপন্ন হওয়ার ফলে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে এঅঞ্চলে পানের চাষও হত (বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্যপরিষৎ তাম্রশাসন— পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সমুদ্রতীরবর্তী কয়েকটি গ্রামের মূল উৎপাদন ছিল পান)। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে প্রদত্ত জমি বর্ধমানভুক্তির পশ্চিমখাটিকায় বেতড্ডচতুরকে বিড্ডারশাসন গ্রামে - (বর্তমান বারুইপুর থানার শাসন গ্রাম) উত্তরে ধর্মনগর (বর্তমানে বিড়ালধামনগর) মোট ৬০ দ্রোণ, ১৭ উন্মাণ, উৎপন্ন ফসলের মূল্য ৯০০ পুরাণ। আর সুন্দরবন শাসনে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়িমণ্ডলের কান্তাল্লপুর চতুরকে প্রদত্ত মণ্ডল গ্রামের (পূর্বে চিতাড়ী খালের অর্ধসীমা) মোট পরিমাণ ৩ ভূ-দ্রোণ, ১ খাদিকা ২৩ উন্মাণ আড়াই কাকিনী; উৎপন্নমূল্য ৫০ পুরাণ। এই আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস সুপারী ও নারিকেল। এছাড়াও উল্লিখিত তাম্রশাসনে 'সজল-স্থল ঃ সগর্তোষরঃ' অর্থাৎ জলাশয় ও স্থলভাগ এবং খানাখন্দ ও পুষ্করিণীও ছিল। জলাশয় ও পুষ্করিণী ইত্যাদির বিশেষ উল্লেখ এবং তা থেকে আয়ের হিসাবও বার্ষিক উৎপন্ন মূল্যের মধ্যে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এইসব জলাশয়, খানাডোবা, পুকুরগুলো থেকে স্বাভাবিক ভাবেও চাষ করে উৎপাদিত প্রচুর মাছ ইত্যাদি পাওয়া যেত যার থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থও পাওয়া যেত। এটা স্বাভাবিক যে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে এবং নদীবাহিত পলি অঞ্চলের এইসব উর্বর জমিতে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্য জন্মায়— জন্মায় প্রচুর পান সুপারী, নারকেল ও অন্য ফলফলাদি; বনজসম্পদ ও জলজ সম্পদও আহরণ করা যায়। কিন্তু এ ছাড়াও কিছু অবাক করার মত উৎপন্ন দ্রব্যের নাম পাচ্ছি এইসব তাম্রশাসন থেকে। লক্ষ্মণসেন দেবের গোবিন্দপুর তাম্রশাসন থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি 'ডালিম্ব ক্ষেত্রের' কথা। প্রদত্ত গ্রাম বিড্ডার শাসনের চতুঃসীমা বর্ণনা প্রসঙ্গে এই গ্রামের পূর্বে জাহ্নবীর (আদি গঙ্গার) অর্ধ-সীমা, পশ্চিমে ডালিম্বক্ষেত্র সীমা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই গ্রামের পশ্চিম দিকে একটি প্রসিদ্ধ (না হলে উল্লেখ করা হত না) ডালিমক্ষেত ছিল। বর্তমানকালে পেয়ারা যেমন এই বারুইপুর থানা অঞ্চলে একটি বিশেষ এবং প্রসিদ্ধ উৎপন্ন ফসল, তেমনি তৎকালে অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের (১১৭৯-১২০৬ খৃঃ) আমলে ছিল ডালিম। এছাড়া 'তৃণ-পূতি'— অর্থাৎ বিশেষ ধরণের তৃণ থেকেও কিছু আয় হত। আবার এইসব ভূমির মধ্যে অনুর্বর ভূমিও যেমন ছিল তেমনি গোচর বা গো-চারণভূমিও বিদ্যমান ছিল (প্রগ্রাহ্য তৃণ-পূতি গোচর

পর্যন্ত ঃ)।

ডোম্মনপালের তাম্রশাসনে নতুন কিছু উৎপন্ন দ্রব্যের কথা বলা হয়েছে। লিপিটির অষ্টম লাইনে আছে ঃ ' স-আম্র মধুক ঃ'। অর্থাৎ এখানে বধোমহিত (ধামহিট্ট) নামক যে গ্রামখানি দান করা হচ্ছে সেখানে বনভূমি এবং অন্যান্য ফলফলাদির গাছ সহ (স-ঝাট-বিটপঃ) আম্র বা আম এবং মধুক বা মহুয়া গাছের বাগান ছিল, আর তা থেকে আয়ের একটা বড় অংশ আসত। আমের ফল এবং আম্র মুকুলের মধু এবং মহুয়ার ফুল, মধু এবং মহুয়ার সুরা উল্লেখযোগ্য উৎপন্ন দ্রব্য। ঝাট-বিটপের মধ্যে গৃহাদি নির্মাণের জন্য বাঁশ, বেত, উলু, সুন্দরী, গরান, গেঁয়ো, গোলপাতা উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া মেগাস্থিনিস, টলেমি, পেরিপ্লাস গ্রন্থকার, চৈনিক ও অন্যান্য ভ্রমণকারীদের বিবরণাদি থেকে যা বোঝা যায় তাতে এই নদী সমতটীয় অঞ্চলে, কার্পাস, রেশম (বট-অশ্বত্থ, কুল ইত্যাদি গাছ থেকে) পিপ্পলী বা পিপুল, তেজপাতা, আখ, সরিষা ইত্যাদি উৎপন্ন হত। বন ও কাষ্ঠাদি থেকে বনজাত দ্রব্য, কাঠ, রঞ্জন দ্রবাদি, ঔষধ পত্র, ইত্যাদি তৈরী হত। খাড়ি, দ্বারহাটক ইত্যাদি নদীতীরবর্তী বড় বড় হাট বা বাজার ছিল। বর্হিবাণিজ্যের জন্য ছিল গঙ্গে, তিলোগ্রামম্, পলুরা প্রভৃতি সামুদ্রিক বন্দর (টলেমির ম্যাপ এবং পেরিপ্লাস গ্রন্থ)। নানারকম পশু এবং পাখীও (বনজ?) রপ্তানি তালিকায় দেখা যায়। মধ্য যুগে এবং তার পরবর্তীকালে আদিগঙ্গা ও তার শাখা নদী পিয়ালী, বিদ্যাধরী, মাতলা, কালনাগিনী, সপ্তমুখী ইত্যাদি নদী দিয়ে প্রচুর বাণিজ্যতরী (চাঁদ সদাগরের মত) স্থানীয় নানা প্রকার কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করত। চৈতন্যদেবের সময়ও দেখি দ্বারিরজাঙ্গাল নামক একটি সুগম্য পথের নাম যা দেশের সুদূর অভ্যন্তর থেকে গঙ্গাসাগর মোহনা বা গঙ্গে বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত। চৈতন্যদেব নীলাচলে যাবার সময় এই পথে এবং আদিগঙ্গা ধরে নৌপথে ভ্রমণ করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য গুলিতেও এই আদিগঙ্গা নদীপথের কথা বলা হয়েছে।

কাজেই বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে ধান, যব, ইক্ষু, কলা, ডালিম, আম, কাঁঠাল, কার্পাস, পাট (পট্টবস্ত্র?), পান, সরিষা, পিপুল, মদ্য, রেশম, নারিকেল, সুপারীসহ নানা ফলফলাদি ছিল। আর এগুলি স্থানীয় ভাবে এ-অঞ্চলে তৈরী হত।

অভিজ্ঞতার আলোকেঃ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রানুসন্ধানে দেখা গেছে যে এখনো পর্যন্ত ধান দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। গম, যব, সরিষা রবিশস্য হিসাবে এখনো কোন কোন অংশে চাষ হয়। কার্পাস গাছ যথেষ্ট আছে। বট, অশ্বত্থ, কুল ইত্যাদি গাছ (যাতে আগে রেশম কীট এই অঞ্চলে পালিত হত) প্রচুর। নীলের চাষ তো ইংরেজ আমল পর্যন্তও ব্যাপকভাবে হয়েছে (রঞ্জক হিসাবে বহুকাল থেকে ব্যবহৃত)। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এখানো অনেক আখের খেত দেখা যায়। মহুয়া গাছও একেবারে বিরল নয়। বারুইপুর ষ্টেশনেই প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন মহুয়া গাছ রয়েছে। বারুপুরের (বর্তমান) দক্ষিণের শাসন (বিড়ার শাসন) গ্রামের পশ্চিমে বিখ্যাত যে ডালিম্বক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে তা হয়ত এক সময় নিহাটা-কল্যাণপুর অঞ্চলের ধাড়িদের মাঠ বা চম্পাবাগানের (চামবাগানের মাঠ) কাছাকাছি কোথাও ছিল। তবে এখনো এ জেলার অনেক বাড়ীতেই ডালিমের চাষ (এমনকি পাথরপ্রতিমার

সীতারামপুরেও) আছে। আম, জাম, কাঁঠাল, বেল, তাল প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য ধানের কথা আমরা মাত্র মহাস্থানগড় শিলালিপি থেকে জানলেও এ অঞ্চলে অষ্ট্রীক জাতীয় জনগণের আগমনপূর্ব আমল থেকেই ধান চাষ হত। রঘুবংশে রোপন প্রথার কথা বলা হয়েছে — কিন্তু তার আগে বপন প্রথা এবং তৃণভূমি বা জঙ্গল পুড়িয়ে বুনন বা বীজ ছড়িয়ে চাষের আদি প্রথা যে এ-অঞ্চলে প্রচলিত ছিল তা সর্বজন বিদিত। আমাদের ক্ষেত্রানুসন্ধানকালে পাথরপ্রতিমা থানার জি-প্লটের গোবর্দ্ধনপুর গ্রামের সমুদ্রতটের ক্ষয়প্রাপ্ত মৃত্তিকাতলদেশে যে মন্দির ও গৃহরাজির ভগ্নাংশ ও ভিত্তি দেখতে পাওয়া যায় তার থেকে সংগৃহীত হয়েছে বহুতর পটারী ইত্যাদি সহ (দ্রষ্টব্য : 'দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল'— কৃষ্ণকালী মণ্ডল) চওড়া চওড়া অনেক ইট। এগুলির মাপ হলঃ ৩২ সেমি X ১৯.৫ সেমি X ৫ সেমি বা ৩২ সেমি X ২০.৫ সেমি X৫সেমি বা ৩১.৪সেমি X ১৯সেমি X ৪.৫ সেমি। সাইজের দিক থেকে এই ইটগুলি অন্যস্থলে প্রাপ্ত মৌর্য যুগের ইটের অনুরূপ। ঐ ইটগুলি পোড়ানোর আগে কাঁচা অবস্থায় মাটির উপর ধানের চিটে এবং তুষ বিছানো ভূমিতে রেখে যে শুকনো করা হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে এখনো ঐ ইটগুলোর গায়ে কালো হয়ে যাওয়া তুষ এবং ধানের চিটে লেগে থাকায় এবং উভয় দিকে। যেখানে চিটেগুলো নেই সেখানে তার (দাগ) চিহ্নগুলি রয়েছে। শুধু তাই নয় সম্ভবত মাটি পাট করার সময় কাদামাটির সঙ্গে ধানের চিটে এবং তুষ মিশিয়ে নেওয়া হত। কেননা ইটগুলো ভেঙ্গে দেখা গেছে যে ভিতরেও তুষ এবং চিটে দৃশ্যমান। কাজেই এটা পরিষ্কার যে সুদূর প্রাচীন সেইকালে (প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অন্তত মৌর্য যুগে) এ-অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপাদন হত। নালন্দার ধ্বংসস্তূপ ও মহাস্থানগড় শিলালিপি এমনকি মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকেও ধান (ও খাদ্যশস্য) সংরক্ষণ করার খাদ্যভাণ্ডারের কথা জানতে পারি। কাজেই প্রাগার্য যুগ থেকেই যে ভারতের নদী অববাহিকাগুলিতে ধান চাষ হত তা পরিষ্কার। দক্ষিণবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। সভ্যতার উষাকাল জনিত তারতম্যের ফলে সময়ের কিছু হেরফের অবশ্য হতেই পারে। আমাদের ক্ষেত্রানুসন্ধানে ধরা পড়েছে যে নেতিধোপানির মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে আবাদি গাছপালা রয়েছে, যা লবণাক্ত ভূমিতে হওয়ার কথা নয়। বকুল, শিরিষ, দেবদারু প্রভৃতি গাছের সারি এখানে আছে। আছে প্রাচীন পাকা মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। একইভাবে জি-প্লটের উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জের প্রায় ২.৫ বর্গ কি.মি. অঞ্চল জুড়ে রয়েছে আবাদি বা রোপন করা ফল ফলাদির গাছ। দেখে মনে হবে যেন এ জেলার ফলের বাগান বলে কথিত বারুইপুরের মত ফলের বাগিচা। আম, জাম, কাঁঠাল, বেল, ইত্যাদি ফলের বহু প্রাচীন বৃক্ষাদি এবং ফলনও এগুলোর এখনও প্রচুর। রয়েছে বাঁশ ঝাড়। সমগ্র দ্বীপের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ। মনে রাখা দরকার এর নিকটেই রয়েছে রাক্ষসখালি বা 'F' Plot যেখান থেকে (ব্রজবল্লভপুর) ডোম্মনপালের তাম্রশাসনটি পাওয়া গেছে। প্রদত্ত গ্রাম ধামহিট্টি (বামহিটা বা বধোমহিত) যার বাহিরে ছিল একটি সঙ্ঘরাম বা বৌদ্ধমঠ। আর প্রদত্ত গ্রামেই পাওয়া যেত আম ও মহুয়া। যাই হোক, উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জে যেমন ঐসব ফলের গাছ রয়েছে তেমনি এখানে পাওয়া গেছে অনেকগুলি কালো পাথরের বিষ্ণু মূর্তি, গণেশ মূর্তি, হরিহর মূর্তি, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি (সবই প্রায় ভগ্ন) এবং গুপ্ত যুগের স্বর্ণ মুদ্রা, শশাঙ্কের সময়কার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, প্রাচীন ডেকরেটেড (চকোলেট রঙের) পটারী — যাতে চৈনিক ড্রাগনের মত সিংহ, হস্তী,

ময়ূর, কেটলির মত দ্বিমুখযুক্ত পাত্র ইত্যাদি আঁকা আছে। এগুলি আমদানীকৃত অর্থাৎ এঅঞ্চলের কৃষি উৎপাদিত দ্রব্যাদির সঙ্গে ধর্মীয় এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের সুস্পষ্ট সম্পর্কযুক্ত নিদর্শন এগুলি। অন্যদিকে দেবমন্দির নির্মাণের সঙ্গে বৃক্ষরোপন পুষ্করিণী খনন আবশ্যিক শাস্ত্রীয় নির্দেশ ছিল।

এই সব তাম্রলিপি থেকে আর একটি জিনিষ পরিষ্কার যে সেকালে পুস্তপাল নামক একটি রাজকীয় আধিকারিক ছিলেন যিনি সব জমির জরিপ, মাপ জোক, মূল্যনির্ধারণ ইত্যাদির Record রাখতেন। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, পুকুর খাল, বনভূমি ইত্যাদি সব কিছুই তাঁর নথীভূক্ত থাকত। এই লিখিত নথীগুলি সম্ভবত তৎকালে প্রচলিত, তালপত্রে লিখিত হত। কিন্তু যেহেতু সেগুলি তাম্রলিপির মত দীর্ঘস্থায়ী নয় তাই তা থেকে আমরা তৎকালীন কৃষি বিষয়ে অধিক কিছু জানতে পারি না। অবশ্য বাস্তবে অন্তত একটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ পাথরপ্রতিমার জি-প্লটের গোবর্দ্ধনপুরের মৌর্য যুগের প্রত্নুনিদর্শন ঐ ইটগুলির গায়ে ধানের চিটা লেগে থাকায় এ কথা নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে অন্তত মৌর্য যুগেও যে দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় ধানচাষ সহ কৃষি কার্য ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমরা পাচ্ছি। তাম্রলিপি এবং প্রাচীন সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও দিনলিপি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বলতে পারি যে প্রাচীনকালে দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় একটি সুষ্ঠু কৃষি ব্যবস্থা ছিল এবং প্রচুর কৃষি উৎপাদন এ-অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ছিল।

—অহল্যা, শারদ, ২০০২

অর্দ্ধফসিলীভূত গজদন্তসহ বিমল সাহুর সংগ্রহের একাংশ, গোবর্দ্ধনপুর

জয়নগরের দত্তদের রথ (দ্বাদশ মন্দির প্রাঙ্গণে) ত্রয়োদশ রত্নমন্দিরের অনুকরণে

প্রত্নতত্ত্বে সুন্দরবনের জনজীবন ও ধর্মমত

আদি গোষ্ঠী জীবন ঃ

সুন্দরবনের প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে কালিদাস দত্ত থেকে এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-পর্যন্ত কোন পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক উৎখনন কোথাও হয়নি বলে দক্ষিণবঙ্গের পুরাতত্ত্ব পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়নি; যদিও সুন্দরবন তথা দক্ষিণ চব্বিশপরগনা থেকে প্রচুর উন্নত মানের প্রত্ননিদর্শন প্রত্যহই আহরিত হয়ে চলেছে সমস্ত সমৃদ্ধ প্রত্নক্ষেত্র থেকেই। বর্তমান আলোচনায় আমরা এই সব সংগৃহীত প্রত্নবস্তু থেকে এই অঞ্চলের জনপদ, জনজীবন ও বিভিন্ন যুগে তাদের ধর্মমত কি ছিল তা জানার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এই আলোচনা দীর্ঘ হতে বাধ্য। তাই সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেজ আমলের ড্যাম্পায়ার হজেস লাইন নির্ধারিত সুন্দরবন নয়, আলোচনা সেই পর্যন্ত এবং সেই কাল পর্যন্ত বিস্তৃত যখন সুন্দরবনের সীমা অন্ততপক্ষে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্প্রতি বেথুন কলেজ এবং দমদমের ক্লাইভ হাউস সংলগ্ন মাঠে উৎখনন করে সেখানে জনবসতি, মনুষ্য কঙ্কালসহ যেসব পুরানিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে ঐ অঞ্চলের ইতিহাস অন্তত ২২০০ বছর পর্যন্ত প্রাচীন বলে মনে করা হচ্ছে। আর মেট্রো রেলের খাদ থেকে (৩৯ ফুট নীচে) পাওয়া (সুন্দরী) গাছের কাণ্ডগুলির বয়স প্রায় ৬৩৪০ বৎসর। সুন্দরবন অঞ্চলের ভূমির গঠন এখনো চলতে থাকলেও এবং প্রাকৃতিক উথাল পাতাল অবস্থার প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও এখানকার সভ্যতা সামগ্রিকভাবে উত্তরভারতের উন্নত সভ্যতার অংশীদার এবং হয়ত ধারাবাহিকতায় কিছুটা নবীন। কোন কোন ক্ষেত্রে তা বিচ্ছিন্ন হলেও পুরাতন দুটি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলেই মনে করা যায়। প্রাক্ আর্য যুগের অষ্ট্রোদ্রাবিডিয়ান সভ্যতার নিদর্শনগুলি মানবীয়-পুরাতত্ত্বের নিরিখে বিশ্লেষণে পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক - পৌরাণিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান নিদর্শনগুলি থেকে উন্নত সভ্য জনপদের পরিচয় পাই। প্রায় প্রত্যেকটি প্রত্নস্থল থেকেই এই উভয় প্রকার প্রত্নবস্তুর সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করতে পারলে মানব-ইতিহাসের অনেকগুলি পর্যায় আমরা জানতে পারব। নদীতীর ও সমুদ্র মোহনা অঞ্চল যেমন সর্বক্ষেত্রেই জনপদ গঠনের উপযোগী, সুন্দরবনও তার ব্যতিক্রম নয়। সুন্দরবনের পশ্চিমে সরস্বতী-হুগলী, মধ্যে আদিগঙ্গা-পিয়ালী-মাতলা, পূর্বে বিদ্যাধরী-ইছামতী-রায়মঙ্গল নদীর এবং তাদের শাখানদীর অববাহিকা এবং মোহনা অঞ্চলেই আদি জনবসতিগুলি গড়ে উঠেছিল। সুন্দরবনের এই সব জনবসতি ক্রমে উন্নত জনপদে পরিণতি লাভ করেছিল এবং ফলে গ্রাম, নগর, বন্দর, দুর্গ, নৌ-ঘাঁটি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে, গৃহনির্মাণের উপযোগী প্রস্তরখণ্ড, পোড়ামাটির ইষ্টক ইত্যাদি এই অঞ্চলে পাওয়া সহজ নয়—তাই বেশীরভাগ বাসস্থান কাঁচা মাটির তৈরী ছিল। ছাউনি ছিল লতা পাতা, তৃণ খড় ইত্যাদি। কাঠ বাঁশ সহজলভ্য ছিল বলে তা দিয়েও গৃহাদি নির্মাণ চলত। কিন্তু এই সব উপকরণে তৈরী গৃহাদি স্বল্পস্থায়ী হতে বাধ্য। তার উপর আছে ঝড় ঝঞ্ঝা, সাইক্লোন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূ-কম্পন ও ভূ-অবনমন। সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা। দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর, মন্দিরতলা, গোবর্ধনপুর ইত্যাদি স্থানে যে সব প্রস্তরায়ুধ, অস্থিআয়ুধ ইত্যাদি পাওয়া গেছে তাতে এ অঞ্চলে মানুষের উপস্থিতি যে কমপক্ষে ক্ষুদ্রাশ্মীয় বা নবাশ্মীয় যুগে তা বলা চলে। খৃষ্টপূর্ব দুহাজার শতাব্দীর মাঝামাঝি বা এক হাজার শতাব্দীর প্রথম দিকের নানা

নিদর্শন তো রয়েছেই। তবে আমাদের ধারণা খাদ্যের প্রয়োজনে নব্যাশ্মীয়যুগের বা তার আগের মানুষের উপস্থিতি ছিল সাময়িক। ঝড় বৃষ্টির দিনে তারা আবার ফিরে যেত তাদের মূল আবাস-- ভূমে যেখানে ছিল তাদের গুহাগৃহ এবং প্রস্তরায়ুধ নির্মাণযোগ্য উপাদান। গোবর্দ্ধনপুরে প্রাপ্ত জলজ ও স্থলজ প্রাণীর (ভক্ষিত) অর্ধফসিলীভূত (পরিত্যক্ত) অস্থিরাশি আদিম মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে। তৎকালে কি কি জীবজন্তু তাদের খাদ্য তালিকায় ছিল এবং কি কি বন্যজন্তুর সঙ্গে তাদের লড়াই করে বেঁচে থাকতে হত তাও পরিষ্কার ধারণা করা যায়। ছিল বাঘ, বুনো মহিষ, বৃহদাকার হাতি, গণ্ডার, হরিণ, কুমীর, কাঁকড়া, মাছ, শুশুক ইত্যাদি -- যাদের অস্থি নিদর্শনগুলি রয়েছে। দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর, সাগর, গোবর্দ্ধনপুর, উত্তরসুরেন্দ্রগঞ্জ, তিলপী, আটঘরা প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন যুগের জনবসতির চিহ্ন বর্তমান। এই জনবসতির সবচেয়ে প্রাচীন যে গৃহনির্মাণে দগ্ধমৃত্তিকার ইষ্টকের ব্যবহারের চিহ্ন পাই তা মৌর্যযুগের বলে অনুমিত। এখনো জানা যায়নি তার আগে স্থায়ী বাসস্থান ও গৃহাদি নির্মাণের ইটের ব্যবহার এ-অঞ্চলে হয়েছিল কিনা। তবে যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা, উন্নত বাস্তুতন্ত্র, নির্মাণ পদ্ধতি, ভিতসৃষ্টি, মর্টারাদি উপকরণের ব্যবহার করা হয়েছে তা যে দীর্ঘদিন চর্চিত এবং দক্ষ কলাকুশলী দ্বারা নির্মিত তা নিশ্চিত ভাবেই বলা চলে। স্থানীয় প্রভাব এবং পরিস্থিতি সত্ত্বেও এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় নির্মাণ কৌশলের সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। তাই মনে হয় সর্বভারতীয়, বিশেষ করে উত্তর ভারতীয় কারিগরি দক্ষতার সঙ্গে এদের সংযোগ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রিক তথা কৃষি ভিত্তিক বাস্তু ও শিল্প -- কলা একীভূত হয়েছিল।

বিবর্তন ঃ

যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে কৃষির সঙ্গে কবে এদের সখ্যতা ঘটেছিল তা এখনো জানা যায়নি। তবে অনুমান করা যায় যে, তা অন্তত খৃঃ পূঃ দুই তিন হাজার বছরেরও আগে। কলকাতার একস্থানে পরাগরেণু পরীক্ষায় জানা গেছে যে সেখানে ধানচাষ হত এবং মনুষ্য বসতি প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার বছর আগে ছিল। আমরা গোবর্দ্ধনপুরের সমুদ্র-মোহনায় প্রাপ্ত মৌর্যযুগীয় দগ্ধইষ্টকে তৈরী যে গৃহ ভিত্তি বা মন্দিরাদির প্রাচীর দেখেছি সেই ইটে ধান এবং তুষের চিহ্ন দেখা গেছে। কাঁচা মাটি 'পাট-করার' সময় তাকে শক্ত করতে যেমন মাটির সঙ্গে ধানের চিটা ও তুষ মেশানো হত তেমনি ইট তৈরীর পর যে মাটিতে ফেলে তা শুকানো হত, সেখানে ধানের চিটা এবং তুষ ছড়িয়ে দেওয়া হত, সেগুলি কাঁচা অবস্থায় ইটের সঙ্গে লেগে থাকত এবং পোড়ানোর পরেও তার চিহ্ন এখনো দেখা যাচ্ছে। মনে রাখা দরকার যে, সুদূর অতীতেও সুন্দরবনের নদী খাড়ি, জলাভূমি এবং কৃষি ও বসতি অঞ্চল পাশাপাশি ছিল। কৃষির প্রয়োজনে জঙ্গল কেটে বা বাঁধ দিয়ে জলাভূমিতে চাষ করা হত। অপরদিকে বাসগৃহ অপেক্ষা ধর্মস্থান বা মন্দিরাদি গড়ার ব্যাপারেই কেবল ইটের কথা চিন্তা করা হত। অবশ্য ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যও পোড়া ইটের ঘর বাড়ী করা হত। দেবগৃহ তৈরীতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রাজা বা সামন্তপতিরা উদ্যোগী হতেন। ফলে প্রচুর অর্থব্যয় ও শ্রমের যোগান সম্ভব হত। আটঘরা, সাগর, হরিনারায়ণপুর ও তিলপীতে একই সময়কার সভ্যতার চিহ্ন বর্তমান।

গোষ্ঠীজীবন থেকেই আদিম মানুষেরা বিশেষত নারীরা রূপচর্চায় বহুতর জিনিষের ব্যবহার করত। গলায় মালা বা হার, খোঁপায় ও মাথায়, কর্ণে, বাহুতে, কোমরে; পায়ে নানা অলংকার

ভূষিত করত। গাছের পাতা, লতা, ফুল, ফল, পাথরের দানা, পোড়ামাটির পুঁথিদানা দিয়ে নিজেদের অঙ্গসজ্জা করত। আজকের দিনেও লক্ষ করা যায় যে, আন্দামান নিকোবরে আদিবাসিদের মধ্যে এইরূপ অঙ্গ সজ্জা একই প্রাচীন প্রথায় চলে।

আর্যপূর্ব ধর্মীয় প্রবণতা গোষ্ঠীজীবন থেকেই চলে এসেছে। কোম প্রতীক পূজা, প্রস্তর, বৃক্ষলতা, পশু, পক্ষী, জীবজন্তু, পূর্ব পুরুষ পূজা, লিঙ্গ পূজা সবই তারা ধারাবাহিকভাবে করে এসেছে। তাছাড়া কালের বিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে – যেমন কুম্ভ পূজা, ঘট পূজা – এগুলি নারীত্বের তথা মাতৃত্বের পূজা বা গর্ভিণী পূজা; পশু পক্ষী জীবজন্তু পূজা অথবা আর্যযুগে বাহন হিসাবে জীবজন্তুর পূজা ইত্যাদিও প্রচলিত ছিল। জু-মর্ফিক মূর্তির পরও মানুষ দেহে পক্ষীমুণ্ড, পশুমুণ্ড, ছাগমুণ্ড (পৌরাণিক দক্ষরাজ), নরসিংহ, বরাহ, কূর্ম, মৎস্য, গজমুণ্ড গণেশ ইত্যাদি থোরিওমর্ফিক মূর্তিগুলি আদিম গোষ্ঠী চিন্তার উপকরণ এবং তার পরিবর্তিত অবশেষ। মুণ্ডপূজা, বারাপূজা এক আদিম চিন্তাসম্ভূত। কোন কোন ক্ষেত্রে জাদুমন্ত্র বা ভূতপ্রেত পূজা আদিম বিশ্বাস ও সংস্কৃতির নামান্তর। লিঙ্গপূজা, যোনিপূজা, তান্ত্রিক আচরণ ইত্যাদি আদিম গোষ্ঠী জীবন থেকে আগত মানুষের প্রাচীন সংস্কৃতির নানা ধারণার স্পষ্ট নিদর্শন।

একই সঙ্গে অন্য সংস্কৃতি এবং পূজা পার্বণের রীতি প্রচলিত থাকতে দেখি। এই সহাবস্থান আজও আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রবহমান রয়েছে। গোষ্ঠীতন্ত্রের সঙ্গে সেই অন্য রীতিও মিশে গিয়েছিল এবং তা আজও পাশাপাশি চলছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত এখান থেকেই। যদিও সুপ্রাচীন অতীতে এদের সহজ সহাবস্থান ছিল বলে মনে করা হয়। অবশ্য একথাও ঠিক যে, কোন কোন ক্ষেত্রে চোরা স্রোতের মত সংঘাতও এসেছে অনিবার্যভাবেই। সেকথায় না গিয়ে আমরা আলোচনা করে দেখতে পারি যে, কেমন করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের মূল ধর্মচেতনা অর্থাৎ পঞ্চোপাসনা দক্ষিণ চব্বিশপরগনা তথা সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাচীন কালের মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং তারা পঞ্চোপাসনার কতগুলি পূজায় অভ্যস্থ ছিল। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। কেননা প্রাক্-আর্যযুগে তৎকালীন ভারতে যে একটি উচ্চাঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল, ছিল কৃষি শিব, শিশ্নদেব পূজা; ছিল উর্ব্বরতার দেবী, নারী বা যোনিপূজা, উর্বতার দেবতা সূর্যপূজা (যার অবশেষে চড়ক পূজা), যক্ষ-যক্ষিণী পূজাতান্ত্রিক দেবদেবী হিসাবে ছিদ্রযুক্ত প্রস্তরখণ্ড পূজা ইত্যাদি। সৃজনশক্তির মূল হিসাবে নারী প্রাধান্য পেলেও তার প্রকৃত উৎস পিতৃপুরুষ (লিঙ্গশক্তি) ঐশ্বরিক প্রতীক, তার স্পষ্ট ধারণা তাদের মধ্যে প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল।

এই ধারণার রূপগুলি সুন্দরবনাঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৃন্ময় মাতৃকা মূর্তিগুলি, যৌন আবেদনশীল নারীমূর্তি, মিথুন মূর্তি এবং লিঙ্গ মূর্তিগুলিতে প্রতিভাত হয়েছে। যুগের ধারাবাহিকতায় সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে বৌদ্ধতান্ত্রিকতাবাদ এবং হিন্দুদের শক্তিআরাধনার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রাক্-আর্য-সংস্কৃতি বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু তন্ত্রসাধনা ইত্যাদির সঙ্গে মিশে গেছে; মূলত তাকে গ্রাস করে ফেলা হয়েছে যাকে বর্তমান যুগে 'Sanskritised' বলা হচ্ছে। মিশ্রিত এই সাধনা এসেছে বারাহিতন্ত্র, পর্ণশবরী, উমামহেশ্বর, ত্রিপুরাসুন্দরী, দীপলক্ষ্মী এবং আরও নানা চক্রাবর্ত তন্ত্রসাধনায়। হিন্দু পঞ্চোপাসনার পর্বে এবং একই সঙ্গে অর্থাৎ সমসাময়িকভাবে বৈদকযুগের পরবর্তী যে সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চা এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল তা হল

জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম। এ-দুটি ধর্ম আচার আচরণে হিন্দু ধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হলেও মূলত হিন্দুধর্মের প্রায় কাছাকাছি থেকে উত্থিত এবং পরবর্তী কালে অনেকটাই হিন্দু ধর্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু ভাগবতীয় ধর্ম পরবর্তী কালে জৈন-বৌদ্ধ ধর্মমত এ অঞ্চলে যথেষ্ট সজীব ছিল। অনুমান করা চলে যে তারা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য সময়মত পেয়ে এসেছিল। বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে হিন্দুদের দেবদেবীর অনেকগুলিই জৈন-বৌদ্ধ দেবদেবী হিসাবে গৃহীত হয়ে পূজিত হয়েছে, হিন্দু রামায়ণ জৈন রামায়ণে রূপান্তরিত হয়েছে। পৌরাণিক ইন্দ্র, গণেশাদি দেবতা জৈন-দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু সরস্বতী, অম্বিকা দেবীও জৈনদেবী। বৌদ্ধ দেব দেবীর ক্ষেত্রেও তাই। অনুরূপভাবে, হিন্দুধর্মও অনেক জৈন ও বৌদ্ধ দেবীকে স্বীকৃতি দিয়ে আত্মসাৎ করেছে। কোন দেবতা কোন্ ধর্ম থেকে গৃহীত এ-নিয়ে বিতর্ক আছে — আমরা এখানে সে প্রসঙ্গ যেতে চাই না। কিন্তু একটা কথা বলতে চাই যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মত ধর্মীয় পর্বে অনেক দেবদেবীর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়েছে — তার মধ্যে কেউ কেউ হয়ত নতুন ধর্মে নতুন অভিধায় ভক্তের প্রাণের টানে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। সর্ব কালেই এ-কথা সত্য।

আমরা পঞ্চোপাসনায় কথায় আসি। পঞ্চোপাসনা এবং এর উপাসকগণ নিয়ে অনেক বিভাগ আছে — অনেক কিছু বলা যায়। সংক্ষেপে এক কথায় বললে এটুকু বলা যায় যে শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও শক্তি উপাসনাকেই মূলত পঞ্চোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শৈব শাখা দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় মিলে অনেগুলি। বৈষ্ণব শাখাও ততোধিক। শক্তিশাখার তো শেষ নেই বলা চলে। সৌর এবং গাণপত্যেও বিশ্লেষণ ধর্মী কিছু বিভাগ আছে। আমরা শুধু বলতে চাই পঞ্চোপাসনার পঞ্চদেবদেবী শাখাই দক্ষিণ চব্বিশপরগনা তথা সুন্দরবনে কোন না কোন সময় শুধু প্রচলিতই ছিল না, এক এক সময় এক একটি প্রবল আকার ধারণ করে স্বমহিমায় বিরাজিত ছিল। এখানে প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্তি, ব্রোঞ্জ মূর্তি, মৃন্ময় মূর্তিগুলি এ-কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

বিষ্ণুমূর্তির কথাই ধরি। ছোট বড় যত মূর্তি সুন্দরবনাঞ্চলে পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী মূর্তিই হল বিষ্ণুমূর্তি। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, সবচেয়ে বেশী বিষ্ণু মূর্তিই চোরাকারবারীদের হাত দিয়ে বিদেশে পাচার হয়ে গেছে।

সর্বভারতীয়ক্ষেত্রে যেমন মূল পঞ্চোপাসনার বাইরে (জৈন ও বৌদ্ধ ছাড়া) অন্যান্য কিছু সম্প্রদায় ছিল, লক্ষ্য কার যায় সুন্দরবনাঞ্চলও তার ব্যতিক্রম নয়। সারা ভারতে ব্রহ্মাপূজক খুবই কম, কিন্তু এক সময় যে ব্রহ্মাপূজা বেশ প্রচলিত ছিল তা রাজস্থানের পুষ্করের প্রাচীন ব্রহ্মাতীর্থই প্রমাণ করে। ব্রহ্মা বা অগ্নি-পূজা এসেছে আদিম মানুষের অগ্নি অবিষ্কারের কাল থেকেই, কারণ অগ্নির দাহিকাশক্তিকে ভয় ও শ্রদ্ধা অগ্নিকে পূজা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল তৎকালীন সমাজকে। আজও সেই ধারাবাহিকতায় পৌষপার্বণের দিনে প্রথম পৌষালি পিঠেটি ব্রহ্মা তথা অগ্নিদেবতাকেই উৎসর্গ করা হয়। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় এখনো এই প্রথাটি প্রচলিত। তাছাড়া সুন্দরবনের বাসন্তির কাছে খুব প্রাচীন কালেই বিরিঞ্চিবাড়ী নামক স্থানে একটি বিরিঞ্চি বা ব্রহ্মা মন্দির ছিল যার ধ্বংসোবশেটি এখনো নদীগর্ভে দেখা যায়। এছাড়া নাগ (মনসা, বাসুকী) পক্ষী (গরুড়, পেচক, হংস), পর্ণশবরী, শীতলা, চণ্ডী, কালী, ত্রিপুরেশ্বরী, যক্ষ যক্ষিণী, কুবের, (মৃন্ময়-গজারোহী মূর্তি) ইত্যাদি অন্যান্য দেবদেবীও তখন পূজিত হত সুন্দরবনে কারণ এসব

মূর্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। এসব মূর্তির বেশীরভাগ পূজক ছিল গ্রামীণ সাধারণ মানুষ যারা আদিম যুগধারা থেকে ক্রমবিবর্তিত হয়ে এসেছে। তাই কোম প্রতীকগুলি এসব পূজায় বড় বেশী প্রকট। শুধু বারাহি (কঙ্কণদীঘির) মূর্তিই পাওয়া গেছে মৃন্ময়ী, প্রস্তর ভাস্কর্য এবং ধাতু (ব্রোঞ্জ) নির্মিত আকারে। বারুইপুর, বিষ্ণুপুর এবং খাড়ি-কাশিনগরের সংগ্রহশালা গুলিতে এগুলি দেখা যাবে। অম্বিকা, যমী, কুবের, যক্ষ-যক্ষিণী, পক্ষীচঞ্চু যুক্তমূর্তি (প্রধানত হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত মৃন্ময় মূর্তি, সাগরে প্রাপ্ত পক্ষীমুণ্ড মানব-মানবী দেহ), ছাগমুণ্ড, সহ নানান মৃন্ময় মূর্তি, বরাহমূর্তি (প্রস্তর-সীতাকুণ্ড) বারুইপুর, ডায়মণ্ডহারবার, খাড়ি, ছত্রভোগ, কাশিনগর, জয়নগর -মজিলপুরের সংগ্রহশালাগুলিতে দেখা যাবে। ছোট বড় ঘটে, মুণ্ডমূর্তি, চুতর্মুখ মুণ্ডমূর্তি, দেবমুণ্ড, দানব মুণ্ড, শ্বদন্ত সহ মুখব্যাদন মুণ্ডমূর্তি ইত্যাদি মন্দিরতলা, সাগর, কঙ্কণদীঘি, ভরতগড়, মহপীঠ ইত্যাদি অঞ্চল থেকে প্রচুর পাওয়া গেছে এবং এগুলি সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপ, কাশিনগর, খাড়ি, জয়নগর-মজিলপুর ও অন্যান্য সংগ্রহশালাগুলিতে আছে। এইসব মুণ্ডমূর্তি এবং থেরিয়োমর্ফিক পূজার মৃন্ময় মূর্তিগুলি খৃষ্টপূর্ব যুগের এবং এগুলি বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

আজও সুন্দরবনের মানুষ ১লা মাঘে কাঁচামাটির সাপ-কুমীর-বাঘ, মুণ্ডবারা ও ঘটে পূজা করে। সূর্য পূজার অবশেষ হিসাবে অগ্রহায়ণ মাসে ইতু বা ঘট পূজা এবং চৈত্রমাসে চড়ক পূজা করে। বাঘ, সাপ ইত্যাদি বাহন - প্রতীক হয়ে পূজিত। বনবিবি (বাঘ), বিশালাক্ষী (বাঘ), মনসা (সাপ, হাঁস), শীতলা (গাধা), গজমুণ্ড গণেশ (ইঁদুর), গঙ্গা (মৎস্য,কামট),ষষ্ঠী (বিড়াল), লক্ষ্মী (ঘট, পেচক) দক্ষিণরায় (বাঘ), কালু রায় (কুমীর), পঞ্চানন্দ (ষাঁড়, গাধা) নারায়ণী (দক্ষিণ রায়ের মাতা — সিংহ), বড়খাঁ গাজী (অশ্ব,বাঘ), মানিকপীর (গরু), শিবদুর্গা (বৃষ), ইত্যাদি দেবদেবী জীবজন্তু বাহন সহ এখনো লৌকিক ধারায় পুজিত হয়ে আসছে। শিলাখণ্ডে এবং কাষ্ঠে এখনো পূজা হয় বিশালাক্ষী দেবীমূর্তি বারুইপুরে, সাগর ও পাথরপ্রতিমায়। মুণ্ডা-হো ইত্যাদি সম্প্রদায় যারা সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে, তাদের মধ্যে আবশ্যিকভাবে বৃক্ষপূজা ও শিলাখণ্ডে পূজা প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ মহেঞ্জোদারো পূর্ব ধ্যানধারণা, পূজা ও ধর্মমত আজও নানা ভাবে এখনকার মানুষের ধর্মীয় আচারে ও লোকসংস্কৃতিতে বহমান রয়েছে। প্রসঙ্গ ত একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই আদি-ভারতীয়দের ধর্মচর্চার সঙ্গে বৈদিক পৌরাণিক ধর্মাদি মিলিত হয়ে যখন নতুনরূপে বৃহত্তর জনসমাজ কর্তৃক চর্চিত ও অনুসৃত হতে থাকে তখন থেকেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চোপাসনা ঃ

পঞ্চোপাসনার সৌর, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব এবং শক্তি আরাধনার আর্য-পৌরাণিক ধারাবাহিকতা যে আজও এখানে রয়েছে একইসঙ্গে, তার নিদর্শনও আমরা পাই। বৌদ্ধ নিদ্দেস গ্রন্থ (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩য়), পতঞ্জলির মহাভাষ্য ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব বহু কাল থেকেই সূর্য, শিব এবং বিষ্ণু পূজার প্রচলন ভারতে ছিল। গণেশ বা গণপতি পূজার ইঙ্গিতও এসময় পাওয়া যায় যদিও খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে এই সম্প্রদায়ের আধিপত্য দেখা যায়। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' অনুয়ায়ী, পাণিনির কথায় শিব লৌকিক দেবতা থেকে এসেছে। আমরা মহেঞ্জোদারোর প্রত্ননিদর্শনগুলি থেকে 'আদি-শিবের' যে রূপ কল্পনা পাই তা থেকে

অনুমান করা যায় যে খৃষ্টপূর্ব দেড় দু-হাজার বছর আগে থেকেই ভারতে এই দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে (পৌরাণিক ?) বৈষ্ণব ধর্ম বা উপাসক বলে যা ছিল তা — হল 'ভাগবত' সম্প্রদায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে বেসনগরের (বিদিশা-মধ্যপ্রদেশ) একটি স্তম্ভের লিপি থেকে জানা যায় যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে গ্রীকদূত হেলিয়োডোর বিদিশায় দূত হিসাব এসেছিলন এবং 'ভাগবতধর্ম' গ্রহণ করেছিলেন। এর বহু পূর্ব থেকেই ভাগবতীয় বিষ্ণুপূজা ভারতে প্রচলিত ছিল। অনেকের মতে ভাগবদ্‌গীতাও খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে লিখিত। বিশেষ করে 'বীরবাদ' এই সময়ের পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। 'চতুর্ব্যূহ' এই সময় থেকে খৃষ্টীয় কয়েক শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে পঞ্চবিষ্ণুর ধারণা এবং পূজা এই সময়কার পূর্বের ঘটনা। আশ্চর্যের কথা যে দক্ষিণ চব্বিশপরগনা তথা সুন্দরবনের সুদূর গোবর্দ্ধনপুরের (পাথর প্রতিমা থানা) সমুদ্রমোহনায় 'পঞ্চবিষ্ণুপূজার বেদীপট্ট' (পোড়ামাটির) পাওয়া গেছে (দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল—কৃষ্ণকালী মণ্ডল, দ্রষ্টব্য)। এখানে পাওয়া পঞ্চবিষ্ণুপট্ট-বেদীটিতে বিষ্ণুর পাঁচটি প্রতীকচিহ্ন বর্তমান। ডান থেকে বাঁদিকে যথাক্রমে যুগ্মপাদপদচিহ্ন (বাসুদেব কৃষ্ণ) , লাঙ্গল বা হাল চিহ্ন (বলরাম বা সংকর্ষণ), গদাচিহ্ন (অনিরুদ্ধ), চক্র (শাম্ব) ও মৎস্য (প্রদ্যুম্ন)। মনে রাখতে হবে যে, এই টেরাকোটা বেদীটি প্রতীক যুগ্মপচিহ্নে পূজিত বিষ্ণু, যেটি মূর্তি পূজার আগেই প্রতীক চিহ্ন রূপে ভক্ত হৃদয়কে মথিত করে পূজিত হত। আর দ্বিতীয়ত পঞ্চবিষ্ণু হল সেই ভাগবতীয় বিষ্ণু বা অবতারবাদের পূর্বেকার 'বীরবাদী ভাগবতীয়দিগের' অর্চিত বিষ্ণু। এই পঞ্চবিষ্ণু ভাগবতীয় সম্প্রদায় সর্বভারতীয়ভাবে খৃঃ পূঃ তৃতীয়/চতুর্থ শতাব্দীর (চতুর্ব্যূহবাদের) বহু আগে প্রচলিত ছিল। তাহলে, এই টেরাকোটা প্রতীকচিহ্ন প্রত্নতাত্ত্বিক জগতকে কি ভাবাবে না যে, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী বা তার আগের ধর্মীয় চেতনা একইসঙ্গে সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিভাবে প্রসারিত হয়েছিল। লক্ষ্যণীয় যে এখানেই মৌর্যযুগীয় বড় সাইজের ইটের তৈরী পাকা গৃহ/মন্দির ভিত্তি রয়েছে। রয়েছে নবাশ্মীয় যুগের প্রস্তরায়ুধ অস্থি ফসিল ইত্যাদি। এখানেই স্ফিংসের মত মিশরীয় শৈল্পিক নিদর্শনের (?) চেহারায় স্লেটপাথরের একটি বিষ্ণুমূর্তি-ফলকও পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগের একেবারে প্রথমদিকের এ-জাতীয় মূর্তির সঙ্গেও এই বিষ্ণুমূর্তি ফলকটির সাদৃশ্য রয়েছে। অপরদিকে টেরোকোটা যুগ্মপদ বেদী পাওয়া গেছে গোসাবার নিকটবর্তী সুন্দরবন থেকে (১ম শতাব্দী) এবং প্রস্তর নির্মিত পদচিহ্ন খাপা, বোড়াল এবং মন্দিরতলার চকফুলডুবি থেকে। সপ্তম শতকের বিষ্ণুমূর্তি (প্রস্তর) ফলক পাওয়া গেছে পাকুড়তলা এবং অন্য কয়েকটি সমৃদ্ধ প্রত্নক্ষেত্র থেকে। সাগর (ধবলাট), বোড়াল, বেহালা প্রভৃতি অঞ্চলের বিষ্ণুমূর্তিগুলি গুপ্তযুগের বলে অনুমিত। আবার সাগর, ধবলাট (অপর ১টি বিষ্ণুমূর্তি), আটঘরা (বেশ কয়েকটি), সীতাকুণ্ড, বিশালাক্ষী মন্দির বারুইপুরে, রামনগর, সোনারপুর, উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ (বেশ কয়েকটি), পাথরপ্রতিমা, বোড়াল, জয়নগর মজিলপুর (উত্তরপাড়া, সুবেদালীর পুকুরে প্রাপ্ত —এবং অন্যান্য অনেকগুলি), নলগোড়া, মাধবপুর, খাড়ি, কুলপী (থানা অফিসের সামনে), বহড়ু, কাঁটাবেনিয়া-করঞ্জলি (বেশ কয়েকটি), কাকদ্বীপ — অশ্বত্থতলা, মহাদেবতলা, পাকুড়তলা, পুকুরবেড়িয়া, নৃসিংহ আশ্রম (বিরল সবুজ পাথরের), অগুরালি, গজমুড়ি, বাইশহাটা ঘোষের চক অঞ্চল (কয়েকটি), মন্দিরতলা, নিহাটা কল্যাণপুর (বারুইপুর), বিদ্যাধরপুর (বারুইপুর), কাজিরভাঙা —সরবেড়িয়া, জলঘাটা, রায়দীঘি,

ছত্রভোগ, খাড়ি, ভরতগড়, বিরিঞ্চিবাড়ি অঞ্চলে, কঙ্কণদীঘি ইত্যাদি অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রস্তর খোদিত অজস্র বিষ্ণুমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ, পাদপীঠ, বিষ্ণু মন্দিরের দীর্ঘ স্তম্ভাদি, বিষ্ণুচক্র ইত্যাদি থেকে মনে হয় যে ভাগবতীয়-বিষ্ণুর উপাসকগণ (অর্থাৎ ঐ সম্প্রদায়ের বিষ্ণু উপাসকগণ) এ অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঐ বিষ্ণু উপাসকগণের প্রভাব শুধু এক বা একাধিক যুগে ছিল তাই নয় – তা পাল-সেন আমল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ দেবতা হিসাবেও বিষ্ণু পূজিত হয়ে আসছেন। তাদের মূর্তিগত সাদৃশ্যও রয়েছে। ভাঙড়ে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রী মূর্তি এবং অন্যত্র প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি অজস্র বৌদ্ধ জৈন মূর্তি এই সব উদাহরণ।

শেষের দিকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি পাল-সেন যুগের হতে পারে, কেননা যে মূর্তি ভাস্কর্যগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি পাল-সেন যুগের মূর্তিগুলির শিল্পশৈলীর সঙ্গে অনেকাংশেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আগেই গুপ্তযুগের মূর্তিগুলির কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য বিষ্ণুমূর্তিগুলির মধ্যে বিভিন্ন ভাগবতীয় সম্প্রদায়ের উপাসিত মূর্তি রয়েছে। অর্থাৎ বিষ্ণু উপাসকগণের যে সম্প্রদায়গত পরিচয় রয়েছে তার লক্ষণও দেখা যায়। ধর্মমতগত পার্থক্য ছাড়া যে আচারগত পার্থক্যও ছিল তাও পরিস্ফুট। গুপ্ত থেকে পাল-সেন যুগ পর্যন্ত সময়ের অনেকগুলি বিষ্ণুর বরাহমূর্তি, নরসিংহমূর্তি ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রত্নস্থলগুলিতে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত votive ও পূজাউপকরণ এবং Pottery থেকেও তার অনেক কিছুই বোঝা যায়।

প্রাচীনতম পঞ্চোপাসনায় যেমন সূর্য পূজা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, সুন্দরবনও তার ব্যতিক্রম নয়। সূর্যের লৌকিক অবশেষ যে 'ইতু' (মিত্র) পূজায় এসে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আজও প্রচলিত তা সর্বজনবিদিত। চড়কপূজা এবং চক্রপূজা (বিষ্ণুপূজাও) সূর্যপূজার অবশেষ হিসাবে আজও সুন্দরবনের মানুষ আচার অনুষ্ঠানসহ পালন করে চলেছে।

এ অঞ্চলের প্রত্ননিদর্শনগুলির মধ্যে পোড়ামাটির মূর্তি বিভিন্ন পূজায় উপাচার হিসাবে দেওয়া হয় – চড়কে, শিবের গাজনে এবং অন্যান্য পূজায় এগুলি দেওয়া হয়। অতীতের সূর্যপূজায় এই জাতীয় প্রতীক মূর্তি প্রদান করা হত বলে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তো বটেই, তাঁরা ছাড়া লোকায়ত জনের অনেকেই সূর্যোদয়ের আগে (কেউ কেউ স্নানের সময়) পূর্বমুখী হয়ে স্বগৃহে বা উন্মুক্ত স্থানে বসে একঘন্টা থেকে দশ মিনিট পর্যন্ত সূর্যপ্রণাম করেন ও সূর্য ওঠার জন্য অপেক্ষা করেন। এটি সূর্যোপাসনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চৈত্রমাসে গাজন উৎসবের সময় সুন্দরবনের বোলসিদ্ধিগ্রামে বাণফোঁড়া উৎসবের দিনে (২৭ বা ২৮শে চৈত্র) মূল বাণফোঁড় (বাণফোঁড় সহ অগ্নি প্রজ্জ্বলন) উৎসবের আগে, (নিম্ন শ্রেণীর) আচার্য কর্তৃক পরিচালিত মূল-সন্ন্যাসীসহ অন্যসব গাজন সন্ন্যাসীকে সূর্যপ্রণামে অংশগ্রহণ করতে হয়। এরকম আরও অনেক সূর্যপূজার অবশেষ এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আজও প্রচলিত রয়েছে। বৈদিক সূর্য উপাসক গোষ্ঠীর কোন কোন শাখাও যে এ-অঞ্চলে প্রাচীন-ঐতিহাসিক যুগে ছিল, হয়ত বা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাও সেখানে ছিল, তার কিছু প্রত্ননিদর্শন এ-অঞ্চলে পাওয়া যায়। জয়নগর থানার সরিষাদহের নিকট কাশিপুরে পাওয়া গেছে সপ্তাশ্ব বাহিত সরাথি অরুণসহ দণ্ডায়মান সূর্যের একটি সুন্দর মূর্তিভাস্কর্য। শিল্পকার্যটি সপ্তম শতাব্দীর (AD) বলে অনুমিত। বর্তমানে এটি আশুতোষ সংগ্রহ শালায় রক্ষিত। মগরাহাট থানার কুলদিয়া থেকে একটি ছোট সূর্য মূর্তি ও নৃসিংহ মূর্তি পাওয়া গেছে। পাটেশ্বরী মন্দিরে একটি এবং গোসাবায় (রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত) সূর্যমূর্তি

পাওয়া গেছে। ধবলাটের বিশালাক্ষী মন্দিরে আনুমানিক খৃঃ ৭ম শতাব্দীর একটি ক্ষয়প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে। চকফুলডুবিতে এবং জলঘাটায় খৃঃ ৬ষ্ঠ – ৭ম শতকের প্রস্তর নির্মিত রুদ্রমূর্তি (সূর্য/শিব) পাওয়া গেছে। কঙ্কণদীঘি থেকে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্মিত একটি সূর্যমূর্তি বারুইপুর সংগ্রহশালায় রয়েছে। এ-ছাড়াও এ-অঞ্চলের অনেক স্থলেই সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রত্যক্ষভাবে হয়ত এ-জাতীয় সূর্যমূর্তি আরও কয়েকটি স্থানে পাওয়া গেছে কিন্তু সেটাই সব কথা নয় – কেননা বৈদিক সূর্য কালপ্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে নানা দেবদেবীর মধ্যে। স্বভাবতই সৌর উপাসকগণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদের ধ্যান ধারণাকে খুব বেশী না পাল্টেও অন্য দেবদেবীর পূজাঅর্চনা করেছে। সূর্য - সবিতা, মিত্র, রুদ্র, শিব, বিষ্ণু, আদিত্য, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, দক্ষ, মার্তণ্ড ইত্যাদি নামে সূর্যদেব নানা ধর্মীয় শাখার মানুষ দ্বারা বিভিন্ন সময়ে পূজিত হয়েছে। কিন্তু মূল শাখাটি বিষ্ণু উপাসকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একীভূত হয়ে গেছে। অন্যটি মূলত রুদ্র বা শৈব উপাসকদের একটি শাখার মধ্যে বিলীন হতে চেয়েছে। আর কালক্রমে অন্য দেবদেবীগুলি নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই বৈষ্ণব বা ভাগবতীয়দের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে এবং শৈবদের প্রথাগত কোন শাখার মধ্যে সৌর ধারণা অন্তর্লীন হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে প্রায় অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তি দক্ষিণ চব্বিশপরগনা তথা সুন্দরবন অঞ্চলে পাওয়া গেছে। অপরদিকে লোকদেবতা আদি শিব, কৃষি শিব, নাথ যোগী শিব, লিঙ্গায়েৎ শিব, শক্তিশিব, উমা মহেশ্বর শিব, পশুরাজ শিব, একশত আট শিব বা ত্রি-ষষ্ঠী শিব, দশনামী শিব ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সম্ভবত বিভিন্ন শিব উপাসক ছিলেন সুন্দরবনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে। বস্তুতপক্ষে শিবমন্দির বা শিবস্থানহীন-গ্রাম এ-অঞ্চলে একটিও আছে কিনা সন্দেহ। সে কারণেই মূল সৌর উপাসনা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শৈব উপাসনা ও বিষ্ণু উপাসনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে একথা বলতে পারি। প্রসঙ্গত বলে রাখি প্রাচীন শিবস্থানগুলি হল ঃ বোড়াল, বারুইপুর (কল্যাণ-মাধব, পুরন্দরপুর ,সীতাকুণ্ড ইত্যাদি), বহড়ু, বারাশত, জয়নগর-মজিলপুর, ভাঙড়, সোনারপুর, ক্যানিং, পাথরপ্রতিমা, ফলতা, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, কুলপী, মথুরাপুর, মন্দিরবাজার, খাড়ি (অম্বুলিঙ্গ), জটা, বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর দক্ষিণ প্রভৃতি অঞ্চলে। বুড়োশিব, বোলাসিদ্ধি, আদি-মহেশ, অম্বুলিঙ্গ, কল্যাণমাধব, ভুবনেশ্বর, যোগেশ্বর, অনাদিশ্বর, রুদ্রেশ্বর সিদ্ধেশ্বর, বৈকুণ্ঠেশ্বর, নন্দীকেশ্বর, রামনাথেশ্বর-নারায়ণীশ্বর ইত্যাদি নামে পূজিত হচ্ছেন বিখ্যাত সব প্রাচীন শিবলিঙ্গ। আয়তাকার, চতুর্মুখ, পেনেটসহ, পেনেট ছাড়া একদেবীমুখ লিঙ্গ, চতুঃশক্তি শিবলিঙ্গ, স্টোন রিঙে শিব ইত্যাদি শিবলিঙ্গগুলি নানা সময়ের নানা উপাসক-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব যে এ-অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এই শিবও আবার বাবা ঠাকুর, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, বুড়োশিব (বৃদ্ধ শিব), নুড়ি শিব, ধর্মঠাকুর ইত্যাদি নামে নানাপ্রকার পরিবর্তনের সম্মুখীন। আবার তান্ত্রিক যুগে শিব-শক্তি একীভূত হয়ে উমামহেশ্বর শিব, ঊর্দ্ধলিঙ্গ শিব, আলিঙ্গন লিঙ্গ, বটুক শিব; তারা, কালী, ত্রিপুরাসুন্দরী, বিশালাক্ষী ইত্যাদি এবং তান্ত্রিক দেবীর (মহাযানী ?) পদ্মাপ্রয়ী শিব ইত্যাদিতে বিবর্তিত হয়ে (গুপ্ত আমল থেকে) প্রায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত এ-অঞ্চলে চলে আসছে। একটা কথা এ-অঞ্চলে প্রচলিত আছে যে শিব থাকলেই শক্তি আছে এবং শক্তি থাকলে শিবও থাকবেন। আবার চৈতন্য প্রভাবে কালী ও কৃষ্ণ একীভূত হয়ে কৃষ্ণকালী (মাহিনগর), বুড়োশিব ও মাধবে

একত্রীভূত হয়ে কল্যাণ মাধবে (কল্যাণপুর) রূপান্তরিত হয়েছে।

শক্তি আরাধনাও ভারতে খুব প্রাচীন। গোষ্ঠী জীবনে পূর্বপুরুষ পূজা যেমন প্রাচীন, উর্বরতার এবং সৃষ্টিশীলতার প্রতীক হিসাবে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় পূজা তথা মাতৃকা পূজার প্রচলনও কম প্রাচীন নয়। পৃথিবীর শস্য-উৎপাদনক্ষেত্র এবং সন্তান উৎপাদনক্ষেত্রকে একই বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় দেখার প্রবণতা আজও বিদ্যমান। মহেঞ্জোদারোতে টেরাকোটা সীল ও লিপিগুলিতে পশুপতি শিব যেমন দেবতা, বৃক্ষদেবী, বনদেবী, মাতৃকামূর্তিও তেমনি দেবতা বিশেষ। মহেঞ্জোদারোতে একটি নগ্না নারী মূর্তি উর্দ্ধপাদবিশিষ্টা এবং তার জননেন্দ্রিয় উত্থিত একগুচ্ছ শস্যতৃণকে উৎপাদনশীলতার বা উর্বরতার মূর্ত প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গুপ্তযুগ থেকে এই চিহ্নরূপে হরিনারায়ণপুর, আটঘরা, গোবর্দ্ধনপুরে যোনিপ্রদীপ, ধুনুচি, যন্ত্রমূর্তি ইত্যাদি পাওয়া গেছে যা নারী 'শক্তির' প্রতীক। অন্যদিকে মার্কণ্ডেয় এবং অন্যান্য পুরাণগুলিতে বিষ্ণুর দশঅবতারের মত পরাশক্তির তথা মাতৃকা দেবীরও দশ বা ততোধিক অবতারের কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে মজার কথা মহাযানী বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবী, বিশেষ করে দেবীদের অনেকগুলিই হিন্দুদেবী বা সঠিকভাবে বললে হিন্দুতান্ত্রিকদেবী হিসাবে পূজিতা হচ্ছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত এরূপ প্রত্ননিদর্শন প্রচুর রয়েছে।

জৈন অম্বিকা, সরস্বতী, গণপতি, 'জীন'রূপী অনন্তদেব ইত্যাদী দেবদেবীর প্রভাব এখানে বিদ্যমান। বৌদ্ধতান্ত্রিক নানান দেবদেবী প্রজ্ঞাপারমিতা, জাঙ্গুলি, পর্ণশবরী, বারাহি, যমী, তারা, ত্রিপুরেশ্বরী, মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদির মৃন্ময়, ধাতব বা প্রস্তরমূর্তি এ-অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া গেছে পরিচিত অপরিচিত নানা প্রত্নস্থল থেকে। একইভাবে জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথ, অদিনাথ, নেমিনাথ প্রভৃতি জৈন তীর্থংকরের বেশ কয়েকটি প্রস্তরখোদিত বৃহৎ ভাস্কর্যও সুন্দরবন অঞ্চলে পাওয়া গেছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য একসময় সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলকে প্লাবিত করে ফেলেছিল। জাতক কাহিনীর বেশ কিছু ফলক এ অঞ্চলে পাওয়া গেছে। স্বভাবতই জৈন বৌদ্ধ শক্তিগুলিও একসময়ে তাদের শক্তি প্রদর্শনে কার্পণ্য করেনি। ছোট ছোট নানা ধরণের জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু মৃন্ময় মাতৃকা মূর্তিগুলি যে এই সব শক্তি আরাধনায় 'ভোটিভ' হিসাবে প্রদত্ত হত বা গৃহ পূজায় ব্যবহৃত হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাগরের মন্দিরতলা, সাপখালি, চকফুলডুবি, হরিনারায়ণপুর, আটঘরা-সীতাকুণ্ড, গোবর্দ্ধনপুরে ত্রিচূড় মাতৃকামূর্তি, শিশুক্রোড়ে অজস্র মাতৃকামূর্তি মাতৃকা পূজার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। এই সব মাতৃকাদেবীগুলির বেশ কিছু আছে গদা ও অস্ত্র হস্তে। এরা শক্তিদেবী তথা warrior Goddess। শক্তিচর্চার প্রারম্ভিক কালে লৌকিক বিশ্বাসের প্রাধান্য থাকলেও জৈন বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্মের প্রবলতার সময়ে এবং ক্রমাগত Sanskritised হওয়ার ফলে এখন অনেক দেবীই আর শুধুমাত্র লৌকিক নেই, তারা সর্বজনীন হয়ে গেছে। চণ্ডী, তারা, কালী, ত্রিপুরেশ্বরী, বিশালাক্ষী, মনসা, গঙ্গা, লক্ষ্মী, শীতলা, বারাহি, পর্ণশবরী ইত্যাদি দেবীর প্রাপ্ত মৃন্ময়, ধাতব অথবা প্রস্তর মূর্তিগুলি এ-অঞ্চলে পূজিত ঐ শক্তিদেবী। তাদের আধার-দেবগণও সঙ্গে রয়েছে। হরিনারায়ণপুর, সাগর, পাথরপ্রতিমা, করঞ্জলি, ঘাটেশ্বরা, বোড়াল, বারুইপুর, জয়নগর-মজিলপুর, বারাশত, কাশিপুর, বাইশহাটা, খাড়ি-ছত্রভোগ এবং সমগ্র রায়দীঘি, কঙ্কণদীঘি ও জটারদেউল অঞ্চল — একদিকে যেমন মহাযানী তান্ত্রিক সাধনার পীঠস্থান তেমনি বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের একনিষ্ঠ চর্চাস্থল

ছিল বলে প্রত্ন নিদর্শনগুলি থেকে অনুমান করা যায়।

গোবর্দ্ধনপুরের মাতৃকামূর্তি, চকফুলডুবির একইরকম দেবীমূর্তি এবং হরিনারায়ণপুরের মাতৃকামূর্তিগুলি খৃঃপূঃ দ্বিতীয়–তৃতীয় শতকের পূর্বকালের মূর্তি বলে অনুমান। অপর দিকে তিলপীর পঞ্চচূড় এবং দশচূড় যক্ষিণী ও দেবীমূর্তিগুলি চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া মূর্তিগুলির মত শিল্পসৌন্দর্যে ভরপুর এবং তার আনুষঙ্গিক প্রত্ন নিদর্শনগুলি শুঙ্গ-কুষাণ যুগ থেকে মৌর্য ও মৌর্যপূর্ব যুগের বলে মনে করা যায়। আধুনিককালে বনবিবি, বিবিমা, নারায়ণী, বনচণ্ডী, ষষ্ঠী, বনদুর্গা, প্রভৃতিকে মধ্যযুগের শেষ সময়ের শক্তিদেবী বা অনুরূপ বলে মনে করা হয়। বড়খাঁগাজী, তাতালগাজী, বামনগাজী, মোবারকগাজী, দক্ষিণরায়, মানিকপীর, পীরভাণ্ডশা ইত্যাদি মধ্যযুগের গাজীপীর ও দেবতা হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের পূজিত দেবতা – এঁরা হয়তবা কোন কোন শক্তিদেবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এঁরাও এই সময়কার।

একইভাবে দেখি গণেশ বা গণপতি-পূজকদেরও প্রাধান্য রয়েছে এই অঞ্চলে। নিদেসগ্রন্থে যদিও গণেশ পূজকদের সম্বন্ধে তেমন কোন কথা বলা নেই তবে কিছু ইঙ্গিত আছে। মোটামুটি গুপ্তযুগ থেকেই গণেশ পূজার প্রাবল্য দেখা যায়। গণপতি গণেশ, বিঘ্ননাশক, বিনায়ক ইত্যাদি বহুতর নামে গণেশ পূজিত। তবে গজমুণ্ডে এই থেরিয়োমর্ফিক অন্-আর্য লৌকিকদেবতা শিব, যক্ষ, নাগ এবং অন্য কয়েকটি দেবতার মিশ্রণে ও অনুকরণে পরিকল্পিত। গণদিগের পতি হিসাবে ধরলে গণপতি ধারণা বৃষ্ণিযুগের সময় থেকেই বলতে হয়। মূলত ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য জৈন বৌদ্ধ ব্যবসায়ীরাও গণেশ পূজা করে থাকে। সাগর, পাথরপ্রতিমা, কঙ্কণদীঘি রায়দীঘি, মণিরতট, নালুয়া, খাড়ি ছত্রভোগ, কাঁঠালতলা ও বারুইপুর, বোড়াল অঞ্চলে নানাপ্রকার গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে। দাঁড়ানো, বসা এবং নৃত্যরত গণেশই প্রধান। পাথরপ্রতিমায় যে সব গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত বেশ বড় আকৃতির নৃত্যরত বিরল প্রকৃতির অষ্টভুজ গণেশের প্রস্তর মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে মণিরতটে পাওয়া অনেকগুলি গণেশ মূর্তির মধ্যে চতুর্মুখ গণেশ মূর্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আটঘরা, নামাজগড়, জাঙ্গুলিয়া, পাকুড়তলা (৭ম-৮ম শতক), সরিষাদহ, ময়দা (নৃত্যরত, কালো পাথরের তৈরী – ছয় হস্ত বিশিষ্ট, পালযুগ), চাঁপাতলা (মন্দিরতলা), চক ফুলডুবি ইত্যাদি অঞ্চলে বহু গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে। হরপার্বতীর ক্রোড়ে গণেশ – এরূপ ধাতব মূর্তি নলগড়া থেকে পাওয়া গেছে। দুই ইঞ্চি লম্বা শক্ত সীসায় তৈরী একটি গণেশমূর্তি চাঁপাতলা থেকে পাওয়া গেছে। চক ফুলডুবিতে মৃন্ময় গণেশ অবিষ্কৃত হয়েছে। অন্যান্য স্থানেও গণেশমূর্তি পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে উমামহেশ্বরের কয়েকটি উত্তম মূর্তি ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়েছে সাগর, রায়দীগি, বাইশহাটা ইত্যাদি স্থান থেকে। পাওয়া গেছে গজলক্ষ্মীও।

মূর্তি ছাড়াও সুন্দরবন অঞ্চলে ধর্মীয় ভাবনাযুক্ত পাঞ্চমার্ক কয়েন এবং অন্যান্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। টেরাকোটা প্রাক্‌বঙ্গলিপি যুক্ত সীল ও ফলক পাওয়া গেছে পাকুড়তলা, কঙ্কণদীঘি, পুকুরবেড়িয়া, তিলপী ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। যে পাঁচটি তাম্রলিপি (লক্ষ্মণ সেনের দুটি, জয়ন্তচন্দ্র জটাবিষয়ক ১টি, ডোম্মনপাল এবং জয়নাগের একটি করে) এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে সেগুলি থেকেও এ-অঞ্চলের জনপদ, জনজীবন এবং ধর্মীয় প্রভাবের কথা জানতে পারি। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু লক্ষ্মণসেনের রাজকীয় ধর্ম ছিল বৈষ্ণবধর্ম। ডোম্মনপাল ছিলেন শৈব। কিন্তু

তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইতিপূর্বে বৈদিক ধর্ম এ-অঞ্চলে প্রায় অবলুপ্ত হ'তে চলেছিল; তাই বৈদিক বিভিন্ন শাখার ব্রাহ্মণকে বিভিন্ন রাজকীয় অজুহাতে বাস্তুভিটা, আর্থিক সুবিধাযুক্ত জমি, বাগান, পুকুর, ফলগাছসহ উদ্যান ইত্যাদি দিয়ে বসবাস করবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। দেবদ্বিজে রাজাদের খুবই ভক্তি ছিল। ডোম্মন পালের রাক্ষসখালি তাম্রশাসনটি থেকে জানা যায় যে প্রদত্ত গ্রামটির বাহিরেই ছিল একটি বৌদ্ধমঠ অর্থাৎ একই সময়ে শৈব, বৈষ্ণব এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন রয়েছে সুন্দরবনের এই অঞ্চলে — ঐ দশম একাদশ-দ্বাদশ শতকে। নৃত্যরত অষ্টভুজ গণেশ মূর্তিটিও প্রমাণ করে যে সমকালে গাণপত্য ধর্মেরও প্রভাব বিদ্যমান ছিল। পাথরপ্রতিমার ক্ষেত্রানুসন্ধানে দেখা যায় যে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য এবং অন্যান্য লৌকিক ধর্মমত জনগণ মেনে চলত। কঙ্কণদীঘি, খাড়ি-ছত্রভোগ, বাইশহাটায় জৈন-বৌদ্ধসহ বৈষ্ণব এবং মহাযানী শক্তি পূজকগণ অবস্থান করতো। কঙ্কণদীঘি, কাকদ্বীপ, সাগর, হরিনারায়ণপুর অঞ্চলে অন্যান্য পূজকগণের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার প্রাচীন মুণ্ড-পূজকগণের বহুল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলে জানুস দেবতার দুইদিকে মুখ বিশিষ্ট প্রাগৈতিহাসিক কালের মৃন্ময় মুণ্ডমূর্তি পাওয়া গেছে। এর আগেও আরও একটি অনুরূপ জানুসমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। এই জানুস মূর্তি দুটি প্রাপ্তিতে এ-অঞ্চলে কোন বৈদিশিক ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রভাব আছে কিনা তাও অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা বীরবাদী ও ভাগবতীয় বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও মূল ভাগবতীয় বৈষ্ণব (চৈতন্য বৈষ্ণব নয়) এ-অঞ্চলে পরবর্তীকালে ছিল খুবই কম। সম্ভবত রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই সব বিষ্ণুমন্দির ও বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হত। কিন্তু জনগণের বেশীরভাগই ছিল জৈন-বৌদ্ধ-ধর্মপুষ্ট এবং শৈব ধর্মে ও তান্ত্রিকতাবাদে বিশ্বাসী। সেজন্যই লৌকিক শিব এবং শক্তি আরাধনার প্রতি এ অঞ্চলের জনগণ প্রাচীন কাল থেকেই বেশী অনুরাগী। মুদ্রা এবং প্রাকবঙ্গলিপি যুক্ত সীল গুলি থেকেও বৌদ্ধধর্ম প্রীতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত সেকারণেই ভাগবতীয় বৈষ্ণব সমাজের অবলুপ্তি ঘটেছিল। অনুরূপভাবে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে জৈন-বৌদ্ধধর্ম মর্দিত হয়েছিল। শেষ মধ্যযুগে আবার নানান লোকায়তধর্ম ও পীরগাজী বিবির প্রাধান্য দেখা যায়।

বস্তুতপক্ষে, সুপ্রাচীন কাল থেকে সুন্দরবন অঞ্চল ধর্মীয় সমন্বয়ের ও সহনশীলতার পরিবেশ তৈরী করে এসেছে। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শনগুলি থেকে সহজেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায়।

— ০ —

– নিরগাঙ্গের সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র - ২০০২

দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন সমূহ

দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় প্রাপ্ত পাঁচটি তাম্রলিপির কথা জানা যায়। এর মধ্যে গোবিন্দপুরে পাওয়া (১৯১৯ খৃঃ) ও বকুলতলায় (১৮৬৮ খৃঃ) পাওয়া তাম্রলিপি দুটি মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের এবং রাক্ষসখালিতে পাওয়া তাম্রলিপিটি মহারাজ ডোম্মনপালের। আর চতুর্থটি মহারাজা জয়ন্তচন্দ্রের (১৮৭৫ খৃঃ পাওয়া) তাম্রলিপি। এটি জটার দেউলের নিকট পাওয়া যায়। জয়নাগের একটি তাম্রলিপি মলয় নামক স্থান থেকে পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। মলয় পাথর-প্রতিমা থানায়।

(১)

মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেবের গোবিন্দপুর তাম্রশাসন

লক্ষ্মণসেনের তাম্রলিপিটি সম্বন্ধে ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় লিখেছেন (১৯২৮ সালের ডিসেম্বর) এই তাম্রশাসনটি ১৯১৯ খ্রীঃ (হেঁদো নামে) একটি পুকুর কাটার সময় দঃপূঃ রেলের ডায়মণ্ডহারবার শাখর বারুইপুর রেল-স্টেশনের কাছে দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আবিস্কৃত হয়েছিল (থানা সোনারপুর)। এটি আবিস্কৃত হবার পরই এটিকে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নিকট পাঠান হয়। তিনি এটিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় প্রদর্শন করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এটি তাঁর 'বাংলার ইতিহাস' (২য় সং) ৩২৭-৩৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন। বাংলা ১৩৩২ সালের ভারতবর্ষে এটি বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে (পৃঃ ৪৪১-৪৪৫)। পরবর্তীকালে এটি তাঁর রচনাবলীর ৪র্থ খণ্ডে পৃঃ ৩১৩ থেকে ৩২১ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উভয় দিকে লেখা তাম্রলিপিটির আয়তন ১৩.৫ ইঞ্চি X ১২.৫ ইঞ্চি। উপরদিকে সেন রাজবংশের প্রতীক চিহ্ন সেনরাজগণ পূজিত দশভুজ "সদাশিব" মূর্তি দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। ভাষা সংস্কৃত, দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত তৎকালীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত। মূল তাম্রলিপির পাঠ মোটামুটি এইরকম ঃ

'ওঁ ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে কুলদেবতা "সদাশিবকে" প্রণাম জানিয়ে এই তাম্রলিপির আরম্ভ। এরপর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রশস্তি। অতঃপর সেনবংশের রাজাদের — বিজয়সেন, বল্লালসেন প্রভৃতিকে পৃথিবীপতি হিসাবে শৌর্য-বীর্য, খ্যাতি, বেদ ও দেব-দ্বিজে ভক্তির কথা বলে, নানা গৌরবগাথার উল্লেখসহ তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অরিরাজ এবং অরি-দমনকারী হিসাবে চিহ্নিত করে মহারাজ লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত অতীব সুন্দর আলংকারিক প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ পূর্বক বংশ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেবের সদ্‌গুণাবলী, ধর্মাশ্রয়তা, অরি-দমনে তাঁর অসীম শক্তিমত্তা, রাজাধিরাজ হিসাবে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতি এবং অনন্যসাধারণ রাজকীয় গুণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ সহ সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেন-রাজ্যের রাজধানী ও সেনানিবাস ছিল বিক্রমপুর এবং সেখান থেকেই পরম বৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ বল্লালসেন-পদানুধ্যাত পরমেশ্বর, নরেশ্বর মহারাজাধিরাজ মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেব সুস্থ শরীরে, উপস্থিত রাজন্যবর্গ, সামন্ত-প্রধান, রাজ্ঞী, রাজপুত্র, মন্ত্রীবর্গ, মহাপুরোহিত, মহাকর্মাধ্যক্ষ, মহাসন্ধি-বিগ্রাহিক, মহাসেনাপতি, মহাকোষাধিপতি, মহাবিচারক প্রভৃতি রাজপুরুষগণের সমক্ষে তাঁর রাজ্যাভিষেকের দ্বিতীয় সংবর্তে সর্বপ্রকার নিয়মনীতি অনুযায়ী এই ভূমিদান-তাম্রপত্র প্রদান

করেছেন (পাঠান্তরে ৩য় বর্ষে)।

লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে মূল বিষয়টির হল ঃ বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিম খাটিকায় বেতড্ড-চতুরকে বিড্ডারশাসন গ্রামটি অবস্থিত। দানকৃত ভূমির পরিমাণ ষাট ভূ-দ্রোণ এবং সতের উন্মান (প্রচলিতসমতটীয় নল মাপ অনুসারে যার পরিমাণ ছাপান্ন হস্ত – Cubits) মাত্র। ইহার বাৎসরিক আয় প্রতিদ্রোণে ১৫ পুরাণ হিসাবে নয়শত পুরাণ। প্রদত্ত গ্রামটির পূর্বে জাহ্নবীর (গঙ্গার) অর্দ্ধসীমা, দক্ষিণে লেঙ্ঘদেব-মন্দির সীমা, পশ্চিমে দাড়িম্বফলের উদ্যান এবং উত্তরে ধর্মনগর গ্রাম। এই সীমানাবিশিষ্ট গ্রামটি বৃক্ষ-অরণ্য-জলজঙ্গল-খানাখন্দ সহ, সুপারী-নারিকেল বৃক্ষ-শোভিত, জলপূর্ণ-পুষ্করিণীসহ উর্বর-অনুর্বর ভূমিতে পরিপূর্ণ। দশপ্রকার দুষ্কর্মের জন্য ধার্য জরিমানা লব্ধ আয়ও এর অন্তর্ভুক্ত। সর্বপ্রকার উৎপীড়নহীন, চট্ট-ভট্ট জাতীয় (ব্রাহ্মণগণের) অনুপ্রবেশরহিত, গোচরণভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত তৃণ-পুষ্পাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণভূখণ্ডটি বাৎস্য গোত্র, বাৎস্যআপ্লুবান, (ঔর্বজামদগ্ন) বজামদগ্ন্যপ্রবর এবং সামবেদের কৌথুম শাখানুসারী গোস্বামী দেবশর্মণের প্রপৌত্র, হলদেবশর্মণের পৌত্র, শ্রীনিবাস দেবশর্মণের পুত্র গুরুদেব উপাধ্যায় শ্রীব্যাসদেব শর্মণকে নিজের এবং পিতামাতার যশ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য গঙ্গাজল স্পর্শ করে দেবতা নারায়ণকে স্মরণ পূর্বক ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুসারে যতদিন পৃথিবীতে সূর্য ও চন্দ্র থাকবে ততদিন পর্যন্ত, তাঁর রাজ্যাভিষেককালের এই পুণ্যদিনে প্রদত্ত উক্ত ভূমিদান অত্র তাম্রশাসন দ্বারা বিধিবদ্ধ করা হল। উপস্থিত সকলে অনুমতি ও সম্মতি প্রদান করুন।

রাজ্যশাসনকালের দ্বিতীয় বৎসরে পরম সমৃদ্ধিশালী রাজা লক্ষ্মণসেন এই দান ঘোষণার জন্য যুদ্ধ ও শান্তি রক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নারায়ণ দত্তকে তাঁর দূত হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। মাঘের অমাতিতে ভূমিদানকরণ ও ভূমিদানগ্রহণ উভয়কেই পুণ্যকর্ম হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে স্বদানকৃত (ভূমি) হরণ করলে পিতৃপুরুষ সহ বিষ্ঠার কৃমি কীট হিসাবে পচতে হয়।

(২)
বকুলতলা তাম্রশাসন

বাংলার সেনরাজ বংশের পঞ্চম পুরুষ অরিরাজ মদনশঙ্কর লক্ষ্মণসেন (আঃ ১১৭৯-১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ) দেব তাঁর রাজ্যাভিষেকের দ্বিতীয় বর্ষের একটি তাম্রশাসন দ্বারা পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত খাড়িমণ্ডলের কান্তাল্লপুর চতুরকে 'মণ্ডলগ্রামে' বাস্তু সহ মোট তিন ভূ-দ্রোণ এক খাদিকা ২৩ উন্মান আড়াই কাকিনী পরিমাণ একখণ্ড ভূমি, নরসিংহ ধরদেব শর্মণের পুত্র গর্গগোত্রীয়, অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, উশান, গর্গ এবং ভরদ্বাজ প্রবর ঋগ্বেদের অশ্বালয়ন শাখা অধ্যয়নকারী শ্রীকৃষ্ণধরদেব শর্মণকে দান করেছিলেন।

তাম্রশাসনটিতে দানকৃত এই সম্পত্তির যে চৌহদ্দি দেওয়া হয়েছে তাতে এই ভূমির পূর্বদিকে শান্ত্যাগারিক প্রভাস এর ভূমিসীমা (The land granted to Prabhasa, the Priest-incharge of the room where propitiatory rites are performed); দক্ষিণে চিতাড়ী খাতের অর্ধসীমা; পশ্চিমে শান্ত্যাগারিক 'রামদেব' শাসনের পূর্বপার্শ্ব সীমা; উত্তরে শান্ত্যাগারিক বিষ্ণুপানি গড়োলি ও কেশব গড়োলি (গহড়বাল?) দের ভূমিসীমা।

মজিলপুরের জমিদার হরিদাসদত্ত ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার (রায়দীঘি থানার) সুন্দরবন অঞ্চলের বকুলতলা গ্রামে (কাশীনগরের দক্ষিণে) একটি পুষ্করিণী খনন করানোর সময় এই তাম্রশাসনটি ১৮৬৮ সালের কোন এক সময়ে পেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই এটি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

সুন্দরবনের বকুলতলা নামক প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাম্রলিপিটি পাওয়া গিয়েছিল বলে এটি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বকুলতলা তাম্রলিপি বা সুন্দরবন তাম্রলিপি বলে চিহ্নিত হয়ে আসছে। হুগলীর ইলছোবা গ্রামের পণ্ডিত হলধর চূড়ামণি (পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের পিতা) এই তাম্র শাসনটির পাঠোদ্ধার করেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন "বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে (২য় ভাগ) পৃঃ ৩৭১"–এ এই বিষয়ে পরিচিতি দিয়েছেন। ননীগোপাল মজুমদার তাঁর "Inscriptions of Bengal, vol-III পৃঃ ১৬৯-১৭২"-এই বিষয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। দুর্ভাগ্যের কথা রমেশচন্দ্র মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সরকার বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্গের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদগণ এই তাম্রলিপিটি সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেননি। নীহাররঞ্জন রায় সামান্য একটু উল্লেখ করেছেন মাত্র। সম্ভবত তাম্রশাসনটি হাতের কাছে না থাকার জন্য এই অনীহা। অবশ্য আর একটা কারণও থাকতে পারে তা হল – দক্ষিণ চব্বিশপরগনা (তৎকালীন চব্বিশ পরগনা) সম্বন্ধে অনুসন্ধান জনিত অনুপ্রেরণার অভাব।

যতদূর জানা যায় সেনরাজাদের আদিবাসভূমি কর্ণাটক প্রদেশ। বিজয়সেনের দেওপাড়া (রাজশাহী-বাংলাদেশ) শিলালেখ অনুযায়ী ব্রহ্মক্ষত্রিয় বীরসেন তাঁদের পূর্বপুরুষ। এই বংশে সামন্তসেন (১০৬০-৮০ খৃঃ), তৎপুত্র হেমন্তসেন (১০৮০-৯৬ খৃঃ) এবং হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন (১০৯৬-১১৫৯ খৃঃ)। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের (১১৫৯-৭৯ খৃঃ) নৈহাটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে চন্দ্রবংশীয় রাজগণ অর্থাৎ সেনেরা রাঢ় দেশে ছিলেন এবং তাঁদের বংশে সামন্তসেনের জন্ম। ডঃ দীনেশ সরকার মনে করেন যে সামন্তসেন পাল বংশীয় তৃতীয় বিগ্রহপালের (১০৪৩-৭০ খৃঃ) সামন্তরূপে রাঢ় অঞ্চলের কোন অংশে শাসন করতেন। তাঁর পুত্র হেমন্তসেনও সম্ভবত পাল রাজাদের অধীনেই শাসক ছিলেন। এই সময় পাল রাজারা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-৭১ খৃঃ) বিদ্রোহী প্রজা অভ্যুত্থানে নিহত হন এবং উত্তর বাংলায় দিব্যের নেতৃত্বে কৈবর্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা দ্বিতীয় শূর পালের (১০৭১-৭২ খৃঃ) পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল (১০৭২-১১২৬ খৃঃ) দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সামন্ত রাজগণের সহায়তায় দিব্যের ভ্রাতা রুদোকের পুত্র ভীমের হাত থেকে উত্তর-বাংলা পুনরুদ্ধার করেন।

অনুরূপভাবে দেখা যাচ্ছে বল্লালসেন পুত্র লক্ষ্মণসেনের (১১৭৯-১২০৬ খৃঃ) আমলেও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় এক 'মহারাজাধিরাজ' সামন্ত রাজা ডোম্মনপাল এ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তার একটি তাম্রশাসন (১১১৮ শক বৈশাখ বা ১১৯৬ খৃঃ এপ্রিল/মে) রাক্ষসখালি ('এক' প্লট, পাথরপ্রতিমা) থেকে পাওয়া গেছে। স্পষ্টতই এইসময় দক্ষিণ বাংলায় লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব। কিন্তু ডোম্মনপালের মত স্বাধীন সামন্তরাজারাও যে এসময় দক্ষিণ বাংলা শাসন করত তাও বোঝা যায়। পাল বংশের রাজত্বকাল (আঃ ৭৫০ – ৭৫খৃঃ গোপাল থেকে ১১৬৫-১২০০ খৃঃ পল পাল) ধরলে রামপাল ১০৭২-১১২৬ খৃঃ বাংলায় রাজত্ব করেছেন। সে সময়ই বিজয়

সেনও বাংলার রাজা, কেননা তাঁর রাজত্বকাল ১০৯৬-১১৫৯ খৃঃ। আর বিজয়সেনের সময়ই পাল বংশের কুমার পাল (১১২৬ -১১২৮), তৃতীয় গোপাল (১১২৮-৪৩) এবং মদনপাল (১১৪৩-৬১) রাজত্ব করেছেন। বল্লালসেন (১১৫৯-৭৯) বাংলায় সে সময় প্রতিষ্ঠিত শাসক। তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন (১১৭৯ - ১২০৬) এর রাজত্ব কালে পালরাজাদের আরো দুজনের নাম পাওয়া যায় — গোবিন্দপাল (১১৬১-৬৫) এবং পলপাল (১১৬৫-১২০০)। মোটের উপর বলা যায় পালবংশে ক্ষীয়মান হয়ে এলে বাংলায় সেনবংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মণসেনের পর বিশ্বরূপসেন (১২০৬-২৫ খৃঃ) ও সূর্যসেন দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ববাংলায় রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায় তাদের তাম্রশাসন থেকে। এদিকে নদীয়া পর্বের পর বাংলায় তুর্কি শাসনও কায়েম হতে থাকে। পালবংশ মদন পালের সময় থেকেই পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় দুর্বল হয়ে পড়ে।

লক্ষ্মণসেনের বকুলতলা বা সুন্দরবন তাম্রলিপি তাঁর রাজ্যাঙ্কের দ্বিতীয় বর্ষে ১০ই মাঘ তারিখে প্রদত্ত। অর্থাৎ ১১৮১ খৃঃ জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে।

এখানে লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন তাম্রলিপিটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি।

তাম্রশাসনটিতে প্রদত্ত গ্রামটির নাম মণ্ডলগ্রাম। এটি পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতি 'খাড়ি মণ্ডলের' 'কান্তাল্লপুর চুতরকে' অবস্থিত। গুপ্ত, পাল ও সেনরাজাদের আমলে গঙ্গাতীরবর্তী বাংলা প্রধানত দুটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। গঙ্গা-ভাগীরথীর (দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আদিগঙ্গার) পূর্বাংশের বিভাগীয় প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি এবং পশ্চিমাংশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে বর্ধমানভুক্তি বলা হত। লক্ষ্মণসেনের শান্তিপুর শাসন অনুযায়ী এবং অন্যান্য সূত্রের সমন্বয়ে নলিনী ভট্টশালী এই বিভাগ স্থির করেছেন। দক্ষিণ ভাগে সুন্দরবন অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে কালিদাস দত্ত বিষয়টিকে আরো পরিস্ফুট করেছেন।

ভুক্তি ছিল তৎকালীন বৃহৎ প্রশাসনিক বিভাগ। ভুক্তির প্রধানকে 'ভুক্তিপতি' বলা হত। তারপরই পাই প্রদত্ত উক্ত 'মণ্ডলগ্রাম'টি খাড়ি মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারপরের প্রশাসনিক বিভাগ হল মণ্ডল; এবং এই ভাবে গঙ্গার (আদিগঙ্গার) পূর্ব ভাগে সুন্দরবনের ন্যায় দক্ষিণতম প্রদেশের এই অংশকে 'খাড়ি' বা 'খাড়িমণ্ডল' বলা হয়েছে। একটি ভুক্তিতে অনেকগুলি করে মণ্ডল ছিল। তৎকালে মণ্ডলের অধিপতিকে 'মণ্ডলাধিপতি' বলত; এঁরা মহারাজ উপাধি গ্রহণ করতে পারতেন। অনেক ক্ষেত্রেই 'মহামাণ্ডলিক' বলে বিভিন্ন তাম্রলিপিতে এঁদের উল্লেখ আছে।

এর পরেই আসে 'চতুরকের' কথা। কয়েকটি চতুরক নিয়ে একটি মণ্ডল হত। এই চতুরক নিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা আছে। কেউ কেউ বলেন পুরো মণ্ডলকে কয়েকটি বর্গাকৃতি ভাগে বিভক্ত করে ওই বর্গাকৃতি অংশগুলিকে চারটি প্রায় সমান বর্গাকৃতির অংশ নিয়ে এক একটি চতুরক হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে মোটামুটি চারটি বৃহৎ গ্রামের সমষ্টি নিয়ে একটি চতুরক হয়। বর্তমান তাম্রলিপিটিতে এই চতুরকের নাম 'কান্তাল্লপুর'। মণ্ডলগ্রাম এই কান্তাল্লপুর চতুরকে। এখানে মাত্র প্রাচীন দুটি স্থানকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে — তা হল খাড়ি ও চিতাড়ি খাল। তাম্রলিপিটিতে মণ্ডলগ্রামের দক্ষিণে চিতাড়ি খাতার্দ্ধসীমা বলা হয়েছে। খাড়ির দক্ষিণে এই চিতাড়ি খালের অবস্থান। অর্থাৎ চিতাড়ি খালটি সেই প্রাচীন কালেও চিতাড়ি খাল বা নদী নামে পরিচিত ছিল। এই নদীর অর্ধাংশ ধরেই তার উত্তর সীমানায় মণ্ডল গ্রামটি। স্থানীয় মানুষেরা এই প্রাচীন

গ্রামটির অবস্থান অনুসন্ধান করতে পারেন। এই গ্রামের একটি অংশ এখনো মণ্ডলপাড়া বলে পরিচিত। আর মনে রাখা দরকার যে বকুলতলার জমিদারিতে পুকুর কাটাতে গিয়েই এই তাম্রলিপিটি পাওয়া গিয়েছিল। আজ আরও একটি বিষয় বলা প্রয়োজন – হয়তো হরিদাস দত্তের কোন বংশধর এই তাম্রলিপিটির হদিস দিতে পারেন অথবা তথ্যাদি দিতে পারেন। সেই অনুসন্ধানও করা দরকার। কান্তান্নপুর চতুরকের কান্তান্নপুর নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উন্নত নগর ছিল। যেকারণে 'পুর' বাচক গ্রাম নাম হয়েছে। আর সেই কারণেই এই গুরুত্বপূর্ণ চতুরকের নামকরণও হয়েছে ঐ গ্রামের নামে – কান্তান্নপুর চতুরক।

মনে রাখা দরকার যে সম্পূর্ণ মণ্ডলগ্রামটি কিন্তু এই বকুলতলা তাম্রলিপি শাসন দ্বারা প্রদত্ত হয়নি। তাম্রশাসনে প্রদত্ত মোট জমির পরিমাণ তিন ভূ-দ্রোণ, এক খাদিকা, ২৩ উন্মান, আড়াই কাকিণী পরিমাণ এক খণ্ড জমি। ভূমিটি শুধু মাত্র নীচু জমি নয়। তাতে আছে এক খণ্ড বাস্তু জমি, বৃক্ষলতাদি সহ উর্বর, অনুর্বর জমি, বনভূমি, জলাশয়, সুপারী, নারিকেল প্রভৃতি গাছপালা সহ চট্ট-ভট্ট প্রবেশ রহিত এবং সর্বপ্রকার দায়বদ্ধতা রহিত হচ্ছে এই ভূমিখণ্ড। ভূমিখণ্ডটির বার্ষিক আয় পঞ্চাশ পুরাণ। লক্ষ্য করার বিষয় যে ভূমি খণ্ডটি যথেষ্ট আয়বিশিষ্ট এবং বাসোপযোগী। জমির মাপও বলা হয়েছে প্রচলিত (Standard) বার অঙ্গুলিতে এক হস্ত ধরে এবং এরূপ ৩২ হস্তে এক উন্মান ধরে এই জমির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা হল সেনরাজাদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক খাড়িমণ্ডলের এই সুন্দরবন অঞ্চলেও এবং বিশেষ বিশেষ স্থানগুলিতে ব্রাহ্মণদের বসতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আলোচ্য তাম্রশাসনে দেখতে পাই যে বর্তমানে প্রদত্ত ভূমিখণ্ডটি গর্গগোত্রীয় ভরদ্বাজপ্রবর ঋগ্বেদের অশ্বালয়ন শাখা অধ্যয়নকারী (নরসিংহধরদেব শর্মণের পুত্র) শ্রীকৃষ্ণধরদেবশর্মণকে বাস্তুভিটাযোগ্য জমিতে বসানো হচ্ছে। শুধু তাই নয় সর্বসুবিধাযুক্ত ফলফলাদি বৃক্ষাদি সহ জীবন ধারণের সব রকম সুবিধা এখানে রয়েছে। দণ্ডাদি সহ নানা প্রকার আয় ছাড়াও এই ভূমির বার্ষিক উৎপাদন কম করেও পঞ্চাশ পুরাণ। আর বসানো হচ্ছে এমন জায়গায় যার তিন দিকেই রয়েছে বহুপ্রকার ধর্মীয় ক্রিয়াদিতে পারদর্শী পণ্ডিতগণ। ভূমির চতুঃসীমা বর্ণনার সময়ই তা বলা হয়েছে। এর পূর্বে শান্ত্যাগারিক প্রভাস, পশ্চিমে শান্ত্যাগারিক রামদেব, উত্তরে বিষ্ণুপাণি গড়োলি-কেশব গড়োলি, দক্ষিণে চিতাড়ি খাল। এখানে গড়োলি সম্ভবত গহড়বাল বংশীয়রা (গাড়হবাল)। লক্ষ্মণসেনের সময় কাশীরাজকে সেনেরা পরাজিত করে এবং গহড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত বারাণসীতে জয়স্তম্ভ তৈরী করে বলে দাবি করা হয়েছে। আবার গহড়বালরাজ গয়া অঞ্চল থেকে সেনপ্রভুত্ব উচ্ছেদ করে। অর্থাৎ এসময়ে গহড়বালরা বাংলা-বিহারে বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছিল। লক্ষ্মণসেনও সম্ভবত এদের কাউকে কাউকে দক্ষিণের খাড়ি অঞ্চলে (মণ্ডলে) বসতি স্থাপনে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই গড়োলিরা সেই ভাবেই এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। আমরা মনসামঙ্গলকাব্যে নেতিধোপানীর শিষ্য সর্পবিষ চিকিৎসাবিশারদ শঙ্করগাড়োলি (গড়োলি) কে চাঁদ সদাগরের বিশেষ বন্ধু হিসাবে দেখতে পাই। নেতিধোপানীর অবস্থান গাঙুড়ের (গঙ্গার - আদিগঙ্গার) শেষ অংশে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই সব উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিতগণ এসব জায়গায় বসবাস করত।

বকুলতলা তাম্রশাসনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অনেক ব্যাপার রয়েছে। লক্ষ্মণ

সেনদেবের এই তাম্রশাসটি সংস্কৃত ভাষায় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত প্রাকবঙ্গাক্ষরে তাম্রপত্রের উভয় দিকে লিখিত এবং উভয় দিকেরই উপরে সেনরাজাদের প্রতীক (লক্ষ্মণসেনের সময়) সদাশিব মূর্তি খোদিত। রাজার প্রশস্তিবাক্যসহ উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীদের সামনে এই শাসন ঘোষিত হয় এবং এর সান্ধিবিগ্রহিক ছিল নারায়ণ দত্ত এবং এটি বিক্রমপুর জয়স্কন্ধবার থেকে প্রচারিত।

(৩)
ডোম্মনপালের রাক্ষসখালি তাম্রশাসন

সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা থানার রাক্ষসখালিতে ডোম্মনপালের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। (Epigraphia Indica,Vol-XXVII,1947-48, Page : 119, 1985 সং & Vol-XXX Page : 42 দ্রষ্টব্য)। R.K. Ghosal এটিকে "Rakhaskhali Islandplate of Modomman Pal,Saka 1118, বলেছেন। সম্ভবত সেনরাজাদের অধীনস্থ কোন সামন্তরাজ হবেন এই মহারাজাধিরাজ ডোম্মনপাল। ১১১৮ শক অর্থাৎ ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলে স্বাধীন সামন্তরাজা হিসাবে রাজত্ব করতেন বলেই মনে হয়। এই সময়ে এক অরাজক অবস্থা চলছিল। ডোম্মনপাল স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তাম্রলিপিটির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। উপরের খানিক অংশ ভগ্ন ও অস্পষ্ট এবং নীচের দিকেও কিছুটা চিড় খেয়ে গেছে এবং লেখাও অস্পষ্ট। ডোম্মনপালের নামের আগে উপাধি হিসাবে 'মহাসামন্তাধিপতি', 'মহারাজাধিরাজ' লেখা হয়েছে। তাঁর নামের আগের নামটি পড়া যায়নি, কিন্তু সেখানে উপাধি ছিল "পরমমহেশ্বর" "মহামাণ্ডলিক" "শ্রী (বা) সপালদেব" লেখা পাঠ আছে। এর থেকে বোঝা যায় সুন্দরবনের পূর্ব খাটিকায় কোন এক পরমেশ্বর মহামাণ্ডলিকের পুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীম(দ্) ডোম্মন পাল (১১৯৬ খৃঃ) এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকার ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (৩য়) ১৯৯৪, (পৃঃ ২৬২) পুস্তকে ডোম্মনপালের রাক্ষসখালিতে প্রাপ্ত এই তাম্রলিপিটিকে "লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন-তাম্রলিপি" বলেছেন। এটি ঠিক নয় বলেই মনে হয়। লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন-তাম্রলিপিটি সুন্দরবনের বকুলতলায় পাওয়া গিয়েছিল। যাইহোক, এই তাম্রশাসন দ্বারা ডোম্মনপাল ১১৯৬ খৃঃ (৯ই)বৈশাখ বথোমহিত (ধামহিট্টা) নামে একখানি গ্রাম বন্ধুকৃত্য হিসাবে তাঁর পরম মিত্র, পুরুষোত্তম দেবের পুত্র, সোমদেবের পৌত্র, বার্দ্ধিনস (Varddhinasa) গোত্রের, যজুর্বেদ কান্বশাখা অধ্যয়নকারী মহারাণক বাসুদেব শর্মণকে চিরকালের জন্য দান করেছেন। ডোম্মনপালের রাক্ষসখালি তাম্রলিপিতে প্রদত্ত ঐ 'বথোমহিত' বা ধামহিট্ট নামে গ্রামের বাইরে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল বলে মনে করা যায় — "রত্নত্রয়বহিঃ" কথাটা থেকে। ডোম্মনপালের তাম্রলিপিতে একপাত্র ও সপ্তঅমাত্যের কথা জানা যায়। সে সময় বৌদ্ধদের মঠমন্দির ছিল এবং প্রতিপত্তিও ছিল। প্রদত্ত গ্রামটির নাম পাঠে বিভিন্নতা আছে। V (Dh) amahitha বা বামহিট্ট কেউ কেউ বলেছেন। ডোম্মপালের রাক্ষসখালি (সুন্দরবন) তাম্রশাসনটি যে অঞ্চলে পাওয়া গেছে সেটি হচ্ছে 'পাথরপ্রতিমা' নামক একটি গ্রাম (এখন নেই) কিন্তু বর্তমান থানা পাথর প্রতিমা। সমুদ্রতীরবর্তী শতমুখী বাহিত বুড়িরতট খাড়ি অববাহিকায় এই অঞ্চলটি তৎকালীন কেন্দ্রীয় শাসকদের কাছে দুর্ভেদ্যই ছিল। এখানে প্রচুর বৌদ্ধস্তূপের ও মঠ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রয়েছে।

যে মৃত্তিকাস্তূপের মধ্যে তাম্রশাসনটি পাওয়া গেছে সেখানে প্রচুর ছাদহীন (ভগ্ন) ঘরের বিশাল অস্বাভাবিক চওড়া দেওয়াল রয়েছে। অদূরে রয়েছে আরও একটি অপেক্ষাকৃত সরু দেওয়াল বা প্রাচীর। এই ভয়াবহ বন্যজীবজন্তু অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চল এক কালে একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর নগরী ছিল। ছিল বহুতল বিশিষ্ট সুউচ্চ সুরম্য অট্টালিকা সমূহ যার বিশাল চাওড়া ভগ্নদেওয়াল ও ভিত্তিগুলি দেখা গেছে। দেখা গেছে মঠ, মন্দির, হাট-বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ। তাই তার চারপাশেই পাওয়া যাচ্ছে উঁচু নীচু নানা অট্টালিকার ভগ্ন টিবি। ছিল বৌদ্ধ-জৈনধর্মের কেন্দ্র। ছিল উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন। হয়ত বা দুর্গ এবং রাজধানী ছিল।

সাড়ে দশ ইঞ্চি x সোয়া আট ইঞ্চি তাম্রলেখটিতেতাম্রপাত্রের একদিকে গড়ে প্রায় ১/৫ ইঞ্চি সাইজ উচ্চতা বিশিষ্ট অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় ২২টি লাইনে খোদিত। লেখাগুলি রৌপ্যখচিত। এরকম রৌপ্যখচিত লেখ বাস্তবিকই অতি বিরল। তাম্রশাসনটির অপরদিকে একটি ললিতাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির উপরের অংশ, সমুখে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান গরুড়। মূর্তির মুখমণ্ডলে তার পশ্চাদ্দেশে সূর্যবলয়-জ্যোতি বিদ্যমান। মূর্তিটিকে ভগবান নারায়ণ বলা হয়েছে। এটিতে রয়েছে নৃসিংহ বিষ্ণুজাতীয় মূর্তির গড়ন। লেখমালার আকৃতি, বিন্যাস ও ভাষা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তারিখসহ তাম্রশাসন হিসাবে এই তাম্রলিপির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাক্‌বঙ্গলিপিতে ঐ সময় প্রচলিত ভাষায় তাম্রশাসনটি খোদিত। লেখাটি উপরের ডান দিকে আধ ইঞ্চির মত অংশ নেই। তার ফলেই, পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রথম বাক্যের নামটি সম্পূর্ণ পাঠ করা যায়নি। তলার অংশেও বামদিকে অনুরূপ একটি অংশ নষ্ট হওয়ার ফলে লেখাটিতে লিখিত মাসের ৯ অক্ষরটি অবলুপ্ত হয়েছে। এছাড়া ডানদিকে নীচে থেকে প্রায় ৩ ইঞ্চির মত ফাটলের সৃষ্টি হওয়ায় নীচের সাত লাইনের মাঝ বরাবর ছিন্ন অক্ষরগুলির অস্পষ্টতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডোম্মনপালের এই তাম্রশাসন মতে ধামহিট্টা নামক যে গ্রামটি দানের উদ্দেশ্যে এই তাম্রশাসন তার নিকটেই একটি বৌদ্ধবিহার সহ অনেক স্তূপ ও মঠ ছিল। সেগুলিও এই প্রদত্ত গ্রামটির আশেপাশে হওয়ার কথা। কেননা বর্তমান রাক্ষসখালি (ডোম্মন পালের তাম্রশাসন প্রাপ্তির স্থান) বা F-Plot খুবই প্রত্নসমৃদ্ধ। উত্তরসুরেন্দ্রগঞ্জ থেকে গোবর্দ্ধনপুর সহ এই G-Plot একেবারে পাশাপাশিই তখন ছিল (এখন একটি ক্রীক - এর পার্থক্য)। আরও একটি কথা আছে। এই অঞ্চলটি একটি Market Town বা হাট ছিল। 'ধাম হিট্টা' গ্রামের নামটিও (হিট্টা - হট্ট - হাট) 'হাট' কথাটিকে নির্দেশ করে। এই 'ধাম হিট্টা' গ্রামটিকেই মহাসামন্তাধিপতি, মহামাণ্ডলিক, পরমমহেশ্বর, মহারাজাধিরাজ ডোম্মনপালদেব তাঁর বন্ধু বাসুদেব শর্মাকে বন্ধুকৃত্য স্বরূপ দান করেছিলেন (১১৯৬ খৃঃ ৯ বৈশাখ, ১১১৮ শক)। ডোম্মনপাল শৈব ছিলেন, তথাপি তিনি বিষ্ণু-নরায়ণকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ঐ তাম্রশাসনের অপর দিকে উৎকীর্ণ সামান্য কয়েকটি রেখাচিত্রে জ্যোতির্বলয় সহ ললিতাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ বিষ্ণুর রেখামূর্তিটি এবং জোড়হস্তে দণ্ডায়মান গরুড়মূর্তিটিতে তৎকালীন বাঙালী শিল্পীর পারদর্শিতা এবং নিপুণতা যে কতখানি ছিল তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। সমসাময়িক লক্ষ্মণসেন ও তাঁর পুত্রগণ বৈষ্ণব ছিলেন। অঞ্চলটিতে বৌদ্ধ-জৈন প্রভাবও যে কম ছিল না তাও এই তাম্রলিপিতে স্বীকৃত। আমরা ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের (এবং অন্যান্য চৈনিক) সূত্র থেকে জানতে পারি যে দক্ষিণ

বাংলার এই সমস্ত উপকূলভাগে তখন বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আবার এই তাম্রলিপি থেকে শৈব ডোম্মনপালের কথাও জানা যাচ্ছে। অর্থাৎ ঐ সময় রাজকীয়ভাবে শৈবধর্মের প্রাধান্য ছিল এই অঞ্চলে। এই সামন্তরাজ পরিবার অযোধ্যা থেকে এসে পূর্ব খাটিকা (খাড়ি) অধিকার করেন। পূর্ব খাটিকা অর্থাৎ খাড়ির (বর্তমান রায়দীঘি থানার একটি গ্রাম মাত্র। কিন্তু পূর্বে এটি খাড়ি মণ্ডল, খাড়ি বিষয় বা পূর্ব খাটিকা এবং পশ্চিম খাটিকা ইত্যাদি নামে খ্যাত ছিল) পশ্চিম দিকে পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি অঞ্চলের (থানায়) দীর্ঘ উপকূলভাগ বাংলার একটি বিস্তৃত অঞ্চলকে বোঝাত। ডোম্মনপাল সেনবংশের লক্ষ্মণ সেনের প্রায় সমসাময়িক এবং তুর্কী আক্রমণের সময়কার রাষ্ট্রীয় অরাজকতার সময়ে সহজেই এই সমুদ্র খাড়ি অঞ্চলে হয়ত এক স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

ডোম্মনপালের তাম্রলিপি থেকে আর একটি তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে। পূর্বখাটিকার এই 'ধামহিট্টা' গ্রামদান বিষয়ক রাজকীয় আদেশটি (তাম্রশাসন হিসাবে) Announce করা অর্থাৎ জনসাধারণকে জানানোর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করার সময় একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এটি একটি জনবহুল Public Place, পূর্ব খাটিকার (খাড়ির) একটি বিশেষ স্থান, হয়ত বা রাজধানী, নাম শ্রীদ্বারহাট (Sri Dvarahatake)। এই 'শ্রী' কথাটি থাকার জন্য এটিকে একটি বিশেষ স্থান, নগরী বা রাজধানী বোঝান হয়েছে; তাছাড়া ঐ Public Announcement - এর সময় বহু রাজন, উচ্চ পদস্থ রাজ্য কর্মচারী, বিচারক, নাগরিক, সপ্ত অমাত্য, রাণী, রাজপুত্র, পুরোহিত ব্রাহ্মণাদি উপস্থিত ছিলেন। যাই হোক, এই দ্বারহাটক বা দ্বারহাট শুধু রাজধানী (?) - ই নয় এটি ছিল একটি 'হাট' এবং 'দ্বার' হাট - অর্থাৎ Gateway এবং Market Town ও বটে। কিন্তু এই Gateway এবং Market Town তো একদিনে গড়ে ওঠেনি —আরও অন্তত কয়েক শত বছর পূর্বের ঐতিহ্য না থাকলে এরকম খাড়ি-অঞ্চলে একটি Gateway of Bangal (?) এবং Market Town হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনা। কাজেই একটা দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য যে খাড়ির রয়েছে অর্থাৎ সেই খাড়িমণ্ডল এবং পুন্ড্রবর্দ্ধনের যুগ থেকে, এটা বোঝা যায়। এই ধারাবাহিকতা সম্ভবত গঙ্গারিডিদের রাজত্বকাল থেকেই চলে আসছে।

(৪)

মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রের জটা-বিষয়ক তাম্রলিপি

এক সময় জটারদেউল ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ এবং শ্বাপদসঙ্কুল ছিল। এটি ১১৬ নং লটের অন্তর্ভুক্ত এবং কঙ্কণদীঘির পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত। জটারদেউল মন্দিরের সন্নিকটে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জমিদার দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী জঙ্গল কাটানর সময় একটি তাম্রলিপি পেয়েছিলেন। তাম্রলিপিটির অক্ষর সংস্কৃত এবং এটি পাঠে জানা যায় যে, মহারাজ জয়ন্তচন্দ্র দ্বারা ৮৯৭ শকাব্দে (৯৭৫ খৃঃ) এই মন্দিরটি নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এই তাম্রলিপিটির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ঐসময় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন বলে কালিদাস দত্ত বলেছেন (দক্ষিণ চব্বিশপরগনার অতীত—১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪)। Revised List of Ancient Monuments in Bengal Presidency Division 1886, পুস্তকে এই তাম্রলিপির উল্লেখ আছে ঃ "The Deputy Collector of Diamond Harbour reported in

1875 that a Copper Plate discovered in a place little to the north of Jatar Deul fixes the date of its erection by Raja Jayanta Chandra in the year 897 of the Bengali Saka era, corresponding to A.D. 975. The bricks are remarkably fine, and the cement very adhesive. The Coper Plate was discovered at the clearing of the jungle by the grantee, Durgaprosad Chaudhury. The Inscription is Sanskrit, and the date, as usual, was given in the enigma with the name of the founder" Page --: 221 -- 222.

অন্যান্য লিপি ঃ

অপর যে সকল তাম্রলিপি বা শিলালিপিতে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার কথা জানা যায় তা হল নবম শতাব্দীর রাজা দেবপালের লিপি। এই লিপিতে গঙ্গাসাগরের উল্লেখ এইভাবে আছে ঃ

"দিগ্বিজয় প্রবৃত্ত সেই নরপতির ভৃত্যবর্গ কেদারতীর্থে যথাবিধি জলক্রিয়া (স্নান-তর্পণাদি) সমাপ্ত করিয়াছিলেন; এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে তথা গোকর্ণ প্রভৃতি তীর্থেও ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এইরূপে এই রাজার দুষ্টদলন, শিষ্টপালন-বিষয়ক আনুসঙ্গিক সিদ্ধি ও ভৃত্যবর্গের পারলৌকিক সিদ্ধিলাভের হেতুভূত হইয়াছিল" (গৌড় লেখমালা, অক্ষয় মৈত্রেয়, পৃঃ৪২)। অবশ্য এই গঙ্গাসাগর সম্বন্ধে দ্বিমত আছে।

বিজয় সেনের বারাকপুর তাম্রলিপিতে খাড়িকে একটি "বিষয়ক" বলা হয়েছে। এছাড়া বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রলিপিতে উত্তর রাঢ়মণ্ডলকে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। আবার লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবনলিপিতে খাড়িমণ্ডল কথাটি বলা হয়েছে এবং সেটি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আমলে দেশের সর্ববৃহৎ ভৌগোলিক বিভাগকে 'ভুক্তি' (যেমন, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি, দণ্ডভুক্তি, বর্দ্ধমানভুক্তি) এবং তদাধীন ক্ষুদ্র বিভাগকে 'বিষয়' ও 'মণ্ডল' বলা হত। মণ্ডল পর্যন্ত বিভাগের রাজকর্মচারী উচ্চপদাধিকারী ছিলেন – মণ্ডলাধিপতি। মণ্ডলাধিপতি রাজ্যে পরমেশ্বর রাজাধিরাজের পরেই স্থান পেতেন। আবার মণ্ডলের অধীনে ছিল 'খণ্ডল', 'আবৃত্তি' ও 'ভাগ'। আবৃত্তি ছিল 'চতুরক' ও 'পাটকে' বিভক্ত। মোটামুটি পাটক ছিল একটি গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে আদিগঙ্গা (ভাগীরথী) র পূর্বতীরস্থ অঞ্চলকে (পূর্ব খাটিকা – পূর্ব খাড়ি) পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি এবং আদিগঙ্গার পশ্চিমপার্শ্বস্থ অঞ্চল (পশ্চিমখাটিকা – পশ্চিম খাড়ি) হল বর্দ্ধমানভুক্তি। মণ্ডল একটি বিরাট অংশ, বর্তমানের বড় একটা মহকুমার সমান। শিয়ান তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, রাজা নয়পাল বৌদ্ধ হলেও তিনি শৈব অনুরাগী ছিলেন এবং গঙ্গাসাগরে সুবর্ণপীঠ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। অবশ্য এই পাল-সেন বংশীয় রাজাদের বহুপূর্বে একটি তাম্রলিপি বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকের। মহারাজা বিজয় সেনের উক্ত তাম্রলিপি থেকে এই প্রথম আমরা "বর্দ্ধমানভুক্তি" কথাটি পাই। এই বিজয়সেন প্রথমে মহারাজ বৈন্যগুপ্তের (১৮৮ গুপ্তাব্দ) গুণাইঘর তাম্রশাসনের দূত ছিলেন। পরে তিনি মহারাজা গোপচন্দ্রের দ্বারা বর্ধমানভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

যাইহোক, পরবর্তী সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেনদেবের আনুলিয়া (নদীয়া) তাম্রশাসনে এবং দেবপালের (নবম শতাব্দী) মুঙ্গের তাম্রশাসন থেকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ব্যাঘ্রতটিমণ্ডলের

কথা পাই। ব্যাঘ্রতটী যে ব্যাঘ্রনিবাসভূমি (সুন্দরবন) নাম থেকেই হয়েছে এবং এই অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। রাধাগোবিন্দ বসাক ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলটি যে দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ঃ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৩২৩)। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রলিপিতেও ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের কথা রয়েছে। এছাড়া প্রথম মহীপালের বাণগড় শাসনে, তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি শাসনে, মদন পালের মনহলি শাসনে, শ্রীচন্দ্রের রামপাল শাসনে, ইদিলপুর শাসনে ও ধুল্লা শাসনে, সূর্য সেনের ইদিলপুর শাসনে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বা পৌণ্ড্রভুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্প্রতি, ১৯৯০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার রাজীবপুর থেকে পালরাজ মদনপালের যে দুইখানা তাম্রলিপি পাওয়া গেছে তাতেও পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাস্থানগড় (বাগুড়া, বাংলাদেশ) শিলালিপি থেকে (খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) পাওয়া "পুড়নগলতে" শব্দের "পুড়" শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে প্রচলিত 'পুড্' শব্দটি থেকেই "পোদ" কথাটি এসেছে। এই পোদ বা পৌণ্ড্ররা পরবর্তীকালে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে অর্থাৎ দক্ষিণ চব্বিশপরগনা ও খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে এসে বসবাস করতে থাকে। এই শিলালিপি বিষয়ে নরোত্তম হালদার তাঁর "গঙ্গারিডি ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ" (২য় সংস্করণ) গ্রন্থে (পৃঃ ৭৭ - ৭৯) সবিশেষ আলোচনা করেছেন।

(৫)

দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় জয়নাগের তাম্রশাসন

দেশের যে কোন অঞ্চলের ইতিহাস উদ্ধারে তাম্রলিপি বা রাজকীয় তাম্রশাসন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ লিখিত দলিল। জেলা হিসাবে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার সৌভাগ্য যে এ-জেলায় বেশ কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

আর একটিমাত্র তাম্রশাসন আছে যেটি দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় প্রাপ্ত বলে জানা যায়। আলোচ্য এই তাম্রশাসনটির বিষয়ে খুব বেশী কোথাও আলোচনা হয়নি বলে অনেকের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। আজকের আলোচনায় খুব সংক্ষিপ্তভাবে এই তাম্রশাসনটি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলি। এই তাম্রশাসনটিকে মলয়, মাল্লিয় বা 'মলয়া তাম্রশাসন' বলে অভিহিত করা হয়। সাধারণত তাম্রশাসনগুলি যেখানে যেখানে পাওয়া গেছে, প্রাপ্তি স্থানের নামেই তাদের অভিহিত করা হয়। যেমন (লক্ষ্মণসেনের) গোবিন্দপুর তাম্রশাসন, বকুলতলা তাম্রশাসন বা (ডোম্মনপালের) রাক্ষসখালি তাম্রশাসন। আলোচ্য তাম্রশাসনটি মলয় বা মলয়া নামক স্থানে পাওয়া গিয়েছিল বলে এটিকে 'মলয়া তাম্রশাসন' বলা হয়। এবার বলি, মলয়া স্থাননামটি কোথায়। তৎকালীন ডায়মণ্ডহারবার (বর্তমানে কাকদ্বীপ) মহকুমার প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণপূর্বে এবং খাড়ি থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এই গ্রামটির অবস্থানের কথা জানা যায় (থানা পাথরপ্রতিমা)। তাম্রশাসনটির অক্ষর ছাঁদ ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর এবং এটি মহারাজ জয়নাগ অনুমোদিত ১৫ লাইনের একটি গ্রামদান পট্ট বা সনদ। একটি বিশুদ্ধ তাম্রপাতের একদিকে খোদিত এই তাম্রশাসন দ্বারা 'বপ্যঘোষবাট' নামক একখানি গ্রাম দান করা হয়েছিল। অনেক বিস্তৃত বিবরণ এইসব তাম্রশাসনে লেখা হয় – এতেও লেখা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে দু'একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করব।

প্রদত্তগ্রামনাম যেহেতু 'বপ্যঘোষবাট', সেহেতু এই শাসনটিকে কেউ কেউ 'বপ্যঘোষবাট শাসন' বলতে চেয়েছেন। মহারাজাধিরাজ জয়নাগ 'বিষয়পতি' নারায়ণ ভদ্রকে স্বয়ং নিযুক্ত করেছিলেন। এই 'বিষয়টি' ছিল 'ঔদুম্বরিক বিষয়'। ৬ষ্ঠ-৭ম শতকের 'ঔদুম্বরিক বিষয়ের' অবস্থান নিয়ে মতভেদ আছে - কেন না কোন সঠিক তথ্য বা সূত্র অনুধাবন করা যায়নি।

তাম্রশাসনটিতে দানকৃত গ্রামের যে চতুঃসীমা দেওয়া আছে তা হল 'বপ্যঘোষবাট' বা 'বপ্পঘোষবাট' নামক গ্রামটির পশ্চিমসীমায় (ইতিপূর্বে) প্রদত্ত ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রভূমি কুক্কুটগ্রাম নামক গ্রামের সীমা; উত্তরে নদীর খাত; পূর্বে একই নদীর খাত এবং এই নদীখাত সীমানা থেকে আরম্ভ করে আমলপান্তিক গ্রামের পশ্চিমসীমা স্পর্শ করে যে 'সর্ষপ-যানক' (সর্ষপ পরিবহনজনিত পথ) একেবারে ভট্ট উন্মীলন স্বামীর ক্ষেত্র পর্যন্ত চলে গেছে; সেখান থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে সোজা ভরণি স্বামীর ক্ষেত্রসীমা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সোজা লম্বমান হয়ে ভট্ট উন্মীলন স্বামীর ক্ষেত্রসীমায় অবস্থিত 'বখট সুমালিকার' পুষ্করিণী ভেদ করে (আবার) কুক্কুটগ্রামের (যেটি পশ্চিমদিকে অবস্থিত) ব্রাহ্মণদিগকে দান করা ভূমিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত (এবং এইভাবে সীমায়িত)।

মহারাজাধিরাজ জয়নাগ কর্ণসুবর্ণের (কানাসোনা/মুর্শিদাবাদ) জয়স্কন্ধাবার (সেনানিবাস/রাজধানী) থেকে উক্ত ভূমিদানের আদেশ মঞ্জুর করেছেন। মহাপ্রতীহার সূর্যসেন 'বপ্যঘোষবাট' নামক গ্রামটি (রাজকীয় আদেশ অনুযায়ী) ভট্ট 'ব্রহ্মবীর স্বামী' নামক জনৈক কাশ্যপ গোত্রীয় ছন্দোগ্য ব্রাহ্মণকে দান করেছেন। মলয়া তাম্রপট্টলীটি সেই দানপত্র সনদ। অন্যের প্রার্থনা ছাড়াই রাজা নিজে এই দান করেছেন। এই মহারাজাধিরাজ জয়নাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর রাজ্যসীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল তাও সঠিক বলা যায় না। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহারাজ জয়নাগ যে কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করতেন তা এই মলয়া তাম্রশাসন থেকে বোঝা যাচ্ছে। তাছাড়া জয় (বা জয়নাগ) নামক রাজার নামাঙ্কিত কিছু স্বর্ণমুদ্রা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বারুইপুর (রামনগর) প্রভৃতি স্থান থেকে পাওয়া গেছে। 'মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে' জয় নামক রাজার কথা আছে। মঞ্জুশ্রী মূলকল্পের এবং স্বর্ণমুদ্রার এই 'রাজা জয়' এবং মলয়া তাম্রশাসনের 'জয়নাগ' একই ব্যক্তি বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

মলয়া তাম্রশাসনে প্রদত্ত গ্রাম বপ্যঘোষবাট 'ঔদুম্বরিক বিষয়ের' অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (জয়স্কন্ধবার)। প্রদত্তগ্রামটির (৭ম শতাব্দী) তৎকালীন পরিচিতি বিংশ-একবিংশ শতাব্দীতে তাম্রশাসনে প্রদত্ত সূত্রানুসারে খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। তখন থেকে কতবার এ অঞ্চলের কত উত্থানপতন ঘটেছে, ভূমিকম্প-সাইক্লোনে, ভূ-অবনমনে কত পরিবর্তন এবং জনপদের নতুন নতুন উত্থানপতন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপাদে পাওয়া এই তাম্রলিপি মহারাজ জয়নাগকে বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, কেননা জয়নাগের এজাতীয় তাম্রশাসন আর একটিও পাওয়া যায়নি। সম্ভবত সেজন্যই জয়নাগ বিষয়ে এবং মলয়া তাম্রলিপির বিষয়ে বেশী আলোচনা দেখি না। আর ঠিক সে কারণেই আলোচ্য তাম্রলিপিটি জয়নাগের রাজত্বকালের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার ক্ষেত্রে তথা দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। আবার তাম্রলিপিগুলির ক্ষেত্রে দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় প্রাপ্ত তাম্রলিপিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম (এ-পর্যন্ত) হওয়ায় এটির লিপি এবং তথ্যাদি খুবই

মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শন। কিন্তু একটি স্থানে বেশ গোলমাল আছে। তাহল 'ঔদুম্বরিক' বিষয় নিয়ে। মুর্শিদাবাদের কানাসোনা (রাঙ্গামাটি?) জয়নাগের রাজধানী এবং তার উত্তর ও উত্তরপূর্ব অংশে 'ঔদুম্বরিক' বলে অনেকে মনে করেন। দক্ষিণ বঙ্গের এই অংশ তখন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বলে বেশীর ভাগ পণ্ডিত অনুমান করেছেন। এর দক্ষিণ অংশ খাড়িমণ্ডল (বিষয়) যা সুন্দরবনের অন্তর্গত। খাড়ির বেশ কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এই তাম্রলিপিটির প্রাপ্তিস্থান — মলয়া (মলয়/মল্লিয়) গ্রাম, যেটি এখন কাকদ্বীপ মহকুমার পাথরপ্রতিমা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম (JL-98)। এই ঔদুম্বরিক বিষয়ের অন্তর্গত যদি তাম্রলিপি - প্রদত্ত গ্রামটিহয় তাহলে সাধারণত তাম্রলিপিটি ঔদুম্বরিক বিষয়ের মধ্যে কোন স্থানেই পাওয়ার কথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'ঔদুম্বরিক বিষয়' পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে কেমন করে হবে? দক্ষিণদিকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, গঙ্গাকে অর্থাৎ দক্ষিণ চব্বিশপরগনার ক্ষেত্রে, আদিগঙ্গাকে, (সরস্বতী-পুষ্ট হুগলী নদী নয়) সীমারেখা করে গঙ্গার পূর্বদিকে (সমুদ্রতট পর্যন্ত কি?) বিস্তৃত। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচ্য মলয়া গ্রামটি আদিগঙ্গার পশ্চিমদিকে পড়ে। ফলে এটি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি না হওয়ার সম্ভবনাই বেশী। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ- ৭ম শতকে এই অঞ্চলটি তাহলে 'ঔদুম্বরিক বিষয়ের' অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা বর্ধমানভুক্তির (পরবর্তীকালে যা গঙ্গার পশ্চিমদিকে বলে চিহ্নিত) খোঁজ তখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে কোথাও পাওয়া যায় না। পাল-সেন আমলে বর্ধমানভুক্তি পুণ্ড্রবর্ধনের পাশাপাশি গঙ্গার পশ্চিমতীরে চিহ্নিত হচ্ছে দেখা যায়। তাহলে হয়ত বর্ধমানভুক্তি হওয়ার পূর্বে কর্ণসুবর্ণ হয়ে দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্যন্ত গঙ্গার পশ্চিম তীর বরাবর একটি অল্পবিস্তৃত অংশ ঔদুম্বরিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তা না হলে কোনভাবে লিপিকরের ভুলে বা পাঠোদ্ধারের হেরফেরে প্রদত্ত বপ্যঘোষবাট গ্রামটির অবস্থানের 'বিষয়'টির হেরফের হয়েছে কি?

সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের শাসকগণ প্রায় সবসময় মূল সম্রাটের নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করে অঞ্চলটিকে প্রায় করদরাজ্যে পরিণত করেছিলেন এবং বিদ্রোহী বা প্রায়স্বাধীন সামন্তরাজা হিসাবে এই অঞ্চলে তাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। কাজেই জমির মাপজোক, ভুক্তির সীমানা নির্দ্ধারণ ইত্যাদি সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগে কতটা বাস্তবভিত্তিক ছিল অথবা কতটা পুঁথিগত বিদ্যার ফলে হয়েছে তা বলা শক্ত। বিশেষত নদী-খাড়ি বেষ্টিত এই মোহনা অঞ্চলে এবং সুন্দরবনের ভীতিসঙ্কুল জলা-অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত অনুমান হয়ত সঠিক।

জয়নাগের তাম্রশাসনটি হয়ত কোন কারণে সুদূর দক্ষিণে আনা হয়েছিল এমন তো হ'তে পারে? কিন্তু এ যাবৎ তাম্রলিপিগুলির প্রাপ্তিস্থান এবং প্রদত্ত ভূখণ্ডগুলির অবস্থান লক্ষ্য করলে ঐ সম্ভবনার কথা মনে হয় না। কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায় যে জয়নাগের বপ্যঘোষবাট নামক ঔদুম্বরিক বিষয়ের গ্রামদান বিষয়ক তাম্রপট্টলীটি প্রদত্তগ্রামখানির কয়েক মাইলের মধ্যেই বা কাছাকাছি, এমনকি হয়ত একই গ্রামে পাওয়া গেছে। আর এই গ্রামটি বর্তমানের ঐ মলয়া গ্রাম — যেটির নামে তাম্রলিপিটির নামকরণ করা হয়েছে।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর (৬০৬-৬৩৭ খৃঃ, মতান্তর আছে) পর কলহে ও বিদ্রোহে এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। ৬৪১ খৃঃ হর্ষবর্দ্ধন মগধ জয় করেন। শশাঙ্কের পুত্র মানব ৮ মাস রাজত্ব করেন। আনুমানিক ৬৪৬-৪৭ খৃঃ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। সম্ভবত এই সময়ই জয়নাগ কর্ণসুবর্ণের রাজা ছিলেন। অনেকে মনে করেন জয়নাগ শশাঙ্কপুত্র মানবের পূর্বেই কর্ণসুবর্ণের

রাজা ছিলেন। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার মনে করেন জয়নাগের রাজত্ব ৬২৫ খৃস্টাব্দে (পালপূর্ব, পৃঃ ২০৭)। অন্যদিকে খৃষ্টীয় ৬৫০ অব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন বলে অনুমিত। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণেই ছিল। ৬৩৮ খৃঃ উয়ান্ চোয়াং বাংলাকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত দেখেছিলেন ঃ কজঙ্গল, পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট। কাজেই এ সময় যে একটি অরাজক অবস্থা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল তা বোঝা যায় বাংলার এই ছিন্নভিন্ন ব্যবস্থা দেখে। দক্ষিণ-চব্বিশপরগনায় শুধু জয়নাগের তাম্রশাসনটি পাওয়া গেছে তাই নয় — এখানে জয়নাগের একটি স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গেছে। বারুইপুর থানার রামনগরে কয়েক বছর আগে রাস্তা তৈরীর সময় মাটি কাটতে গিয়ে জয়নাগের স্বর্ণমুদ্রাটি পাওয়া গেছে। এটি এখন স্থানীয় মিউজিয়ামে রয়েছে। কাজেই জয়নাগের যে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে তার সঙ্গে বারুইপুরে পাওয়া স্বর্ণমুদ্রাটির কথাও বিবেচনা করতে হবে এবং তাম্রলিপির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা পাওয়া বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মনে রাখা দরকার যে বারুইপুরের প্রায় ৫০—৬০ কিমি দক্ষিণে এই মলয়া নামক গ্রামটি অবস্থিত। জয়নাগের রাজ্য কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) থেকে একদা আদিগঙ্গা বরাবর দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল কি না অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

মলয়া তাম্রলিপি দ্বারা ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রসার ও প্রভাব অনুমিত হচ্ছে। গুপ্তপর্বে বর্ণ বিন্যাসের যে রীতি গড়ে উঠেছিল — অনেকের ধারণা তা দক্ষিণবঙ্গে তত প্রসারলাভ করেনি। কিন্তু এই তাম্রলিপি-সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে যে প্রদত্তগ্রাম বপ্যঘোষবাটের প্রায় চারিদিকেই ব্রাহ্মণদের বাস। মহাপ্রতীহার সূর্যসেন যাঁকে এই গ্রামটি দান করছেন তিনি ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী। গ্রামটির পশ্চিমে কুক্কুটগ্রাম ব্রাহ্মণদের। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে (?) ভরণি স্বামী ও ভট্ট উন্মীলন স্বামী নামক স্বামী পদবীধারী আরও দু'জন ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যাচ্ছে। আবার বপ্যঘোষবাট ও কুক্কুটগ্রাম নাম দুটি পাওয়া যাচ্ছে। একটি পুষ্করিণীর নাম পাওয়া যাচ্ছে 'বখট সুমালিকা' বলে। সবেচেয়ে বড় কথা এই গ্রামগুলি সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার আওতায় ছিল। কেননা উৎপন্ন কৃষিজ দ্রব্যাদি যথাযথ স্থানে, গ্রামান্তরে ও বাজারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ছিল। পট্টলীতে দেখা যাচ্ছে যে, যে পথ দিয়ে এই পরিবহন ব্যবস্থা চালু ছিল সেটি 'সর্ষপ যানক' নামে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। কাজেই সেখানে যে প্রচুর পরিমাণে সরিষা উৎপন্ন হত তা বোঝা যাচ্ছে। যে কারণে পরিবহন পথটির নাম হয়েছিল মূল উৎপাদন সরিষা নামেই 'সর্ষপ যানক'।

দুঃখের বিষয়, মূল তাম্রশাসনটি আর আমাদের দেশে নেই। এটি এখন অস্ট্রেলিয়ার পার্থ মিউজিয়ামে রয়েছে। এটিতে কোন তারিখ নেই লেখার আকার ৬ষ্ঠ - ৭ম শতাব্দীর। এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীলচাষের ক্ষেত থেকে পাওয়া গিয়েছিল উক্ত মলয়া নামক গ্রামে। জ্ঞাতব্য যে বারুইপুর থেকে খাড়ি প্রভৃতি অঞ্চল এ সময় নীলচাষের জন্য বিখ্যাত ছিল।

L.D. Barnett এবং পরে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাম্রলিপিটি সম্পাদনা করেন যথাক্রমে Epigraphia Indica XVIII 1925-26, P-60 এবং Epigraphia Indica - XIX 1927-28, P - 286-87.

—o—

চব্বিশপরগনা গ্রন্থ-ইতিহাস সম্মেলন, বারুইপুর, ২০০২, স্মরণিকায় প্রকাশিত (পরিমার্জিত)

দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলার প্রত্নস্থল ও অনুসন্ধান

সূচনা ঃ

কোন একটি অঞ্চলের প্রত্নস্থল বিষয়ে অনুসন্ধান জাতীয় প্রত্ন-ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রত্ন - ইতিহাস অনুসন্ধান ও চর্চার ইতিহাসে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার স্থান জাতীয় প্রত্ন - অনুসন্ধান ও চর্চার সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এজেলা খুব একটা পিছিয়ে নেই। কিন্তু উৎখনন বিষয়ে সরকারী কর্তা ব্যক্তিদের অনীহা, অস্বচ্ছ ধারণা এবং বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রত্ন-অনুসন্ধান ও প্রত্নচর্চা বিশ্ব প্রত্নমানচিত্রে সঠিক স্থান লাভ করতে পারেনি। যদিও সেই সম্ভাবনা যথেষ্টই।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই জেলার প্রত্ন অনুসন্ধানের বাস্তব সূচনা। ইংরেজ রাজপুরুষ এবং অন্যান্যদের কাছে সাগরদ্বীপ এবং অন্যান্য স্থানে দু-একটি হঠাৎ পাওয়া প্রত্নবস্তু থেকে প্রত্ন-আগ্রহের সূচনা হয়। তবে ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। মেগাস্থিনিস্ ও তাঁর অনুসারী ইতিহাসবিদ্‌দের লেখায় খৃষ্টপূর্ব যুগ থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত গঙ্গারিডি নামে দক্ষিণের এই অঞ্চলের নির্দেশ পাই। গঙ্গারিডি রাজ্যের অবস্থিতি, গঙ্গার মোহনা ইত্যাদির কথা জানা যায়। অবশ্য দেশীয় শাস্ত্র রামায়ণে ইতিপূর্বে সাঙ্খ্যদর্শন প্রণেতা কপিলের (সাঙ্খ্য) আশ্রম হিসাবে সাগর (পাতাল) তীরস্থ এই অঞ্চলে জনপদবাসীর উল্লেখ দেখি। অপরদিকে ভূগোলবিদ্ টলেমির ম্যাপ দেখে এবং পেরিপ্লাস গ্রন্থকারের ভ্রমণ বৃত্যান্ত মূলক ডায়েরী থেকে দক্ষিণ-বঙ্গের এই অঞ্চলের অবস্থান, গঙ্গারিডি রাজ্যের বিস্তৃতি, বিভিন্ন বন্দর নগরের তথ্যাদি পাই।

অপরদিকে বলা যায় ইংরেজ সার্ভেয়ারদের মধ্যে রেণেল প্রভৃতির মানচিত্রে সুন্দরবন অঞ্চলের অনেক প্রত্নস্থল, মন্দির, প্যাগোডা, স্তুপ, ঢিবি, ইঁটের প্রাচীর ইত্যাদির চিহ্ন দেখা যায়। নালুয়া, বাইশহাটার বিভিন্ন মঠবাড়ী, জটারদেউল, নেতিধোপানী, চামটা, বনশ্যামনগরের ভগ্নদেউলসহ প্রত্নাঞ্চলগুলির হদিস তখন থেকেই মেলে। কিন্তু সাপ, বাঘ, চোর-ডাকাত অধ্যুষিত বিপদসঙ্কুল ভয়াবহ নদী, খাড়ি ও জঙ্গলাবৃত অঞ্চলে প্রত্ন-অনুসন্ধান চালানো এক ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী দুরূহ কাজ ছিল। কাজেই তখনকার দিনে এমনকি বিংশ শতাব্দীর ১ম, ২য় দশক পর্যন্ত তাই সুন্দরবনসহ এই অঞ্চল অজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল। এই সময়ের আগে তখনকার অবিভক্ত এই জেলায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায় যা প্রত্নস্থল ও অনুসন্ধান বিষয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মজিলপুরের জমিদার হরিদাস দত্ত বর্তমান রায়দীঘি থানার বকুলতলা গ্রামে একটি পুকুর কাটার সময় মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের দ্বিতীয় সংবতে প্রদত্ত একটি তাম্রশাসন পেয়ে গেলেন ১৮৬৮ সালে। অবশ্য জয়নাগের মলয়া (পাথরপ্রতিমা থানা) তাম্রশাসনটি (৭ম শতাব্দীর) এর আগেই মলয়া গ্রামে পাওয়া গিয়েছিল (Epigraphia Indica XVIII–1925-26 এ প্রকাশিত)।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১১৬ নং লটের অন্তর্ভুক্ত কঙ্কণদীঘির পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত সারাদেশের প্রত্ন ঐতিহ্যের গর্বস্থল বর্তমান পশ্চিমজটা (JL-128) গ্রামে প্রায় একশত ফুট উচ্চতার দশ ফুট চওড়া পোড়া ইটের দেওয়াল বিশিষ্ট উড়িষ্যার রেখ-দেউলের বৈচিত্র্য ও শিল্প সৌষ্ঠবে ভরপুর জটারদেউল মন্দিরটির নিকট পাওয়া যায় মহারাজা জয়ন্ত চন্দ্র কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠার (৯৭৫ খৃঃ) একটি তাম্রলিপি। ১৯১৯ খৃঃ বারুইপুরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুরের (থানা - সোনারপুর) হেঁদো (কালাকর্পূর) পুকুরটির সংস্কার করার সময় পাওয়া গেল মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বকালের দ্বিতীয় সংবতে প্রদত্ত ভূমিদানপত্র বিষয়ক (বকুলতলা তাম্রশাসনের মতই) একটি তাম্রশাসন। সাগরদ্বীপ এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থান থেকে কিছু প্রত্নবস্তু উদ্ধার করা হয়েছিল।

কালিদাস দত্ত ঃ

এই পর্যায়ের পূর্বেই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে জয়নগরের জমিদার কালিদাস দত্ত (১৮৯৫-১৯৬৮ খৃঃ) এ- জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রত্ন অনুসন্ধানের কাজে ব্রতী হন (১৯২৪ খৃঃ)। সুন্দরবনের গভীর বনভূমিসহ বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে তিনি নৌযোগে অথবা পদব্রজে প্রত্নানুসন্ধান করতে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই তাঁর প্রত্নঅনুসন্ধান, এ - জেলার প্রত্নস্থল ও প্রত্নদ্রব্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বাংলা ও ইংরাজীতে বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় এবং বারেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মনোগ্রামগুলিতে প্রকাশিত হতে থাকে। দীর্ঘ দিন যাবৎ কালিদাস দত্ত প্রত্নস্থল ও প্রত্ন অনুসন্ধানচর্চাকে এই ভাবে এক সুদৃঢ় ভিত্তভূমির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে যান। ননীগোপাল মজুমদার, দেবপ্রসাদ ঘোষ, পরেশ দাশগুপ্ত, স্টেলা ক্রামরিশ প্রভৃতি দেশী - বিদেশী প্রত্নগবেষকগণ এঅঞ্চলের প্রত্নস্থলগুলি সম্বন্ধে সচেতন হন এবং হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, বোড়াল, আটঘরা, মন্দিরতলা, জটা, বিরিঞ্চিবাড়ি, ভরতগড়, বোড়ল প্রভৃতি প্রত্নাঞ্চল অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে মূল্যবান প্রত্নবস্তু উদ্ধার করেন এবং জেলার প্রত্নইতিহাসকে উজ্জ্বল করে তোলেন।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শুরুতেই কালিদাস দত্ত সুন্দরবনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরী করে প্রকাশ করেন, যা আজও প্রাসঙ্গিক। বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে পাথরপ্রতিমা থানার 'F' Plot রাক্ষসখালীর ব্রজবল্লভপুর গ্রামের জমিদার কাছারী বাড়ীর কাছে খননকালে পাওয়া গেল সামন্তরাজা মহারাজ ডোম্মনপালের ১১৯৬ খৃঃ প্রদত্ত গ্রামদান বিষয়ক তাম্র শাসন (Epigraphia Indica, Vol.:XXVII, 1947-48)। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রত্ন চর্চার ইতিহাসে এ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কালিদাস দত্তের (তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে একযোগে) ষাটের দশকের মাঝ বরাবর পর্যন্ত প্রত্নানুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যান। তাঁর প্রয়াণের (১৯৬৮ - ১৪ই মে)পর প্রয়াত ডাক্তার সুশীল ভট্টাচার্য, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সর্বশ্রী হেমেন মজুমদার, প্রভাত ভট্টাচার্য, নরোত্তম হালদার, কৃষ্ণকালী মণ্ডল প্রভৃতি অনেকেই যাঁরা তাঁর সহকারী, সহযোগী বা অনুসারী ছিলেন তাঁরা কালিদাস দত্তের প্রত্নানুসন্ধান ধারাটিকে বজায় রাখতে আজও নিরলসভাবে সক্রিয় রয়েছেন।

অন্যদিকে ষাটের দশক থেকে আজ পর্যন্ত জেলায় এবং জেলার বাইরের অনেক লোক কালিদাস দত্ত অনুসৃত পথে বহু প্রত্নস্থল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে বহুশত প্রত্নসামগ্রী সংগ্রহ

করতে থাকে। জনান্তিকে বলে রাখি এদের অনেকেই মীন শিকারের মত প্রত্নবস্তু শিকারকে জীবিকা (চোরা কারবারীর মত) হিসাবে বেছে নিয়েছে এবং অর্থ লালসায় ইতিহাসের অমূল্য সাক্ষ্য এইসব প্রত্নসম্পদকে দেশের বাইরে চোরা পাচারে সাহায্য করে চলেছে। এদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রত্নব্যবসায়ীগণ, ছদ্ম-প্রত্নগবেষকগণ, শিক্ষিতব্যক্তি ও অধ্যপকগণ এবং সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ।

কালিদাস দত্ত চল্লিশটির বেশী প্রত্নস্থলের কথা জানিয়েছিলেন। বর্তমানে ছোট বড় মিলিয়ে এই সংখ্যা প্রায় ১১০—১১৫টি। অনেকগুলিই উন্নত প্রত্নসম্পদে ভরা। অনেকগুলিতেই আবার সামান্য কয়েকটি মাত্র প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। যে কথাটা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন তা হল, দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রায় ২৫ টি সংগ্রহশালায় কম করে হলেও প্রায় কুড়ি হাজার প্রত্নবস্তু সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়াও অনেক প্রত্নস্থল এবং প্রত্নসংগ্রাহকের নাম এখনও অজ্ঞাত রয়েছে। কয়েকটি মাত্র ছাড়া বেশীরভাগ প্রত্নসংগ্রহশালায় বা সংগ্রাহকদের কাছে প্রত্নবস্তুর কোন তালিকা নেই। আবার এমন সংগ্রহশালা আছে যেখানে এক একসময় গেলে এক একরকম প্রত্নবস্তু দেখা যায়, আগের প্রত্নবস্তুগুলির ঠিকানা পাওয়া যায় না।

সংগ্রহ ঃ

মনে রাখা দরকার জেলার কোন প্রত্নস্থলে বৈজ্ঞানিকভাবে পূর্ণাঙ্গ খনন কার্য চালানো হয়নি। নদীতে মাছ ধরবার সময়, নদীর জোয়ার-ভাঁটায়, নদীতীর-ভাঙ্গনে, সমুদ্র তীরবর্তী ভাঙ্গনে (গোবর্দ্ধনপুর, সাগর), বৃষ্টির জলে মাটি ক্ষয়ে, মাটি কাটার সময়, চাষের জমি খননে (তিলপী), পুকুরকাটা বা পুকুর সংস্কারের সময়, গৃহ বা মন্দির ভিত্তির প্রয়োজনে মাটি খোঁড়ার সময়, জলের পাইপ বসানোর সময় (বিড়াল গ্রাম) এ জেলার বেশীরভাগ প্রত্নবস্তু সংগৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে সামান্য কয়েকটি মাত্র প্রত্নক্ষেত্রে Observation অথবা Sample Digging হয়েছে। এগুলির মধ্যে বোড়াল, হরিনারায়ণপুর, আবদালপুর(দেউলপোতা), মন্দিরতলা, মাহিনগর, আটঘরা ইত্যাদি প্রত্নস্থলগুলি পড়ে। কয়েক বছর পূর্বে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে আটঘরা ও বাইশহাটা নামক দুটি বিখ্যাত প্রত্নস্থলে Sample Digging হয়েছে। আমরা সরকারী সংস্থাগুলিতে যোগাযোগ রেখে চলেছি, যাতে তিলপী এবং গোবর্দ্ধনপুরে Survey করে বৈজ্ঞানিক উৎখননের ব্যবস্থা করা যায়। কেননা আমাদের সম্প্রতি আবিষ্কৃত চারটি উন্নত মানের অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী প্রত্নসম্পদে ভরা জনবসতির দুটি হল এই তিলপী (জয়নগর থানার পিয়ালী নদীতটে) এবং গোবর্দ্ধনপুর (পাথরপ্রতিমা থানার জি. প্লট)। অন্য দুটি রত্নগর্ভা প্রত্নস্থল হল উত্তরসুরেন্দ্রগঞ্জের তটেরবাজার (পাথর প্রতিমা থানার জি-প্লট) এবং বিড়াল-খামনগর গ্রামের হেঁদো (ছোট) পুকুর ও জলের পাইপ লাইন বসানোর দীঘির স্নান অঞ্চল (বারুইপুর থানা)। এখানে "আবিষ্কার" কথাটি আপেক্ষিক। কেননা প্রত্নস্থল কেউ আবিষ্কার করেননা—এগুলি থাকে, ছিল। এমনকি স্থানীয় লোকেরা কোন কোন ক্ষেত্রে (তিলপী, উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ) বুঝতে পারত যে এখানে প্রাচীন জনবসতি হয়ত ছিল। স্থানীয়ভাবে কিছু কিছু উন্নতমানের প্রত্নবস্তুও সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু লোকসমক্ষে আসেনি তথা বিশেষজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কাছে আসেনি বা অজ্ঞাত ছিল। এটাই আমরা জনসমক্ষে আনার চেষ্টা করেছি, বিশেষজ্ঞদের জানিয়েছি।

সংগ্রাহকগণ ঃ

বর্তমান সময়ে প্রত্নবস্তু সংগ্রহের কাজে যারা নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, বিমল সাহু, বিশ্বজিৎ সাহু, পুলিন মণ্ডল, সঞ্জয় ঘোষ, রবীন হালদার, দামোদর হালদার, দীনবন্ধু নস্কর, লক্ষ্মীনাথ ভট্টাচার্য, ব্রজকিশোর ঘোষ, সনৎ কুমার মাইতি, চিত্তরঞ্জন দাস, অনিল খাঁড়া, নির্মলেন্দু মুখার্জ্জী, অমলেন্দু ব্যনার্জী, পরিমল চক্রবর্তী, দেবীশঙ্কর মিদ্যা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এঁদের অনেকেরই ভাল সংগ্রহশালা আছে। কেউ কেউ গবেষণার কাজও করেন, লেখালিখিও করেন। সংগ্রহে, সংগ্রহশালার কাজে, গবেষণায় ও লেখালিখিতে আবদ্ধ রেখেছেন হেমেন মজুমদার, প্রভাত ভট্টাচার্য, নরোত্তম হালদার, অনিল খাঁড়া, জগন্নাথ মাইতি, সন্তোষ কুমার বর্মন, দেবীশঙ্কর মিদ্যা, সুভাষ চন্দ্র মাইতি, সঞ্জয় ঘোষ, নির্মলেন্দু মুখার্জ্জী, অমলেন্দু ব্যানার্জী, সুকুমার মিস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বর্তমান প্রাবন্ধিকও সামান্য কিছু লেখালিখি করে থাকেন। গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা নরোত্তম হালদারের সঙ্গে যুক্ত সন্তোষ বর্মন সম্প্রতি কাকদ্বীপ মহাকুমার প্রত্নস্থলগুলি চিহ্নিত করার কাজে নিযুক্ত। ভ্রাম্যমান প্রত্নপ্রদর্শন করে চলেছেন কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা (ভ্রাম্যমান)র সম্পাদক প্রভাত ভট্টাচার্য।

উল্লেখযোগ্য প্রত্নসংগ্রাহক ও প্রত্ননিদর্শন সংগ্রহশালাগুলি হল সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা, বারুইপুর; কালিদাস দত্ত সংগ্রহশালা, রামনগর; প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা, জয়নগর; ডঃ তুলসীচরণ ভট্টাচার্য সংগ্রহশালা, দঃ বিষ্ণুপুর; খাড়ি-ছত্রভোগ সংগ্রহশালা; সুন্দরবন প্রত্নগবেষণাকেন্দ্র, কাশিনগর; বিমল সাহুর সংগ্রহশালা, গোবর্দ্ধনপুর; জি প্লট বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ; গঙ্গারিডি বিষয়ে গবেষণায় নিরত কাকদ্বীপ গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্রের নরোত্তম হালদার এবং প্রত্নইতিহাস সংস্কৃতি চর্চায় 'প্রত্নইতিহাস সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্রের' (অনিমা ভবন, ধোপাগাছি, বারুইপুর) বর্তমান প্রাবন্ধিক কৃষ্ণকালী মণ্ডল প্রমুখ। নির্মলেন্দু মুখার্জী এবং অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্নগবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আঞ্চলিক প্রত্ন- ইতিহাস রচনায় বেহালার সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এছাড়া বৃহত্তর গড়িয়ার ইতিহাস, ক্যানিং-এর আধুনিক ইতিহাস, সাগরের ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন যথাক্রমে সুধাংশু মুখার্জী, গোকুল চন্দ্র দাস ও জগন্নাথ মাইতি প্রমুখ আরও অনেকে।

যেহেতু এ জেলার লিখিত কোন ইতিহাস নেই ,প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হবে। প্রত্ন-বস্তুগুলির যুগ বিচার করে ইতিহাস রচনার কাজে তাদের সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড় করানো খুব সহজ কাজ নয়। এ-বিষয়ে সাধারণ লোক তো দূরের কথা পণ্ডিতদের মধ্যেই প্রচণ্ড মতবিরোধ আছে।

ইতিহাসের উপাদান ঃ

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা পণ্ডিতদের কথা না বলে শুধু দু'একটি নতুন প্রত্নস্থলের উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চাই যে কি কি জাতীয় প্রত্নসামগ্রী এখানে পাওয়া যাচ্ছে এবং তাদের প্রাপ্তি আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসকে কিভাবে আলোকিত করতে পারে।

পাথরপ্রতিমার জি-প্লটের গোবর্দ্ধনপুরের সমুদ্রতীর সংলগ্ন এলাকার প্রত্নস্থলটিতে পাওয়া গেছে স্থলচর ও জলচর প্রাণীর দাঁত, শিং, হাড় ইত্যাদির অনেকগুলিই অর্ধ ফসিলীভূত। কিছু কিছু তার একটু বেশী বা কম। হাতি, গণ্ডার, বাঘ, মহিষ, হরিণ ইত্যাদির হাড় আছে। আছে

সামুদ্রিক কাঁকড়ার ফসিলীভূত বড় দাড়া, কুমীর, শুশুক এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর অস্থি ইত্যাদি। পাওয়া গেছে মাথার খুলি সহ হাতির দুটি বৃহৎ দাঁত—অর্ধ ফসিলীভূত। পাওয়া গেছে নানা ধরনের প্রস্তরখণ্ড ও প্রস্তরায়ুধ। এক আধটি নয়—অনেক। হাড় এবং হরিণের শিঙের অস্ত্রাদিও আছে। আছে মাছের কাঁটা ও হাড়ের অস্ত্র। হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা এবং মন্দিরতলা থেকে এরূপ অসংখ্য পাথরের অস্ত্রাদি এবং অস্থিআয়ুধ ইত্যাদি ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। পাথরগুলির বেশীর ভাগই সম্ভবত মেদিনীপুর, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের। কিছু কিছু প্রস্তর নদীবাহিত। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি ব্যবহৃত প্রস্তরায়ুধ বারুইপুরের মল্লিকপুর, হরিহরপুরে এবং সোনারপুরের দক্ষিণ গোবিন্দপুরের হেঁদো পুকুর থেকে পাওয়া গেছে। এই প্রস্তরায়ুধগুলি সবই ব্যবহৃত। তাহলে এই ব্যবহারকারী মানুষগুলি কোথাকার! যদি বলি নব্যপ্রস্তরযুগের আদিম মানুষ খাদ্যের সন্ধানে (food gathering) সমুদ্র উপকূল ধরে সুবর্ণরেখা, সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি নদী বেয়ে কাঠের ভেলা, নৌকায় করে বর্ষা ছাড়া অন্য ঋতুতে এ-অঞ্চলে পাড়ি দিত, লতাপাতা দিয়ে সাময়িক ঘর তৈরী করত বা জঙ্গলে, বৃক্ষোপরি অথবা খোলা আকাশের নীচে বা বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়ে কয়েক মাস কাটিয়ে দিত; আবার তারা স্বভূমিতে ফিরে যেত বর্ষায়, ঝড়-ঝঞ্ঝার দিনে, তাহলে কি খুব ভুল হবে? পাহাড় এবং পাহাড়ীগুহা ছাড়া আদিমানুষ, এমনকি নিওলিথিক যুগের মানুষ বাস করতে পারত না—পণ্ডিতদের এ-ধারণা বোধ হয় সর্বত্র সঠিক নয়। প্রত্নবস্তুগুলির বিচারে আমরা বলতে চাই যে এই জেলার কোন কোন অঞ্চলের মাটিতে সাময়িকভাবে হলেও অন্তত নিওলিথিক যুগের মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য — যা এখানে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলে রাখি যে ভক্ষিত বন্য জীবজন্তুগুলির গড় বয়স পাঁচ হাজার বছর থেকে এগারো হাজার বছরের কম নয়।

এর পরবর্তী যুগটাও এখানে স্পষ্ট। তখন মানুষ লৌহের ব্যবহার শিখেছে। শক্ত ভারি লৌহাস্ত্র দিয়ে হরিণের শিঙের মত অতিশক্ত জিনিষ কোপ দিয়ে কাটার চিহ্ন স্পষ্ট। শিংগুলিকে কেটে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। পাওয়া গেছে মরিচাধরা কয়েকটি লৌহাস্ত্রও। গোবর্দ্ধনপুরের এই একই প্রত্নস্থলের অন্য স্তর থেকে পাওয়া গেছে-প্রচুর বসতি চিহ্ন, ইটের গাঁথুনি ইত্যাদি।

সমুদ্রস্রোতের তীব্রতায় এবং জোয়ার ভাঁটায় ক্ষয় হয়ে নীচেকার শক্ত কালোমাটি বেরিয়ে পড়েছে। বিভিন্ন স্তরবিন্যাস দেখা যাচ্ছে। ইটের গৃহভিত্তি বা ভগ্নদেবালয় তৈরীর ইটগুলিও খুব চওড়া এবং পাতলা। ইটগুলির সাইজ হল ৩২ সে.মি. x ১৯.৫ সে.মি. x ৫ সে.মি.।

গোবর্দ্ধনপুরের সমুদ্রমোহনায় এই ভাঙনে পাওয়া গেছে পোড়া মাটির প্রচুর বীডস্। স্টোন বীড্স সংগৃহীত হয়নি। আদি যুগের উচ্চ স্কন্ধ ব্রাহ্মণী বৃষ যার মুখ সূচালো, সূচালো আকৃতি সরু সরু পা, চোখের ইঙ্গিত আছে - নানাভাবে, কোন কোনটার শিং আছে ইত্যাদি। ইতিপূর্বে হরিনারায়ণপুর, তাম্রলিপ্ত, আটঘরা, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থানে এরূপ উচ্চস্কন্ধ বৃষ দেখা গেছে এবং ঐগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলে আনুমিত। পাওয়া গেছে একই ধরনের হাতি, ঘোড়া

ইত্যাদি অনেক এনিম্যাল ফিগার। বানর, বাঁশী বাজানো বানর, ক্রোধান্বিত বৃষ-শূকরের মত মুখ বৃষ ইত্যাদি সংগৃহীত হয়েছে অনেক। সবচেয়ে বেশী পাওয়া গেছে ত্রিচূড় তথা ত্রিবেণীযুক্ত (Three Knot) দেবীমূর্তি বা মাতৃকামূর্তি ও যক্ষিণী। সমপদে দাঁড়ানো, বরদমুদ্রায় (কিন্তু জৈন তীর্থঙ্করদের মত আজানুলম্বিত সোজাভাবে রাখা) দক্ষিণ হস্ত, বাম হস্তটি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কোমরের উপরে কণুই থেকে ভাঁজ করা, কখনো হাতে কিছু নেই, কখনো ঐ হাতে ধরা একটি পুত্র বা কন্যা শিশু, কখনো ঐ হাতে একটি গদা বা অস্ত্র, কিছু ধরা আছে লক্ষ্য করা যায়। মোটামুটি চার প্রকার যক্ষিণীর পরিচয় মেলে, দেবী, মাতৃকা মূর্তি এবং Warrior Goddess বা শক্তি মাতৃকা মূর্তি।

মূর্তিগুলির সবই এত ক্ষয়প্রাপ্ত যে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। আশ্চর্যের কথা ত্রি-বেণী যুক্ত এই মূর্তিগুলি গোবর্দ্ধনপুরেই পাওয়া গেল সবচেয়ে বেশী। সম্ভবত এখানে তৈরী হত অথবা বাণিজ্যের জন্য স্টোর করে রাখা হয়েছিল। দক্ষিণ চব্বিশপরগনাতেই এ- মূর্তি বেশী পাওয়া যায়। হরিনারায়ণপুর, আটঘরা, মন্দিরতলা ইত্যাদি স্থানে এ-মূর্তি পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ অন্যত্র পাওয়া এই জাতীয় প্রাচীন মূর্তিকে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের বলেছেন। পাওয়া গেছে অসংখ্য প্রকার পটারী, লিড, পূজা উপাচার, ধুনুচী, প্রদীপ, বাস্কেটপটারী, পবিত্র ঘট, কুম্ভ, মদ্যপাত্র ইত্যাদি। সবই প্রাচীন থেকে প্রাচীনতর যুগের; প্রাগৈতিহাসিক থেকে ঐতিহাসিক পর্যায়ের। মাথায় ত্রি- বেণী যুক্ত বুদ্ধমূর্তি এবং কয়েকটি সিমেটিক টাইপের উন্নতনাসা মুখমণ্ডল পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির এইসব মূর্তিগুলির নিম্নাংশে ভগ্ন। কয়েকটি পাতলা স্লেট পাথরের মিশরীয় আদলের মূর্তি (Curling Hair) – এক দিকে বা উভয়দিকে; এগুলি প্রধানত শুঙ্গ - কুষাণ শিল্প। পোড়ামাটির কিছু পুরুষ মূর্তির একদিকে (নীচে নেমে আসা) বা উভয়দিকে Curling Hair এর সুগভীর খোদাই লক্ষ্য করা যায় যা মৌর্য পরবর্তী বলে মনে হয়। হাতির হাড়ের খেলার ঘুঁটি, ইত্যাদি বহু প্রকার প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে। আর একটি বিশেষ বেদীর কথা লিখি। পোড়ামাটির এই বেদীটির সাইজ ১২.৫ সেমি. x ১০.৫ সেমি. x ৩.৬ সেমি.। এটির মধ্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। ডানদিক থেকে বামে স্পষ্ট করে সাজানো এই চিহ্নগুলি হল এক জোড়া পদ চিহ্ন, লাঙ্গল, গদা এবং চক্র আর পঞ্চম চিহ্ন মৎস্য; উপরের লাইনে চক্রের ঠিক মাথার কাছে মৎস্যের অবস্থান। বেদীর ডানদিকে ওপরে (পদ চিহ্নের মাথার উপরে) পূজাবেদীর জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা। আমাদের ধারণা এটি খৃঃ পূর্ব তৃতীয় - চতুর্থ শতাব্দীর (যখন চতুর্ব্যূহ বিষ্ণু পূজার রীতি প্রচলিত ছিল) পূর্বেকার পঞ্চ বিষ্ণুপূজার ধ্যানধারণার প্রতীক যুগ্মপদচিহ্নটি বাসুদেব বিষ্ণুর প্রতীক; লাঙ্গল বলদেব বা সংকর্ষণ বিষ্ণুর; গদা অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর; চক্র শাম্ব বিষ্ণুর; মৎস্য প্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর। প্রসঙ্গত বলে রাখি, সুন্দরবনের গোসাবার কাছে বন বিভাগের পাওয়া সূর্যমূর্তি, গুপ্ত যুগের মুদ্রা এবং একটি ছোট যুগ্মপদ চিহ্নবেদী পাওয়া গেছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকর্তা ডঃ গৌতম সেনগুপ্তের "worship of footprint — New Evidence From Ancient Bengal" নামক আসন্ন প্রকাশিতব্য প্রবন্ধটিতে এবিষয়ে বিস্তৃত জানা যাবে। অনেক প্রকার প্রত্ননিদর্শনই এখানে পাওয়া গেছে। বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে সম্প্রতি সাপখালি থেকে একটি বিষ্ণু পাদপদ্মের প্রস্তর বেদী পাওয়া গেছে। বোড়ালে এবং ধাপাতেও এরূপ প্রস্তরপদ বেদী পাওয়া গেছে।

উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জের জি-প্লট বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে রয়েছে নিকটস্থ নদী তটে পাওয়া গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা, শশাঙ্কের (খৃঃ৭ম) স্বর্ণ ও রৌপ মুদ্রা, ড্রাগন জাতীয় সিংহ, হাতি, ময়ূর ইত্যাদি আঁকা চকলেট কালারে রং করা একটা (চাদুরে কলসীর মত) পটারী, কিছু ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠ। এই স্কুলের পিছনের পুকুরটি সংস্কারের সময় (২০০০ খৃঃ) পাওয়া গেছে কালো ব্যসাল্ট পাথরের হরিহর মূর্তি, দশাবতার বিষ্ণুমূর্তি, অষ্টভুজ গণেশ মূর্তি, একশত আট শিবলিঙ্গ ফলক, বরাহ অবতার ও আরও পাঁচ ছয়টি পাথরের মূর্তি। সবই ভাঙা। নিকটস্থ তটের বাজারের উচ্চভূমিতে পাওয়া গেছে বেশ কয়েকটি মন্দির ও প্রাসাদের ভগ্নভিত্তি। একটি প্রচীন শিবমন্দিরের ভগ্নাংশ, শিব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি। কয়েকটি মোটামোটা পাথরের বীম, দ্বারবাজু, লিন্টাল ইত্যাদি পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে প্রচুর ইট। লিন্টালের একটিতে জোড়-হস্তে গরুড় মূর্তি আছে। এখানে বিষ্ণুমন্দির, শিব মন্দির ইত্যাদি যে ছিল তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। মূর্তি সাদৃশ্য দেখে এগুলি পালযুগের শিল্প বলে দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয়। এখানকার ইটগুলিও বেশ বড় ১২ ইঞ্চি x ১০ ইঞ্চি x ২ ইঞ্চি এবং ১০ ইঞ্চি x ১০ ইঞ্চি x ২ ইঞ্চি।

তিলপী জয়নগর থানার পিয়ালী নদী তীরবর্তী গ্রাম। সমগ্র গ্রামের বসতি এলাকা এমন কি চাষের মাঠগুলিও প্রত্নক্ষেত্র। বিশাল বিস্তৃত অঞ্চল। গ্রামের সব পুকুর ও জলাশয় প্রত্ন সম্পদে ভরা। পাকা রাস্তা, গৃহের ভিত্তি, ছাদ, কি নেই! মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ পটারী, ঐরকম লাল পটারী, মেষগাড়ী, খেলনা, অলংকৃত সজ্জিত সব যক্ষ - যক্ষিণী, অপ্সরা, দেবী, মাতৃকামূর্তি। চন্দ্রকেতুগড়ের মত সজ্জিত যক্ষিণী, একচূড়, পঞ্চচূড়া ও দশচূড় যক্ষিণী সাজে সজ্জায় অপরূপা; কাঠের বীম, বেলেপাথরের গড়েয়া বা চৌকী, বহুতর পাটারী, খেলনা, দেবদেবী, পূজা উপাচার ইত্যাদি পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে কয়েকশত ধূসর বর্ণের হাতি; উত্তোলিত শুঁড়। বড় বড় জলের পাত্র বা ষ্টোর করা মদ্য পাত্রের ঢাকনির উপর (বা দুই স্তরে) শুড় তুলে আহ্বান জানাচ্ছে তিনটি হাতি — নীচের দুদিকে দুটি, উপরে একটি। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি করে তিনটি গোল পদ্ম ধরা আছে শুড়ে করে। ঢাকনির সামনেও একটা দীর্ঘনাল যুক্ত পদ্ম দেখা যায়। এ-ছাড়া রয়েছে নানা ভঙ্গিতে ধূসর রঙের কারুকার্য করা অজস্র হস্তীমূর্তি। গলালম্বা ও নল লাগানো নানান ধরনের পটারী, হাঁড়ি কুঁড়ি ইত্যাদি। বানর ও অন্যান্য জীবজন্তু ফলক ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। ইটের সাইজ এখানে ১৪ ইঞ্চি x ৮.৫ ইঞ্চি x ২ ইঞ্চি, ১২ ইঞ্চি x ১০ ইঞ্চি x ১.৫ ইঞ্চি ইত্যাদি। কুষাণ - শুঙ্গ যুগের লক্ষণ যুক্ত প্রত্ন নিদর্শনই বেশী এখানে। মৌর্য থেকে পাল-সেন যুগ পর্যন্ত স্পষ্ট চিহ্ন আছে।

বারুইপুর থানার বিড়াল - ধামনগর গ্রামটির বারুইপুর - আমতলা রাস্তায় (বারুইপুর থেকে প্রায় ২ কিমি) রাস্তার ধারে — দীঘিরসান পেরিয়ে উত্তর দিকে একটা পুকুর (ছোট হেঁদো), সংলগ্ন অনিল মণ্ডলের পেয়ারা বাগান - সবই এই প্রত্নস্থলের অধীন। পুকুরের পাড়ে, তলদেশে প্রচুর পটারী - বিশেষ ধরনের পটারী, মার্কড্ পটারী, স্ট্যাম্পড্ পটারী, লাল ও ধূসর রঙের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। রয়েছ বড় বড় গৃহ ভিত্তি। ইটের সাইজ ৯.৫ ইঞ্চি x ৮ ইঞ্চি x ২ ইঞ্চি। পূজার ঘট,বাটী, পিলসূজ, প্রদীপ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। ধূসর

পটারী, অতি মিহি মসৃণ ধূসর পটারী, ভিতরে সুন্দর কোটিং দেওয়া পাতলা পটারী, পিছনে খাঁজ করা ছাপ দেওয়া হাঁড়ি, তিজেল ইত্যাদি। লাল রঙের কাঁখিতে স্ট্যাম্পমারা পটারী - হাঁড়ি, ধূসর রঙের প্লেট, ঢাকনি, বাটী, লাল রঙের বাটী অসংখ্য পাওয়া গেছে। কাঁচা মাটির রৌদ্রে পোড়ানো হাঁড়ির নিদর্শনও আছে। ছোট শিবমূর্তি, মাটির — পুতুল ইত্যাদি লক্ষ্য করা গেছে। কুষাণ-শুঙ্গ থেকে পাল-সেন যুগের চিহ্ন রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। প্রায় ৮-৯ ফুট নীচে লোহার কোদালের একটি টুকরোও এখানে পাওয়া গেছে। উচ্চভূমির এই অঞ্চলটি বারুইপুরের আর একটি নতুন প্রত্নস্থল।

শেষ কথা ঃ

আমাদের ব্যাপক প্রত্নস্থল-ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাত্র দু'একটির সামান্য বর্ণনা দিয়েই শেষ করতে হল। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রত্নস্থল অনুসন্ধানের ধারাটি বর্তমানে যে পরিপুষ্ট এবং অনেক নামহীন উৎসাহী মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের প্রচেষ্টা হোক এই ধারায়যুক্ত মানুষদের সহযোগিতা করা, তাদের প্রত্ন অনুসন্ধানকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া। তাহলেই মাত্র ইতিহাসের উপকরণগুলি আহৃত হবে। এই অমূল্য প্রত্ন - সম্পদগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করা এবং অপহরণ ও অর্থ লালসায় পাচারবোধ করা আশু জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করি।

— আসন্ন প্রকাশ — গ্রামোন্নয়ন কথা

***

গোবর্দ্ধনপুর প্রত্নস্থলে প্রত্নানুসন্ধানীদলে ...কারসহ ...রোত্তম হালদার। ...ন্তোষ বর্মন ও ...শ্বজিত সাহু।

গোবর্দ্ধনপুর প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত অসংখ্য ত্রিচূড় দেবীমূর্তি মাতৃকা মূর্তি ও যক্ষিণীমূর্তি

'কপিলমুনি' ঃ একটি বুদ্ধমূর্তি

প্রত্নকথা ঃ

সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাই একটি প্রত্নমিউজিয়াম। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যুগের প্রচুর প্রত্ননিদর্শন জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যে কোন প্রত্নানুসন্ধানী জেলার যেকোন অংশে ক্ষেত্রানুসন্ধানে গেলেই কোনো না কোনো সমৃদ্ধ প্রত্ননিদর্শন চোখে পড়বেই। আদিগঙ্গা, সরস্বতী-হুগলি, পিয়ালি, বিদ্যাধরী, মাতলার মত নদীতীর বরাবর অনুসন্ধান করলেই প্রাচীন জনপদ, নগরী, উন্নতগ্রাম, লৌকিক ও আদিবাসী সভ্যতা, দেবদেবীর মূর্তি, পটারি, টেরাকোটা, বিডস্ ছাড়াও পাওয়া যাবে ছোটো-বড়ো নানা ধরনের প্রস্তরনির্মিত ভাগবতীয় মূর্তি যেমন বিষ্ণুমূর্তি, বিষ্ণুপাদপদ্ম, পঞ্চবিষ্ণুপট্ট (পোড়ামাটির); শিব লিঙ্গ, চতুর্মুখ শিব, দেবীমুখ শিবলিঙ্গ, চতুঃশক্তি শিব, গণেশ, অষ্টভুজ নৃত্যরত গণেশ, একশত আট শিবলিঙ্গ ফলক; বারাহি, যমী, অনন্তশয়ান বিষ্ণু, পার্শ্বনাথ, ঋষভনাথ; প্রমুখ তীর্থঙ্করের মূর্তি; ত্রিপুরেশ্বরী, পাটেশ্বরী, গঙ্গামূর্তি, কপিলমুনি, গঙ্গা, ভগীরথ, সগর রাজার মূর্তি; সূর্যমূর্তি, উমামহেশ্বর মূর্তি, হরিহর মূর্তি, লোকেশ্বর মূর্তি, মঞ্জুশ্রী মূর্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। হিন্দু, জৈন বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রচুর নিদর্শন এ-সব অঞ্চলে রয়েছে। রয়েছে কালিকা, চণ্ডিকা, বিশালাক্ষী, ইত্যাদি হিন্দু এবং মহাযানী দেবী মূর্তিও। একটি পোড়ামাটির পর্ণশবরী মূর্তিও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পোড়ামাটির মাতৃকামূর্তি, দেবীমূর্তি, যক্ষিণী মূর্তি, যোদ্ধারমণী মূর্তি, আয়না সহ প্রসাধনরতা নারীমূর্তি, বেণীবদ্ধ ত্রিচুড় যক্ষিণী ও মাতৃকা মূর্তি, পঞ্চকাঁটাযুক্ত অথবা দশকাঁটাযুক্ত (পঞ্চচূড় / দশচূড়) যক্ষিণী, প্রচুর হস্তী মূর্তি, বৃষ, অশ্ব মূর্তি; বিশেষ করে উচ্চস্কন্ধ বৃষ, বানর, যক্ষমূর্তি, কুবের, মেষ ও মেষসহ খেলনা গাড়ি, মাটির জৈন তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধমূর্তি, নানা প্রকার মোটিভ ও খেলনা, মাটির সীল, প্রাচীন ইট, মন্দির ফলক, লিপি, মন্দির বীম, দ্বারবাজু (প্রস্তর নির্মিত); মন্দির শিল্প, টেরাকোটা ফলক, পদ্ম, ফুল, লতা পাতা, মুণ্ড, দ্বারপাল, ইত্যাদি এসব অঞ্চলে অপরিমেয়।

বুদ্ধমূর্তি ঃ

এতক্ষণ যেটা বলিনি তা হল প্রস্তরনির্মিত প্রচুর বুদ্ধমূর্তি। বসা মূর্তিই বেশি। ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় এবং পদ্মাসনে বসা মূর্তিতে এই মূর্তিগুলি রয়েছে। ব্রোঞ্জের অনেক জৈন – বৌদ্ধমূর্তি , পাওয়া গেছে। এরূপ একটি সুন্দর মূর্তি পাথরপ্রতিমা থেকে পাওয়া গেছে – যেটির সঙ্গে দশম শতাব্দীর জাভায় পাওয়া একটি বুদ্ধমূর্তির শিল্পগত দিক থেকে সমাঞ্জস্য রয়েছে। বলা হয় যে বাংলার শিল্পকলার ধাঁচেই সেটি তৈরি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যে বুদ্ধমূর্তিগুলি রয়েছে তার মধ্যে একটি শ্বেত পাথরের মূর্তি নিয়ে আজকের আলোচনা। মূর্তিটি রয়েছে জয়নগর থানার নিমপীঠ গ্রামের কপিলমুনি তলায়। লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে নেমে রিক্সা বা ভ্যানে নিমপীঠের কপিলমুনি তলায় যাওয়া যায়।

ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি প্রায় দশ ইঞ্চি উচ্চতার এই মূর্তিটি ধ্যানরত বুদ্ধের। পদ্মাসনে বসা, কোলের উপর যথারীতি হাতদুটির অবস্থান, চক্ষু প্রায় নিমীলিত। মুখ সামান্য নীচের দিকে। ভাবগম্ভীর করুণামূর্তি। অতীব প্রসন্নঝরা মুখ। কোনো জ্যোতির্বলয় নেই। একক বসামূর্তি। কিন্তু দেখেই চমকে উঠতে হবে যেন ধ্যানরত, করুণাবিগলিত এক জ্যোতির্ময় বিনম্র

মূর্তি দেবতা। জানিনা ইনি কতশত মানুষের হৃদয়স্পর্শী বাণীরূপে জীবনকে মুক্তির পথ দেখিয়ে আসছেন। মাথার মুকুট সহ কেশবিন্যাস – বেশ উঁচু করে, কিন্তু সামঞ্জস্য বিধান করে খোদিত। নিম্নে শতদল প্রস্ফুটিত পদ্মাসন। সুউন্নত নাসিকা, প্রশস্ত কপাল, মৃদু হাস্যময় সুস্পষ্ট দুটি ঠোঁট, একটু লম্বাটে কিন্তু ভরাট সুডৌল মুখমণ্ডল। মানানসই চিবুক। আগণ্ড – বিস্তৃত বৃহদাকৃতি কর্ণদ্বয়। চক্ষুদ্বয়ও সামঞ্জস্যগতভাবে স্পষ্ট ও বৃহৎ। কানের নিম্নাংশদুটি গণ্ড ছড়িয়ে নিম্নগামী। গলা ভরাট ও সুগঠিত। বৃহৎ স্কন্ধ থেকে বাহুদ্বয় নেমে এসে কোলের উপর একটি বিশেষ মুদ্রায় ন্যস্ত। প্রশস্ত বক্ষ বাম স্কন্ধ থেকে ঐ প্রশস্ত বক্ষের উপরে উত্তরীয় চিহ্ন। বক্ষের প্রশস্ততা ক্রমাগত শীর্ণ হয়ে নাভিদেশ পর্যন্ত এসে কটিদেশের কাছে আবার প্রশস্ততর হয়েছে। সুঠাম বসার ভঙ্গি। Basement টি শতদল পদ্মপাপড়ি হিসাবে নির্মিত। এক কথায় অপূর্বসুন্দর এই বুদ্ধমূর্তিটি। এই বুদ্ধ মূর্তিটি এখানে কপিলমুনি হিসাবে সশ্রদ্ধায় পূজিত হচ্ছে।

পূজা ঃ

কপিলমুনি তলায় একটি উঁচু ভিতের উপর সম্প্রতি কয়েকবছর আগে তৈরি ইষ্টক নির্মিত একটি অর্ধসমাপ্ত আয়তাকার গৃহে এই দেবমূর্তিটিকে রাখা হয়েছে। শরিকী বিবাদ এবং অন্যান্য কারণে গৃহটি প্রায় লিন্‌টাল পর্যন্ত তৈরি করে আর তৈরি হয়নি। আগে এই দেবমূর্তিটি নিকটস্থ রাস্তার ধারে খাড়ের ছাউনি দেওয়া একটি কাঁচা ঘরে (মাটির) রাখা ছিল। সেখানে লৌকিক গ্রামদেবী শীতলামায়ের থান ছিল। এখন সেই মাটির ঘরটি আর নেই পরিবর্তে অসমাপ্ত এই পাকা (ছাদহীন) থানে খোলা অবস্থায় শীতলাদেবী এবং এই বুদ্ধমূর্তি তথা কপিলমুনিকে রেখে শীতলামায়ের পূজার সঙ্গে একই দিনে পূজা করা হচ্ছে। শীতলা মায়ের এই বার্ষিক পূজা পৌষ মাসে হয়। আগে পৌষ সংক্রান্তিতে উভয় পূজা এই একই থানে হত। অন্যান্য পূজার মধ্যে মনসা পূজা, জন্মাষ্টমী এবং চৈত্রমাসে চৈতে গাজন, উত্তরীয়গ্রহণ ইত্যাদি হয়ে থাকে।

শীতলামায়ের পূজায় সাধারণ নৈবেদ্য, ফলমূল, চিনিবাতাসা, কদমা, ক্ষীরখণ্ডী, পাটালি, এবং সে সময় পাওয়া ফুল দিয়ে পূজা হয়। ছলন আসে প্রচুর। কিন্তু এসবের মধ্যেও কিছু লক্ষ্যণীয় ব্যতিক্রম উল্লেখ করার মতো। তাহল এই শীতলাপূজায় (এবং কপিল মুনির পূজায়) কোনো দিন কোনো বলি হয়নি। আর দ্বিতীয়ত কপিলমুনির পূজায় সাদা ফুল এবং শ্বেতপদ্মও দেওয়া হয়। এই দুইটি পূজা আচরণ (বলি নেই) এবং উপকরণ (সাদা ফুল ও পদ্ম ফুল) অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা শীতলাপূজায় সাধারণত বলি হয়। হাঁস (হাঁসা), পায়রা, পাঁঠা ইত্যাদি শীতলামায়ের কাছে বলি দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে বুক চিরে রক্ত দেওয়ার মানসিকও থাকে। প্রধানত হাম বসন্তের দেবী শীতলা। ডাব দেওয়া পূজার তাই বিশেষ উপকরণ। সবচেয়ে বড় কথা দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত (অর্থাৎ হাম-বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়) একটা নির্দিষ্ট দিনে শীতলার বার্ষিক পূজা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে পৌষ সংক্রান্তিতে নয়, শীতলা পূজা হয় পৌষমাসের একটি নির্দিষ্ট তিথিতে। বয়স্ক লোকমুখে শোনা গেল আগেকার দিনে পৌষ সংক্রান্তিতেই নাকি পূজা হত। সে যাই হোক রক্তদান বা বলি কোনো দিন হয়নি। কেন হয়নি সেটা নিশ্চয় বিচার্য বিষয়। কারণটা অবশ্যই শুভ্রতা এবং অহিংসার প্রতীক এই বুদ্ধমূর্তিটি।

কিংবদন্তী ঃ

এবার ক্ষেত্রানুসন্ধানে প্রাপ্ত কিছু কিংবদন্তীর দিকে তাকানো যাক। সেবায়েৎ মেনকা দাসের বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। অন্যান্য কয়েকজন প্রবীণ গ্রামবাসীর বয়স ৭৫ থেকে ৮৫রে মধ্যে। মেনকা দাসের শ্বশুর মশাই তাঁর অল্প বয়সে মাটি কাটার সময় নিকটস্থ পুকুর থেকে মূর্তিটি পেয়ে শীতলার থানে রেখে পূজার প্রচলন করেন কপিলমুনি হিসাবে। কেউ বলেছেন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কপিলমুনিকে জল থেকে তুলে শীতলা থানে রেখে পূজা করা হচ্ছে। কেউ বলেছেন জমিদার শিশির দত্ত (?) বুদ্ধদেবের এই মূর্তিটি বেনারস (সারনাথ?) থেকে কিনে এনে তাঁর গোলার ধারে রেখেছিলেন। সেটি একসময় খোয়া যায়। পরে বর্তমানের ঐ শীতলাতলার পুকুর থেকে স্থানীয় লোকেরা উদ্ধার করে শীতলাথানে রাখে এবং সেই থেকে কপিলমুনি নামে পূজিত হয়ে আসছেন। সেই থেকেই এই স্থানের নামটি (বলা যায় নির্দিষ্ট পাড়াটি) ঐ দেবতার নামে কপিলমুনিতলা হিসাবে পরিচিত হয়ে গেল। কেউ কেউ বললেন 'কপিলমুনিতলা' প্রায় পাঁচ পুরুষ আগে থেকে, অর্থাৎ কমবেশি দেড়শ বছর কিন্তু সেবায়েৎদের হিসাবে অনুযায়ী ঠাকুরের সেবায়েৎ মেনকা দাসের (৭০ বৎসর) শ্বশুর মশাই থেকে সেবাকার্য শুরু। তাহলে তা বড়োজোর একশ দশ পনেরো বছর হয়। অন্যদিকে পুণ্যার্থী দত্তরা যদি গয়া বা কাশী থেকে শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তি কেনেন তাহলে তা রাখবেন তাঁদের বসার ঘরে বা অন্য কোথাও কিন্তু গোলার ধারে বা ঠাকুর ঘরে হয়ত নয় – কেননা তিনি হিন্দু হওয়ায় হিন্দু পূজ্য দেবতাদের সঙ্গে বুদ্ধমূর্তির স্থান হওয়া সম্ভব নয় (অবশ্য ব্যতিক্রম আছে)। তাহলে সত্যিই কি তিনি এটি কিনে ছিলেন – না অন্য কোনো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নিজগৃহে রেখে আরাধনার জন্য সযত্নে সংগ্রহ করেছিলেন। কেননা দত্ত বাবুদের বুদ্ধমূর্তি অপসৃত হল – কিছুকালের মধ্যেই তা সামান্য দূরে একটি পুকুর থেকে পাওয়া গেল আর দত্তবাবুরা বা তাঁর ওয়ারিশগণ (জমিদারি প্রতাপ সত্ত্বেও) তা ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন না – বাস্তবে বোধ হয় তা সম্ভব নয়। কাজেই এটাও যে নিছক গল্পকথা তাতে সন্দেহ নেই। তবে সব জায়গায় গল্প যেমন থাকে এখানেও তাই – কপিলমুনি স্বপ্ন দেন। তার ফলে পুকুর থেকে দেবমূর্তি উদ্ধার এবং কপিলমুনি হিসাবে পূজা আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু একটা বিষয় বোঝা যাচ্ছে না – হঠাৎ বুদ্ধমূর্তিটি, পঞ্চানন, বিষ্ণু, অনন্তদেব না হয়ে কপিলমুনি হলেন কেন এবং কীভাবে। যে ধারণাটি মানুষের মনে আছে তা হল রাষ্ট্রবিপ্লব বা ধর্মবিপ্লবের সময় মূলদেবতা (এখানে বুদ্ধদেব) বনে জঙ্গলে, মাঠেঘাটে বা নদীখালে নিক্ষেপিত হত। পরবর্তীকালে যখন এইসব দেবমূর্তিকে পুকুর কাটা, মাটি কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদির কারণে উদ্ধার করা হত তখন মূর্তিগুলি তৎকালীন প্রচলিত ধর্মস্থানে বা কাছাকাছি কোথাও বা উদ্ধারকারীর গৃহে স্থান পেত। কিন্তু স্থান পেত বা স্বীকৃতি পেত প্রচলিত ধর্মীয় ধ্যানধারণার মধ্যেই – তাই স্বনামে নয় প্রচলিত ধর্ম ধারণার মধ্যেই অন্য কোনো অভিনব নামে পূজা পেত; অস্তিত্বের সঙ্কট কাটলেও নাম বিভ্রাট এইভাবেই ঘটত এবং পূজা পদ্ধতির পরিবর্তনও হত। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে দেবতাকে তা মেনে নিতে হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় এ রকম উদাহরণ ভূরি ভূরি রয়েছে। কাঁটাবেনিয়ার বিশালাক্ষী মন্দিরের পাশের ঘরে ঠাঁই পাওয়া কালো কষ্টিপাথরের প্রায় চারফুট উচ্চতার জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তিটি অনন্তদেব নামক হিন্দু দেবতায় রূপান্তরিত (কেবল নামে)

হয়ে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করছেন। কপিলমুনির মত জৈনতীর্থঙ্করা কোথাও 'ধর্মঠাকুর' হন, দক্ষিণ বারাশতের সেনপাড়ায় পার্শ্বনাথদেব (বেলে পাথরের) দেবী 'মা মনসা' নামে, বারুইপুরের বিদ্যাধরপুর গ্রামে কালোপাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণু 'ধর্মঠাকুর' নামে আত্মরক্ষা করে চলেছেন। একই ভাবে সাগরের প্রসাদপুরের কষ্টিপাথরের গঙ্গামূর্তি 'মা বিশালাক্ষী' নামে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই পূজা পাচ্ছেন। একইভাবে আমরা দেখি যে, নিমপীঠের এই বুদ্ধদেবের শ্বেত মর্মর প্রস্তরে নির্মিত মূর্তিটিও 'কপিল মুনির' মধ্যে আত্মরক্ষা করে চলেছেন। ০

আলোচ্য মূর্তিটি কোথাকার তা সঠিকভাবে জানার কোনো উপায় নেই। শিল্প কর্মটি কতকালের তারও সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে মূর্তিটির নির্মাণ স্থান যেখানেই হোক না কেন মূর্তিটির অপূর্ব গঠন, শিল্পবিকাশ, মুখমণ্ডলের সুনিপুণ ভঙ্গীমা, নিমীলিত চক্ষুদ্বয় এবং সম্প্রসারিত বৃহৎ কর্ণদ্বয় দেখলেই সারনাথের শিল্পকলা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মূর্তিটি অত প্রাচীন কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। আবার নানা দিক দিয়ে বিচার করে এবং কপিলমুনির কথা ইত্যাদি মনে রেখে বুদ্ধমূর্তিটি যে একেবারে অর্বাচীন নয় তা বোধহয় বলা চলে। কপিলমুনিতলার বুদ্ধমূর্তিটির বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। বলিহীন পূজা, সাদা ফুল ও পদ্মে পূজা বুদ্ধদেবেরই পূজা, এ কথাগুলোও মনে রাখা প্রয়োজন।

— ০ —

– 'জীবন জ্যোতি', শারদ, ২০০২
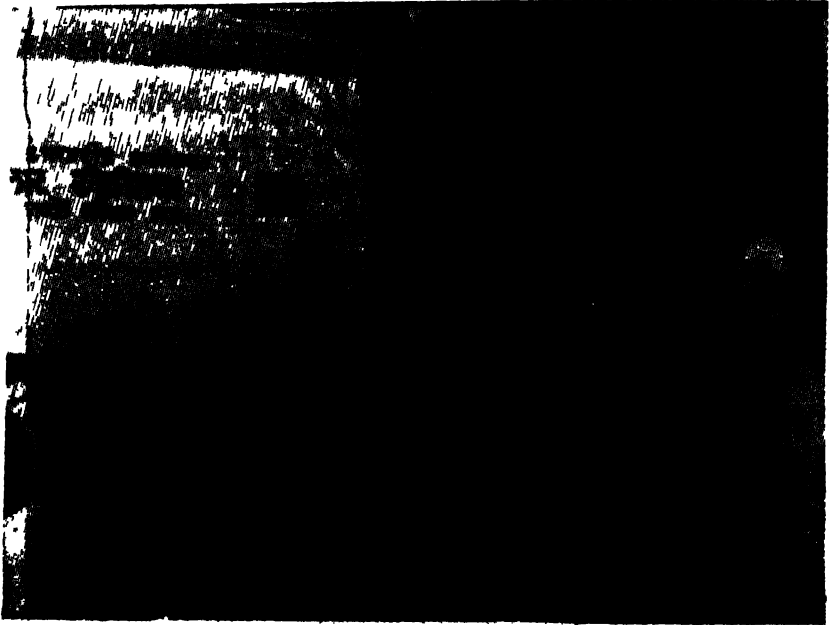
সোনার পাথরবাটি

অনুসন্ধান কথা ঃ

আমাদের প্রত্ন ইতিহাস সংস্কৃতি গবেষণাকেন্দ্রের তরফে সম্প্রতি জটা-কঙ্কণদীঘি অঞ্চলে যে সমীক্ষা কার্য চালনো হয় তাতে অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সঙ্গে একটি অত্যাশ্চর্য প্রত্ন নিদর্শন লক্ষ্য করা গেছে। সোনার পাথরবাটি। হ্যাঁ সত্য সত্যই সোনার পাথরবাটি। 'কাঁঠালের আমসত্ত্বের' মতো 'সোনার পাথরবাটি'। কোন অলীক কল্পনা নয়। তবে একথা ঠিক যে আমার দীর্ঘকালীন সমীক্ষায় কখনো এ জিনিস দেখিনি। বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় তো নয়ই।

গত ১৮ই জুন (২০০৩ সাল) প্রতিদিন পত্রিকায় জটার দেউলের সংলগ্ন অঞ্চলে সরকারী পাঁচিল দেওয়ার সময় কিছু খোঁড়াখুঁড়ির কাজ হয়েছিল এবং সেখানে ঢালাই ছাদ, স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তি ও অন্যান্য প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব শুনেই আর একবার ঐ অঞ্চল সমীক্ষায় যাই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই একটা হাস্যকর ভিত্তিহীন রিপোর্ট বলে আমাদের সমীক্ষায় ধরা পড়ে। জটার দেউল থেকে ফেরার পথে কঙ্কণ-দীঘির কয়েকটি প্রত্নস্থলে গিয়ে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রচুর মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী দেখার সুযোগ হয়। প্রাচীন পটারী-বিভিন্ন রংয়ের, ভিন্ন ভিন্ন পোড়, বিভিন্ন যুগের নিদর্শন এগুলি। টেরাকোটা মূর্তি, দেবদেবী, জীবজন্তু, মূল্যবান প্রস্তর নির্মিত পুঁতিদানা বা বিড্‌স্। প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত দেবদেবী, অলংকার। এইসব প্রত্নসামগ্রীর আকারগত সাদৃশ্য দেখে এবং এই প্রখ্যাত প্রত্নস্থলগুলিতে ও নিকটবর্তী নদীখাদ থেকে প্রাপ্ত বলে প্রত্ন নিদর্শনগুলি ঐতিহাসিক যুগের এবং শেষ ঐতিহাসিক যুগের বলে মনে করা যেতে পারে। গৃহভিত্তি, মন্দির-মঠ, প্রাসাদ, ধর্মীয় আচরণের দ্রব্যাদি ইত্যাদি থেকে স্পষ্ট যে, অঞ্চলটিতে একটির পর একটি উন্নত জনগোষ্ঠী বসবাস করত। তাদের শিল্পসভ্যতার, জীবনযাত্রার পরিস্কার নিদর্শন আবারও আমরা দেখলাম। ইতিপূর্বে কালিদাস দত্ত এখান থেকে প্রচুর প্রস্তরমূর্তি, মৃন্ময় মূর্তি, পটারী, মুদ্রা ইত্যাদি উদ্ধার করেছিলেন। পরবর্তীকালের কিছু সংগ্রহ রয়েছে খাড়ি-ছত্রভোগ সংগ্রহশালায়, কাশিনগর সংগ্রহ শালায়, জয়নগর-মজিলপুর এবং বিষ্ণুপুরের সংগ্রহশালাগুলিতে। এছাড়া বারুইপুর সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালায় অন্যান্য মূল্যবান সংগ্রহ ছাড়াও রয়েছে কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত বৃহদাকার একটি 'বারাহি দেবী মূর্তি'।

কঙ্কণদীঘি ঃ

কঙ্কণদীঘি গ্রামে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এ অঞ্চলের প্রত্নবস্তুর সংগ্রহ আছে। কয়েকটি বাড়িতে এইসব সংগ্রহ দেখার পর অন্য একটি বাড়িতে বেশ আগ্রহ করে নিয়ে গেল। সেখানেই দেখা মিলল এই 'সোনার পাথরবাটি'র। বাড়ির লোকেরা বলল 'মণিপাথর'। দূর থেকে দেখে এটিকে একটি সাধারণ পাথরবাটি বলে মনে হয়। সঠিক অর্থে এটি অবশ্য 'বাটি' নয়। এটি কানা উঁচু একটি পাথরের থালা (Plate)। এই পাথরের থালাটিতে প্রায় ৩ সেমি. উঁচু কানা

রয়েছে। ভিতরের ব্যাস প্রায় ২০ - ২২ সেমি.। এইরকম আরও তিনটি মণিপাথরের থালা সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি বেশ দাম দিয়ে কেউ কিনে নিয়ে গেছে। এই মণিপাথর থালাটির একদিকে একটু কানা ভাঙা এবং এটি পুজোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে এটিকে বিক্রি করেনি এরা। যদিও এখনও কোন কোন লোক এটিকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে চাইছে। মণিপাথর। মণি তথা রত্নখচিত পাথর। কিন্তু এই পাথরে কোন রত্ন নেই। সাধারণভাবে দেখে কিছু বোঝা যায় না কিন্তু পাথরটিকে একটু কাত করে আলোর দিকে রাখলে লম্বা লম্বা সোনালি রেখায় বিদ্যুৎচ্ছটা ফুটে উঠছে। সারা পাথর থালাটিতে বেশ কয়েকটি চওড়া সোনালি রেখা দেখা গেল। অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না যে, পাথরটির মধ্যেই সোনা রয়েছে। কোনরকম সেটিং করা সোনা নয়। পাথরে সোনা ছিল এরকম পাথর দিয়ে থালাটি তৈরি। অর্থাৎ থালা তৈরির জন্য যেখান থেকে মূল কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ডগুলি সংগৃহীত হয়েছিল সেই স্থানটি ছিল ঐ আকরিক স্বর্ণের উৎসস্থল। তবে এই থালাটি নাকি কঙ্কণদীঘিতে নয়, পাওয়া গেছে অন্য একটি গ্রামে মায়াহাউড়িতে। অবশ্য সেটিও একটি প্রত্নস্থল।

বড়াশি ঃ

শুধু এটিই নয়, দক্ষিণ চব্বিশপরগনা তথা সুন্দরবন অঞ্চল থেকে আরও দু-একটি সোনার পাথরবাটির সন্ধান পাওয়া গেছে। কালো পাথরের বড়ো একটি সোনার পাথরবাটি (থালা নয়) রয়েছে ঐ একই রায়দীঘি থানার বড়াশি নামক গ্রামে। বড়াশি বিখ্যাত তার প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দিরের জন্য। নিকটবর্তী ছত্রভোগের দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী এই বড়াশি শিবের শক্তি বলে কথিত। একটু দক্ষিণে রয়েছে চক্রতীর্থ। সবই মূল আদিগঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ পথের তীরে অবস্থিত। বিখ্যাত বিখ্যাত ধর্মস্থান ও তীর্থক্ষেত্র। এই বড়াশিতে মাটি কাটার সময় উক্ত সোনার পাথরবাটিটি পাওয়া যায়। রয়েছে এক বয়স্কা মহিলার গৃহে। পাথরের এই বাটিতে শুধু স্বর্ণরেখা বা স্বর্ণরেণুই নয় ছোট ছোট বিন্দুর মতো বেশ কিছু স্বর্ণখণ্ড রয়েছে। এর থেকে ইতিমধ্যেই কয়েকটি স্বর্ণখণ্ড তুলে নেওয়া হয়েছে সুক্ষ্ম ছুরি বা ঐ জাতীয় কিছুর ডগা দিয়ে। তবে সেই পাথরবাটিটি এখনও রয়েছে।

বসর ঃ

এই অঞ্চলেরই এক ব্যক্তি আর একটি সোনার পাথরের থালা সংগ্রহ করেছেন বলে জানা গেল কুলপীর 'বসর' গ্রামের এক ব্যক্তির নিকট থেকে। সেটিতেও স্বর্ণ টুকরো রয়েছে পাথরের মধ্যে। এরকম আরও কত সোনার পাথরবাটি বা সোনার পাথরের থালা দক্ষিণ চব্বিশপরগনার কত জায়গা থেকে পাওয়া গেছে বা এখনো অজ্ঞাত রয়ে গেছে তার ঠিক নেই। সবচেয়ে দুঃখের কথা এরকম সোনার পাথরবাটি ইতিপূর্বে আরও অনেক পাওয়া গেছে বলে জানা গেল কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই বেহাত হয়ে গেছে এবং চোরা পথে অন্য কোথাও কোন অন্ধকার জগতে চলে গেছে। ফলে মানুষের লোভের কাছে ইতিহাসের অকাট্য সাক্ষ্যগুলি গাঢ়তর অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। দেশ বঞ্চিত হচ্ছে তার অতীতের উজ্জ্বল ইতিহাস থেকে, মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে তার শেকড়ের সন্ধান জানা থেকে। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত সোনার পাথরবাটি নিয়ে আরও নিবিড় অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

উৎসচিন্তা ঃ

দক্ষিণ বাংলা বা কাছাকাছি অঞ্চলে এরকম কালোপাথর কোথাও নেই। উড়িষ্যা, বিহার, বিশেষ করে রাজমহল পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থলে এরকম পাহাড় আছে। আবার অন্যদিকে কারিগরী দক্ষতা থাকলে তবেই এ রকম ব্যবহার্য পাত্রাদি তৈরী করা সম্ভব। এইসব পাথরের বাটি ও থালা বিশেষ এক শ্রেণীর লোক তৈরী করে থাকে। এই সঙ্গে পূজায় ব্যবহৃত প্রস্তর-প্রদীপ ইত্যাদি দ্রব্যাদি সাধারণত পূজার কাজে ব্যবহৃত হত — এখনও হয়। খাবার থালা হিসাবেও ব্যবহার করা হ'ত। বাটিগুলিও তরল ঝোল, দুধ, দধি ইত্যাদি রাখা ও খাওয়ার পাত্র হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। তবে সব সময়ই এগুলি বেশ মহার্ঘ ছিল। অর্থাৎ ব্যবহারকারী লোকেরা ছিল ধর্মাচারী, বৃত্তশালী, সৌখিন। এরা কৃষিপ্রধান অঞ্চলে বাস করত, গৃহপালিত গরুমহিষের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত তরল পানীয়ে অভ্যস্ত ছিল। সম্ভবত ভাত এদের প্রধান খাদ্য ছিল (থালার আকৃতি ও প্রকৃতি দেখেই এই অনুমান করা যেতে পারে)। আর এইসব পাথরের থালা বাটি তৈরি করার মত কারিগরও ছিল। নৌপথে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে প্রস্তর আমদানি করতে হ'ত অথবা তৈরি করা দ্রব্য আমদানি হ'ত। অর্থাৎ নৌঘাটা, বন্দর, বাজার, উন্নত জনপদ, প্রাসাদ, অট্টালিকা, মঠ-মন্দির সবই কাছাকাছি ছিল। আর সেই যুগ ছিল যে যুগে এদের বহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। পাথরের থালা, বাটি, প্রদীপ ইত্যাদি তৈরি হত ঠিক কথা। কিন্তু সোনার পাথরবাটিতো সব পাথরে তৈরি হতনা। এজন্য চাই 'মণি পাথর'। অর্থাৎ স্বর্ণ আকরিক পাওয়া যায় এমন স্থানের খনি সংলগ্ন পাথর। আমরা জানি সুবর্ণরেখা সহ কয়েকটি নদীতে এবং আসাম অঞ্চলের কোন কোন নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। এসব নদীর উৎসস্থলের পাহাড়গুলি স্বর্ণ আকরিক যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। আর এইসব প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়ায় স্বভাবতই এগুলি অপ্রতুল এবং বহুমূল্যবান বলে বিবেচিত হত ক্রেতা-বিক্রেতার কাছে। আর ক্রেতা এরূপ একটি সোনার পাথরবাটি সংগ্রহ করায় সে নিজেকে সম্পদশীল, লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত ও সৌভাগ্যবান বলে ভাবত এবং তৃপ্তি অনুভব করত। সর্বকালেই এগুলি বিরল সৌভাগ্য-প্রতীক বলে বিবেচিত হত। স্বর্ণ আকরিক যুক্ত প্রস্তরখণ্ড বিরল হওয়ার জন্যই এই পাথরে তৈরী দ্রব্যাদি বিরল। তাই এর চাহিদা ছিল প্রচুর। কিন্তু এই অতি বিরল 'সোনার পাথরবাটি' (বা থালা) সাধারণ মানুষের কাছে 'আকাশ কুসুম' বা শুধুমাত্র কল্পনাই ছিল, যা ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই কল্পরাজ্যে বা UTOPIA তেই জন্ম নিয়েছে 'সোনার পাথরবাটি' নামক প্রবাদবাক্যটি — যার অর্থ অবাস্তব কল্পনা। কিন্তু সোনার কাটি রূপার কাঠি নিয়ে রূপকথার রাজকন্যার হদিস পাওয়ার মত 'সোনার পাথরবাটি' (থালা, প্রদীপ ইত্যাদি) যে ছিল তার প্রত্ন নিদর্শন পাই কঙ্কণদীঘি (মায়া হাউড়ি, বড়াশী) ইত্যাদি অঞ্চলে প্রাপ্ত এইসব সোনার পাথর থালা, পাথরবাটি ইত্যাদি প্রত্ন নিদর্শন থেকে।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ সোনার ব্যবহার জানত। খনিতে, নদীবালুকাতে ও সমুদ্রবেলায় স্বর্ণরেণু পাওয়া যেত — এখনও যায়। প্রস্তর অভ্যন্তরের আকরিকই এর উৎস। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পেরিপ্লাস গ্রন্থকার গঙ্গা মোহনায় স্বর্ণখনি আছে বলে উল্লেখ করেছেন এবং এখানে একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যেত যাকে 'কল্‌টিস্‌' বলা হ'ত। আমরা জানিনা, Geological Survey of India এ-সম্বন্ধে কি বলে।

আনুমানিক কাল ঃ

যাইহোক, আমরা যে সোনার পাথরবাটি ও পাথরের থালার কথা বললাম তার ব্যবহারিক কাল সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করা যেতে পারে। প্রথমেই বলা যায় যে, আমরা লক্ষ্য করেছি — এই অঞ্চলের যে গভীরতা থেকে মাটি খুঁড়ে এইসব সোনার পাথরবাটি ইত্যাদি পাওয়া গেছে সেখান থেকে মোটামুটি গুপ্ত, পাল ও সেনযুগের অন্যান্য প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে। গভীর[illegible]ও ভিন্নতা আছে। এছাড়া এই জাতীয় কালো পাথরের (স্বর্ণরেণু ছাড়া) নানা দেবদেবীর মূর্তিও যা পাওয়া গেছে তার সময়সসীমা মোটামুটি পাল ও সেন যুগের। তাছাড়া এ জাতীয় পাথরের ব্যাপক প্রচলন এসব অঞ্চলে পাল যুগের আগে ছিল না বলেই একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে। তবে এই জাতীয় পাথরের কয়েকটি সূর্যমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি ও বৌদ্ধ দেবদেবী মূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলি এই সময়কালের পূর্বে, কিন্তু সেগুলি কঙ্কণদীঘিতে পাওয়া যায়নি। সেকারণেই আমরা এই সোনার পাথরবাটি ও সোনার পাথরের থালাগুলিকে পাল-সেন যুগের প্রত্ন সামগ্রী বলে চিহ্নিত করতে চাই।

***

সোনার পাথরবাটি (থালা)
কঙ্কণদীঘি
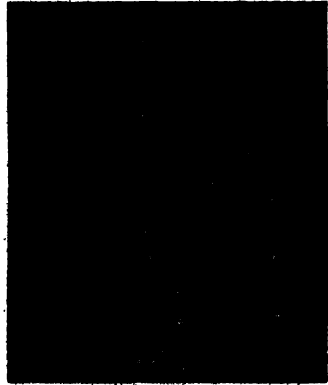
গোবর্দ্ধনপুরের প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত হাড়-দাঁতের ফসিল, টেরাকোটা বিষ্ণুবেদী, মাটির বিড়স্ দেবদেবী ও পটারী

পরিশিষ্ট

বিতর্কে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রত্নতত্ত্ব

কথারম্ভ ঃ

বেশ কিছুদিন আগে আমি আমার কনিষ্ঠপুত্র রাজর্ষিকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক অফিসারের ঘরে বসে কথা বলছিলাম। প্রসঙ্গত উঠে আসে জটার দেউলের কথা। জটারদেউলের প্রাচীনত্ব নিয়ে কথা বলতে বলতে আমি রাজা জয়ন্তচন্দ্রের জটার দেউলের প্রতিষ্ঠা লিপির উল্লেখ করি। এই উচ্চতম অফিসারটি এই প্রতিষ্ঠালিপিটির কথা শুধু উড়িয়েই দিলেন না, বললেন এরকম কোন লিপি ছিল না এবং তার কোন অস্তিত্বই নেই।

আমরা দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রত্ন-ইতিহাস চর্চায় এরকম অনীহার কথা প্রায়ই শুনে থাকি। এগুলির দু'একটির বিষয়ে আজ আলোচনা করি।

বিতর্কিত বিষয় ঃ

জটার দেউলের উপরোক্ত বিষয়টি ছাড়াও যে সব বিতর্কিত বিষয়গুলির সম্মুখীন আমরা হই তা হল ঃ ক) নিওলিথিক যুগের সংস্কৃতি বা কাজকর্মের কোন নিদর্শন নেই – বা ঐ সময়কার কোন বসতির পরিচয় পাওয়া যায় না; খ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের এক বিখ্যাত অধ্যাপকের মতে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রথম জনবসতি খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে। কয়েক মাস পরে তিনি মত পাল্টে বলেন যে এখানকার জনবসতি খৃঃপূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে; গ) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গঙ্গারিডি সভ্যতার কোন অস্তিত্বই নেই – কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও নেই। এছাড়াও আছে কিছু ব্যক্তিগত আক্রমণ। জাতিগত আক্রমণ ও কুৎসামূলক প্রচার – আছে সেগুলিকে যথাসম্ভব আমরা আলোচনার বাইরে রাখব। কিন্তু প্রত্ন-বস্তু পাচার একটা বড় সমস্যা। এ-বিষয়টি বর্তমান আমরা আলোচনার বাইরে রাখছি।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ

জটার দেউল – বর্তমান রায়দীঘি থানার জটা গ্রামে (গ্রাম ঃ পশ্চিম জটার দেউল প্লট নং ১১৬, জে.এল. নং ১২৮) দক্ষিণ বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন প্রায় ১০০ ফুট উঁচু এই যে রেখ দেউলটি রয়েছে এটির নির্মাণকাল নিয়ে একসময় কিছু মতভেদ ছিল। সঠিক তথ্য না পাওয়ার জন্যই এই বিভ্রান্তি। সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন ঃ এটি ৪০০ – ৫০০ শত বছরের প্রাচীন একটি বিজয়স্তম্ভ। সুতরাং এটি প্রতাপাদিত্যের আমলের বিজয় স্তম্ভ হওয়া বিচিত্র নয়। (যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৬-২০৭)। নলিনী ভট্টশালী ও কাশীনাথ দীক্ষিত মনে করেন ঃ এটি মোগল আমলে নির্মিত। পরে অবশ্য কাশীনাথ দীক্ষিত তাঁর মত সংশোধন করে এটিকে উড়িষ্যার প্রাচীন মন্দিরগুলির প্রায় সমসাময়িক বলেছেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান ১৯১৪ খৃঃ এটিকে তেমন পুরাতন নয় ও গুরুত্বহীন বলে মনে করেছেন। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী মন্দিরটিকে হিন্দুযুগের বলেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দিরটিকে পালযুগের বলেছেন। কালিদাস দত্ত পূর্বভারতে পালযুগের মন্দিরের গঠন পদ্ধতি

বিশ্লেষণ করে এই জটার দেউল মন্দিরটি যে পাল যুগেই তৈরী সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন। তার আরও কারণ হল — List of Ancient Monuments in Bengal - 1886 এ বলা হয়েছে যে এই মন্দিরের উত্তরে রাজা জয়ন্তচন্দ্রের একটি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়েছিল তাতে মন্দিরটি ৯৭৫ খৃঃ (৮৯৭ শাকাব্দে) রাজা জয়ন্তচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত বলা হয়েছে। মন্দিরটি হিন্দুমন্দির (জটাধারী শিবের) বলা হয়েছে। কিন্তু কালিদাসবাবু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। হান্টার সাহেব তাঁর স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্টে এই মন্দিরটিকে বৌদ্ধ মন্দির বলেছেন। সময়টি পাল রাজত্বের শেষ দিক হলেও পাল রাজারা মূলত বৌদ্ধ ছিলেন এবং দক্ষিণ চব্বিশপরগনা এসময় প্রধানত বৌদ্ধ (জৈন) সংস্কৃতির অনুরাগী ছিল (লেখকের 'দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় জৈন ও বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধ 'দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বিস্মৃত অধ্যায়', ১৯৯৯, পৃঃ ৫৩ - ৭২ এবং একই নামের প্রবন্ধ 'পশ্চিমবঙ্গ' — দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলা সংখ্যা, ১৪০৬, পৃঃ ১০৩ —১১০ দ্রষ্টব্য)। এই সময় পালবংশীয় রাজা প্রথম মহীপালকে (৯৭৭ - ১০২৭ খৃঃ) উত্তর রাঢ়ের যুদ্ধে এবং বঙ্গাল দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করে তামিলনাড়ুর প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সেনাদল (১০২৫ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল আগে)। চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্র (পিতা ত্রৈলক্যচন্দ্র) বাংলায় সম্ভবত পাল রাজাদের (তখন পাল বংশীয় রাজা দ্বিতীয় গোপাল ঃ ৯৫২ - ৯৭২ খৃঃ) মিত্র ও সামন্ত রাজা হিসাবে (৯২৫ - ৯৭৫ খৃঃ) রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র কল্যাণচন্দ্র (৯৭৫ - ১০০০ খৃঃ) পালবংশীয় দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক (৯৭২ - ৯৭৭ খৃঃ) ছিলেন।

অর্থাৎ আমরা যদি জয়ন্তচন্দ্রের তাম্রলিপি প্রাপ্তি স্বীকার করি তাহলে এই রাজা জয়ন্তচন্দ্র কে তা জানার মত তথ্য এখনো আমাদের হাতে নেই। এমনকি এই তাম্রলিপিটির যেমন কোন খোঁজ নেই তেমনি এটির কোন লিখিত পাঠও কোথাও প্রকাশিত হয়নি। কালিদাস দত্ত অনুমান করেছেন যে রাজা জয়ন্তচন্দ্রের অন্য কোন তাম্রলিপি না থাকলেও তিনি সম্ভবত বাংলার এই চন্দ্র বংশীয় কোন রাজা হবেন। হয়ত তিনি শ্রীচন্দ্র ও কল্যাণ চন্দ্রের মধ্যবর্তী স্বল্পকালীন কোন রাজা বা অধীনস্থ রাজা হবেন। কিন্তু সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি বলেই রাজা জয়ন্তচন্দ্রের তাম্রলিপি তথা জটার দেউলের প্রতিষ্ঠা লিপিকে এবং রাজা জয়ন্তচন্দ্রকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তাছাড়া লিপিটি সংস্কৃত অক্ষরে তৎকালীন ভাষায় লিখিত ছিল এবং এটি বিদগ্ধজনেরা সেসময় পাঠ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সময়কার পাল বংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৌদ্ধধর্ম থাকায় জয়ন্তচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত এই মন্দিরটি বৌদ্ধমন্দির হওয়াই স্বাভাবিক। একই শিল্পরীতিতে তৈরী বহুলাড়া ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দির দুটিও কিন্তু হিন্দুমন্দির নয় — জৈন মন্দির বলে জানা যায়। জটার এই মন্দিরটি বহুলাড়া ও সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের গঠন ও শিল্পরীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমসাময়িক ভুবনেশ্বর ও উড়িষ্যার মন্দিরগুলি গঠন শৈলীতে অবশ্য প্রায় একই রীতির।

সর্বোপরি আমরা সরকারী লিখিত রিপোর্টকে অস্বীকার করতে পারি না। Govt. of Bengal, Public Works Deptt. প্রকাশিত Revised List of Ancient Monuments in Bengal -- 1886' (Calcutta Bengal Secretariat Press) এ তৎকালীন Presidency Division এর (Dist. - 24 Parganas), Sub-Division, Diamond Harbour,

তালিকা নং 40 এ, জটার দেউলের কথা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে (পৃঃ ২২১)। ২২২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে; The Deputy Collector of Diamond Harbour reported in 1875 that 'a copper plate discovered in a place a little to the north of Jatar Deul fixes the date of its erection by Raja Jayanta Chandra in the year 897 of the Bengali Saka era, corresponding to A.D. 975. The bricks are remarkably fine, and the cement very adhesive. The copper plate was discovered at the clearing of the jungle by the grantee, Durga Pershad Chowdree. The inscription was in Sanskrit, and the date, as usual, was given in an enigma with the name of the founder."

মন্তব্য কলামে একটি Instruction দেওয়া হয়েছে Diamond Harbour এর Deputy Collector কে ঃ "The Copper plate or an impression of it should be sent to the Government Epigraphist." এই রিপোর্টটিকে নস্যাৎ করার কোন কারণ দেখি না।

(ক) নিওলিথিক যুগের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না ঃ

একথা ঠিক যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সার্বিক ইতিহাস অনুসন্ধানের কোন চেষ্টা বৈজ্ঞানিকভাবে করা হয়নি। কোন ব্যাপক বৈজ্ঞানিক প্রত্ন-অনুসন্ধান ও প্রত্ন উৎখনন হয়নি। হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, সাগরের মন্দিরতলা, আটঘরা ও বাইশহাটায় কিছু কিছু পরীক্ষামূলক কাজ করেছে, রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, A.S.I. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম। এইসব রিপোর্টের খুব সামান্যই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া Surface finds এর উপরও কিছু কিছু কাজ করেছে এইসব সংস্থাগুলি যেমন ঃ
আটঘরা বিষয়ে কিছু Report আছে IAR - 1956 - 57 পৃঃ ২৯ - ৩০, IAR - 1957 - 58 পৃঃ ৭০ ইত্যাদি। হরিনারায়ণপুর বিষয়ে প্রবন্ধ আছে ঃ IAR - 1956 - 57/81, 1957-58 ,70,72, 1958 - 59 / 76, 1959 - 60/78, 1960-61/68,1961-62/106, 1963-64/ 95,1964-65/70, 1971-72/88। এছাড়া ১৯৬০ থেকে এপর্যন্ত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, দেবপ্রসাদ ঘোষ, দিলীপ চক্রবর্তী, কালিদাস দত্ত প্রভৃতি অনেকেই এবিষয়ে লিখেছেন। দেউলপোতা নিয়েও ঐ একই সময়ে ঐ সব লেখক ও সংস্থাগুলি কাজ করেছে (IAR-1963-66,পরেশ দাশগুপ্তের Exploring Bengal's Past - 1966, এবং পরেশ দাশগুপ্তের প্রাগৈতিহাসিক চব্বিশপরগনা ইত্যাদি)। একই সময়ে সাগরের মন্দিরতলার উপরও কিছু কাজ লক্ষ্য করা যায়। আটঘরা, মাহিনগর, বিড়াল ও বাইশহাটায় অনুসন্ধান ও উৎখনন বিষয়ে কিছু তথ্যাদি রয়েছে সুধীন দে, দিলীপ চক্রবর্তী ও অন্যান্যদের Report এ। জটারদেউল, কঙ্কণদীঘি, মণিরতট, পাথরপ্রতিমা, সাগর, খাড়িছত্রভোগ বিষয়ে অনেকের কিছু কিছু Report আছে। কালিদাস দত্ত এ অঞ্চলের পুরাতত্ত্ব বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১৯২৮ সাল থেকে ইংরেজী-বাংলায় নানা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধ লিখে। কিন্তু এই তথ্যগুলির কোথাও খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর আগের তথ্যাদি পাওয়া যায় না।

একইভাবে বিদেশীয় লেখক যেমন মেগাস্থিনিস, টলেমি, প্লিনী, ডিওডেরাস, আরিয়ান,

সেলিনাস, পেরিপ্লাস গ্রন্থকার প্রভৃতির লেখা থেকে গঙ্গার মোহনা, গাঙ্গেয় বন্দর, গঙ্গারিডি রাজ্যের অবস্থান ও গঙ্গারিডি সভ্যতার কথা জানা গেলেও বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না – সেই খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্তই।

দেশীয় সাহিত্য ও পুরাণগুলি থেকে রামায়ণের যুগে সাগরের অবস্থিতি এবং কপিলমুনির পাতাল রাজ্যে আশ্রম স্থাপনের কথা জানা যায়। মহাভারতের সময় এ-অঞ্চলে শক্তিশালী অনার্য রাজারা বাস করত বলে জানা যায়।

কিন্তু প্রত্নপ্রস্তর যুগ বা নিওলিথিক যুগের কথা কিছু জানা যায় না। কালিদাস দত্ত হরিনারায়ণ – পুর ও দেউলপোতা থেকে বেশকিছু মসৃণ প্রস্তরায়ুধ উদ্ধার করে পরেশ দাশগুপ্ত, দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের তথ্যাদি দেন। ইতিপূর্বে তাঁরাও এসব অঞ্চল থেকে প্রস্তরায়ুধাদি সংগ্রহ করেছিলেন। কালিদাসবাবু হরিনারায়ণপুর ও অন্যকয়েকটি স্থানের ভূ-গর্ভ থেকে প্রস্তর যুগের মনুষ্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদির অনুরূপ অনেক প্রস্তর ও হাড়ের অস্ত্রাদি পেয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে ট্র্যাপ পাথরের ছেদনাস্ত্র, বালি পাথরের হাতুড়ি, মুষল এবং হাড়ের বিভিন্ন প্রকারের কোঁড় ও তুরপুন রয়েছে। এরপরও তিনি আরও অনেক প্রস্তর, হাড় ও মাটির দ্রব্যাদি পেয়েছেন সেগুলির সঙ্গে অন্যত্রপ্রাপ্ত নব্যপ্রস্তর যুগ ও তাম্রযুগের দ্রব্যের আকারগত সাদৃশ রয়েছে। তিনি বলেছেন 'ঐগুলি দেখলে বোধ হয় যে ঐ সকল যুগে নিম্নবঙ্গের এই অংশে মনুষ্য বসবাস ছিল।'

নিওলিথিক যুগের বেশ কিছু পটারী পাওয়া গেছে দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর, সাগরদ্বীপ, এবং পাথরপ্রতিমার গোবর্দ্ধনপুর, বৃজি, খড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে; এছাড়া তিলপী, অম্বুলিঙ্গ - ছত্রভোগ অঞ্চলে। আটঘরা প্রভৃতি অঞ্চলে Redware, Black & Red ware এবং N.B.P ও পাওয়া গেছে। অর্থাৎ নিওলিথিক যুগ এবং তার ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে পরবর্তী যুগগুলি এসেছে। গোবর্দ্ধনপুর, আটঘরা, ছত্রভোগ, সাগর ও হরিনারায়ণপুরে লৌহ ও তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। বৃজি, খড়ি ও গোবর্দ্ধনপুরে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যগুলির বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সেখানে 'Hunting & Gathering প্রণালীর জীবন যাত্রার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। গোবর্দ্ধনপুরের প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত কয়েকঝুড়ি হাড় ও দাঁত পাওয়া গেছে। এগুলির বেশীরভাগই অর্দ্ধ–ফসিলীভূত। জলচর ও স্থলচর প্রাণীর অস্থি, দাঁত, কাঁটা এমনকি দীর্ঘজীবী সামুদ্রিক কাঁকড়ার ফসিলীভূত বড় বড় দাড়াও এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। জলচর কুমীর, হাঙর, কামট, শুশুক ইত্যাদির হাড়, দাঁত, কাঁটা, আঁশ, চোয়াল, শিরদাঁড়া, পাঁজর ইত্যাদি রয়েছে। পাঁজরের হাড় ও শক্ত কাঁটাগুলিকে শিকারের অস্ত্রহিসাবে, বঁড়শি হিসাবে এবং দৈনন্দিন নানা কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেলাই করার কাজে এবং কোঁড় হিসাবেও এগুলির ব্যবহার করা হত। মাংস চাঁচা বা টুকরো করার কাজেও এ রকম অস্ত্রগুলি কাজে লাগানো হত। বন্য প্রাণীদের মধ্যে বড় বুনো মহিষ, গণ্ডার, হস্তী, বাঘ, হরিণ ইত্যাদির হাড়, আঁশ ও দাঁত পাওয়া গেছে। বিশাল একটি দাঁতাল বুনো হাতির মাথার খুলি সমেত দুটি দাঁতের প্রায় অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। একটি Bovit বা বুনোমহিষ জাতীয় প্রাণীর অস্থি (শিরদাঁড়ার হাড়ের) উর্দ্ধাংশ ভেঙে তার মজ্জা খাওয়া হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে তার ভাঙা অংশ দেখে এবং সেখানে মজ্জা নেই দেখে।

আদিম মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য সবকটি অবস্থার সুযোগ এখানে ছিল। জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন 'জল' ছিল এখানকার নদীতে; যে নদীটি স্থানীয়ভাবে নিকটস্থ বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। সভ্যতার আদিবাসভূমি তাই নদী। প্রবাহিত নদীশাখাটি (জগদ্দল) গঙ্গার একটি শাখা। পলিমাটি গঠিত নদীতীরকে (Open Air) বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করত। বনভূমি এবং বৃক্ষশাখাকেও বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করত। নদী, সমুদ্র ও গভীর বনজঙ্গল শিকার তথা Hunting Gathering জীবনকে পরিপুষ্ট করত খাদ্যে পানীয়ে। মাছের ও বন্য পশুর কাঁটা ও হাড় ছাড়াও পাওয়া গেছে প্রচুর প্রস্তর খণ্ডের নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র। ফসিলীভূত অস্থি ও এই সব প্রস্তরখণ্ড যে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে তারা কাজে লাগাত তাও ব্যবহারের চিহ্ন রেখে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। হরিণের শিংগুলিকে যে কাজে লাগান হত তার চিহ্ন রয়েছে। পরবর্তী ও সমসাময়িক কালের জীবনধারার চিহ্নও বর্তমান। লৌহাস্ত্র, কৃষিকার্য এবং কৃষি যন্ত্রপাতি, আগুনের ব্যবহার, পশুপালন এবং শস্য উৎপাদনের সব চিহ্নই বর্তমান। অর্থাৎ নিওলিথিক যুগের জীবন যাত্রার প্রাথমিক চিহ্নগুলি বর্তমান। কেননা কৃষি এবং কৃষিজীবন, শিকার জীবনের পরপরই আসতে থাকে। এই অংশে একই সঙ্গে গৃহপালিত পশুর অস্থি ইত্যাদি রয়েছে। আস্তে আস্তে গোবর্দ্ধনপুরের সভ্যতা গঙ্গারিডি সভ্যতার যুগে এসে পৌঁছায় এবং আরও পরবর্তী কালের গুপ্তযুগ পর্যন্ত এই সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটে। নিওলিথিক যুগ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত নানা ধরনের পটারী, হাতে তৈরী পুতুল, হাতে টেপা পাত্র, জলরাখার মৃৎপাত্র বা ভাঁড় ও অন্যান্য জিনিস গোবর্দ্ধনপুরে পাওয়া গেছে। যে সব বন্য পশুর দাঁত ইত্যাদিকে চিহ্নিত করা গেছে এবং সেগুলি এখনো ফসিলীভূত সম্পূর্ণভাবে হয়নি সেগুলির বয়স অন্তত আট থেকে এগার হাজার বছর বলে জানা গেছে (লেখকের 'দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল' নামক গ্রন্থ এবং 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্মৃত অধ্যায়' 'গ্রন্থের' 'প্রস্তর যুগের অঙিনায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক চব্বিশপরগনা' প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে 'হরিনারায়ণ পুর থেকে' একাধিক মসৃণ পাথরের কুঠার ও হাতুড়ী পাওয়া গেছে' যেগুলি তাম্রলিপ্ত ও নাটশালে পাওয়া প্রায় তিনহাজার বছর পূর্বেকার কুঠারের সমকালীন। নব্যপ্রস্তর যুগের এইসব উপকরণ সমুদ্রগামী জলযানে ঐ সব স্থান থেকে বা দক্ষিণ ভারত থেকে আসতে পারে। দেউলপোতা প্রভৃতি অঞ্চলে এ সব অস্ত্র তৈরী হত বলে অনেকের ধারণা। আবার সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা থেকে পাওয়া গেছে ছোট্ট ধারালো কালো পাথরের তৈরী ব্লেড বা চাঁচক (বাটালীর মত), প্রস্তর কুঠার (ধীরেন্দ্রনাথ দাসের প্রবন্ধ), তাম্র-লৌহাস্ত্র, হরিহরপুর (বারুইপুর থানা) থেকে পরেশ দাশগুপ্ত সংগ্রহ করেছিলেন প্রস্তরযুগের কয়েকটি অস্ত্র, হাতকুঠার, চপার, ছুরি ইত্যাদি। বর্তমান প্রবন্ধকারও নিকটস্থ গোবিন্দপুরের হেঁদো পুকুরের পাড় থেকে সংগ্রহ করেছেন একটি কালো ব্যাসাল্ট পাথরের ত্রিকোণ (বৃহত্তর দিক) ধারাল একটি ছেদক এবং নুড়ি পাথরের ব্যবহৃত কয়েকটি অস্ত্র। ঐ পুকুরের নিকটস্থ কয়েকটি বাড়ীতে প্যাস্টেল, পেবকশিল, নোড়া ইত্যাদি উদ্ধার করে রাখা আছে। আটঘরা থেকে সুদীন দে যে বালি পাথরের নোড়াটি পেয়েছিলেন সেটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চারকোণে পাথর বাঁধা জাল, মাটির বিড়স্, নেট Sinker

ইত্যাদিও পাওয়া গেছে। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় এরকম অনেকগুলি প্রস্তরায়ুধের কথা বলেছে। এ-সব থেকে প্রমাণিত হয় যে আদিম যুগের মানুষ, অন্ততপক্ষে নিওলিথিক যুগের মানুষ এখানে সাময়িক ভাবে হলেও বসবাস করত।

কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিওলজি বিভাগের প্রাক্তন এবং বর্তমান অধ্যাপকগণ, মিউজিওলজির অধ্যাপক ও প্রধানগণ, এবং স্টেট আর্কিওলজির অনেকেই এই মতের বিরোধী। তাঁদের লিখিত বক্তব্যে এবং বর্তমান প্রবন্ধকারের সঙ্গে আলোচনায় একথা জানিয়েছেন। তাঁদের মূল কথা হল এই প্রস্তরায়ুধগুলি কোন বৈজ্ঞানিক উৎখনন পদ্ধতির মাধ্যমে আসেনি। মাননীয় ডঃ গোস্বামী, ডঃ অতুলচন্দ্র ভৌমিক, প্রকাশ মাইতি এবং অন্যান্যরা মনে করেন এই প্রস্তরায়ুধগুলি রাজমহল পাহাড় বা অন্যকোন অংশ থেকে নদীর স্রোতে ভেসে এসেছে। ডঃ দত্ত দেউল পোতার প্রস্তরায়ুধগুলিকে নিওলিথিক যুগের বলে মনে করেন — কিন্তু কিভাবে এগুলি এখানে এল এই ব্যাপারটি এক অজ্ঞাত রহস্যময় ব্যাপার বলেই তিনি মনে করেন (বেহালা মিউজিয়ামে আলোচনা - ২০০২, মার্চ)। মাননীয় ডঃ অতুলচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংখ্যায় (চৈত্র ১৪০৬ বঙ্গাব্দ) এ বিষয়ে একটি স্ববিরোধী প্রবন্ধে (পৃঃ ৬১ - ৬৬) জানাচ্ছেন যে 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মূল্যবান কিছু প্রস্তারায়ুধ ডায়মণ্ডহারবারের কাছে দেউলপোতা ও হরিনারায়ণপুর থেকে মূলত পাওয়া গেছে। তাছাড়া সাগরদ্বীপে বামনখালি মন্দিরতলা, কাকদ্বীপে পাকুড়তলা ও মনিরতট থেকে আরও কয়েকটি হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে এরূপ উল্লেখ আছে। এসব প্রত্নস্থল থেকে ক্ষুদ্রায়ুধ, তারশঙ্ক, সেল্ট, নোড়া, জালকাঠি এবং তামা ও আংশিক অঙ্গারীভূত কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব প্রত্ন নিচয় এই জেলাকে বর্ণচ্ছটায় গৌরবময় করে তুলেছে; আর দিয়েছে কিছু দুর্লভ সম্মান।" পৃঃ ৬৪-র এই শেষ বাক্যটির অর্থ পরিষ্কার নয়। প্রত্ন সম্পদগুলি কেন জেলাকে বর্ণচ্ছটায় গৌরবময় করে তুলেছে — আর দুর্লভ সম্মানই বা কিভাবে এনে দিয়েছে তার কারণ এবং ব্যাখ্যা কি? একই লেখায় তিনি বলেছেন কালিদাস দত্তকে অনুসরণ করে রাজ্য "প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা পরেশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় দেউলপোতায় অতি প্রাচীন অধিবসতির প্রমাণ পান। ...... এতদঞ্চলে যে সব প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে তা প্রাচীন সভ্যতার এক নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত দেয়"। পরেশ দাশগুপ্ত যখন এ জেলার এই সব নিদর্শনকে পরিষ্কার ভাবে প্রাগৈতিহাসিক বলেছেন — তখনো কারো কারো সন্দেহ রয়েছে অথবা প্রচলিত থিয়োরীর বাইরে গিয়ে যা বলতে চান তা বলতে পারেন নি। তাই তিনি ফিরে গেছেন তাঁদের পুরানো কথায় "ভূপৃষ্ঠে পাওয়া এসব আয়ুধ মূলত নদী স্রোতে আনীত হয়েছে এরূপ মনে করা সঙ্গত", পৃঃ ৬৪। তিনি আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন : এ জেলায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের আবাস স্থলের উপযোগী পাহাড়িয়া অঞ্চলের হদিস এখনো পাওয়া যায়নি, পাথর বা উপাদানের অভাব এবং মাত্র দেউলপোতা থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত কয়েকটি নদীতীরবর্তী স্থানে অল্প কিছু হাতিয়ার পাওয়া গেছে।

অর্থাৎ তিনি হয়ত গোবর্দ্ধনপুর, আটঘরা বারুইপুর প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে মেদিনীপুরের প্রস্তর সংস্কৃতির খবর জানেন না। প্রস্তরখণ্ড নানা ভাবে সংগৃহীত হতে পারে। আর পাথরের

তৈরী অস্ত্র রাজমহল বা তাম্রলিপ্ত থেকে আঁকা - বাঁকা নদী স্রোতে গোবর্দ্ধনপুর, বারুইপুর বা সাগর প্রভৃতি স্থানে পৌঁছাতে পারে কেমন করে তার ব্যাখ্যা নেই। আর ভেসে এসে (পাথর – তুলো নয়!) শুধু দু-একটা জায়গায় ঠেক খেল – অন্যত্র নদীর ঘাটে ঘাটে বাঁকে বাঁকে পাওয়া গেল না কেন। মনে রাখা দরকার প্রত্ন-নিদর্শনাদি সব সময় প্রচুর পাওয়া যায় না। একটা পেলেও তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

এবার বলি বাসভূমির কথা। আমরা এই জেলার উল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে প্রস্তর সভ্যতার বিকাশের কথা বলিনি, নবাশ্মীয় ও মধ্যাশ্মীয় আদিম মানুষদের সাময়িক ও অস্থায়ী বাসভূমি র কথা বলেছি। সম্ভবত এরা জলপথে নদীধরে বা সমুদ্রধরে দক্ষিণ পূর্ব ভারতীয় উপকূল ধরে দক্ষিণ বা দক্ষিণ পশ্চিম থেকে এসেছিল। নদীধরে বিহার বা মেদিনীপুরের সুবর্ণরেখা নদী ধরে ঐসব অঞ্চল থেকে খাদ্যের অন্বেষণে এসেছিল। জঙ্গলে, গাছের ডালে, নদীতীরে লতাপাতার বেষ্টনী ও চাল তৈরী করে এখানে অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করত। শীত গ্রীষ্মে বাস করে আবার বর্ষার প্রারম্ভে ফিরে যেত তাদের মূল পাহাড়ী আবাসে। সম্প্রতি Centre for Archaeological Studies & Training থেকে প্রকাশিত একটি ইংরাজী গ্রন্থেও ঠিক এ-কথাই বলা হয়েছে। অস্থায়ী আবাসগুলি ঝড়জল বন্যায় নষ্ট হয়ে যেত। পরের বছর আবার তারা এসে তৈরী করত। প্রস্তর হাতিয়ার আর কিছু উপকরণ তারা সঙ্গে আনত। গাছপালা, জীবজন্তুর হাড়, নদীবাহিত উপলখণ্ড নতুন নতুন অস্ত্রের যোগান দিত। তৎকালীন মানুষ পাথর ছাড়াও পরিবেশ এবং প্রকৃতি অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করত এবং কঠোর সংগ্রাম করে বাঁচতে চাইত। এই প্রেক্ষাপটে সারা জেলার যে কটা অস্ত্রপাওয়া গেছে তা বোধ হয় যথেষ্টেরও বেশী।

প্রকাশচন্দ্র মাইতি ('পশ্চিমবঙ্গ' চৈত্র ১৪০৬)পুরা প্রস্তর যুগ, মধ্যাশ্মীয় যুগ এবং নিওলিথিক বা নবাশ্মীয় যুগকে যথাক্রমে খৃষ্টপূর্ব আনুমাঃ ১,৫০,০০০; ৫০,০০০ এবং ১০,০০০ বছর আগে বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতবাদ উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ চব্বিশপরগনা থেকে যে প্রস্তরায়ুধ নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে তার মধ্যে বেশ কিছুকে তিনি মধ্যাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের বলেছেন। তিনি তমলুক ও নাটশালে পাওয়া অনুরূপ প্রস্তরায়ুধগুলির সমসাময়িক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ননিদর্শনগুলির যা শুধুমাত্র রাজ্য সংগ্রহশালায় রয়েছে – তার একটি সংখ্যাতত্ত্ব দিয়েছেন; দেউলপোতার ১১৫৪ টি প্রস্তর নিদর্শন – আনুমানিক মধ্যাশ্মীয় যুগের (মতান্তর আছে) অর্থাৎ এগুলি খৃঃ পূঃ পঞ্চাশ হাজার বছর (?) পূর্বেকার। সময়সীমা এবং সংখ্যাটি খুব কম কি।

হরিনারায়ণপুর, সাগর, আটঘরা, বারুইপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কালিদাস দত্তের সংগ্রহ, পরেশ দাশগুপ্তের সংগ্রহ, দেবপ্রসাদ ঘোষের সংগ্রহ এবং ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বা অন্যদের প্রস্তরায়ুধের সংগ্রহ কত তার হিসাব কিন্তু দেওয়া হয়নি। গোবর্দ্ধনপুরের সংগ্রহের কথা তো তাঁরা জানেনই না।

কার্ত্তসনের মতবাদ উল্লেখ করে প্রকাশবাবু প্রশ্ন করেছেন এই জেলার ভূ-ভাগের বয়স ৫০০০ বছর; আর তার ফলে এখানে প্রস্তর যুগের বিকাশ কি করে সম্ভব হবে (পৃঃ ৫৮ ঐ,)। এখানকার সভ্যতার বিকাশ খৃঃ পূঃ ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগে নয় (ঐ, পৃঃ ৬০)। আমরা নিজেরা

কিছু না বলে তাঁর ঐ লেখার ৫৮ পৃষ্ঠা থেকে তুলে দিই। "সুন্দরবনের অস্তিত্ব কতদিনের এবং এখানকার প্রধান প্রধান গাছগুলির আবির্ভাবের সময়কাল কবে" নিজের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছেন : "বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জৈবিক নমুনা সংগ্রহ করে কার্বন - ১৪ পরীক্ষার মাধ্যমে মোটামুটি খৃঃপূঃ ৭০০০ বছরের আভাস দিয়েছেন"। অর্থাৎ বর্তমানে গাছের বয়স নয় হাজার বছর।

ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ালো। ভূমির বয়স মাত্র পাঁচ হাজার বছর আর ভূমির উপর জন্মানো গাছের বয়স নয় হাজার বৎসর। তাহলে কোনটা ঠিক — ফার্গুসন, না C-14 Test ? আমরা বলি দুটোই ভুল — কেন না পদ্ধতিগত অনেক ত্রুটি এখানে থেকে গেছে। 'রাম না হতেই রামায়ণ' অথবা "বারোহাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির" মত অবাস্তব টেবিল ওয়ার্ক। আর সেজন্য প্রকাশবাবুরা বলতে পেরেছেন "এজেলায় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বিকাশ অসম্ভব"।

এই সব দেখেশুনে আমাদের এ-কথাই মনে হয়েছে যে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার প্রত্ন ইতিহাস উদ্ধারে এইসব প্রবন্ধকে গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল। অন্যদিকে IAR 1963 - 66 , পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের Exploring Bengal's Past গ্রন্থে দেউল পোতার প্রস্তরায়ুধগুলিকে Middle Stone Age — এর বলা হয়েছে। An Encyclopaedia of Indian Archaeology (1989) Ed. Dr. A. Ghosh গ্রন্থের (Vol - 2) ১২১ পৃষ্ঠায় দেউলপোতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "Middle Stone Age (Middle Palaeolithic) tools comprising unifacially worked subtriangular points, borers, side scrapers and hollow scrapers. An interested feature of the tools is their diminutive which may be due either to the size of the available chert nodules on which they are worked or to a special character of the Lower Ganga Middle Stone Age industries".... এর পরে মন্তব্য না করাইভাল। আর মাইতি মহাশয়রা বলেছেন যে, এখানকার সভ্যতার বিকাশ খৃঃ পূঃ ৫ম — ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগে নয়। আর ভূমির অস্তিত্ব খৃঃপূঃ ৯০০ বছরের আগে ছিল না।

খ) প্রত্নতত্ত্বের এক অধ্যাপকের মত :

এখানকার জনবসতি খৃষ্টীয় ২য় বা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর : উপরোক্ত আলোচনা ও এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শনগুলি ঐ অনুমানকে অমূলক প্রমাণিত করে। এ—বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই গঙ্গারিডি পত্রিকার একটি সংখ্যায় আলোচনা করে এপর্যন্ত প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শনগুলির নিরিখে এই অনুমান যে অমূলক তা বলেছি। তিনি বারুইপুর রবীন্দ্রভবনে ৭ — ৮ই ডিসেম্বর, ২০০২ আর একটি আলোচনায় বলেছেন যে এখানকার জনবসতি খৃঃ পূঃ ২য় অব্দে। অর্থাৎ কয়েকদিনের ব্যবধানে চারশ' বছর পিছিয়ে গেল এবং তাও কি বিজ্ঞান ভিত্তিক।

সম্প্রতি সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালার (বারুইপুর) রজতজয়ন্তী (২৭-২৯শে নভেম্বর, ২০০৩) বর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকায় এক প্রবন্ধে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধের অধ্যাপক মহাশয় একটি বিস্তৃত ভূ-তাত্ত্বিক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে প্রায় হরিনারায়ণপুর পর্যন্ত অঞ্চল (সংশ্লিষ্ট মানচিত্র দ্রষ্টব্য) পর্যন্ত ভূ-প্রকৃতির গঠন Calcutta Formation এর অন্তর্ভুক্ত, যার আনুমানিক বয়স Late Holocene বা ৩৫০০ - ৫০০০ বছর (BP) পর্যন্ত এবং যেখানে

Early Historic যুগের প্রত্নস্থল থাকতে পারে। হরিনারায়ণপুর থেকে সাগরদ্বীপের মুখ পর্যন্ত (ডেম্পেয়ার-হেজেস্ লাইন বরাবর ?) কয়েকটি অঞ্চলে Medieval Site কিছু থাকতে পারে। সমগ্র সাগরদ্বীপ এবং আরো দক্ষিণের নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের যেমন গরানবোস, নেতীধোপানী, ভরতগড়, বিরিঝিবাড়ী, খাড়িছত্রভোগ-মণিঅববাহিকা, কঙ্কণদীঘি, জটা, মইপীঠ, বনশ্যামনগর, গোবর্দ্ধনপুর, উত্তরসুরেন্দ্রগঞ্জ, রাক্ষসখালি, দাসপুর প্রভৃতি বিস্তৃত অঞ্চল কোন প্রকার প্রত্নস্থলের আওতার আসতে পারে না, তার কারণ এ-অঞ্চলের ভূ-ভাগের গঠন যা সুন্দরবন ফরমেশান নামক একটি (মনগড়া ?) ভূমিগঠনের আওতায় আসে যাঁর বয়স আনুমানিক ২৯০০ ± ৪০ বছর (BP)। অবশ্য এরমধ্যে মন্দিরতলা বা কাকদ্বীপের পাকুড়তলায় (?) সম্ভবত দু-একটি Medieval Site এর চিহ্ন ঐ মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। জানি না এই দু-একটি 'নতুন পলিসমতল' অঞ্চলকে কেমন করে মধ্যযুগীয় সভ্যতার চিহ্নযুক্ত অঞ্চল বলে দেখানো হল, কেননা এইগুলি ভূমিও তো ঐ সূত্রানুসারে খৃষ্টপূর্ব মাত্র নয়শত বৎসর আগে জন্মেছে। আর ভূমি গজালে জলা জঙ্গল অঞ্চলে তো সভ্যতার বিকাশ ঘটে না।

এবার মূল কথায় আসা যাক। শ্রদ্ধেয় নিসন্দেহে একজন প্রত্নবিশেষজ্ঞ। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় প্রাপ্ত এগার-বারো শত প্রস্তর কুঠার নানা প্রকার প্রস্তরায়ুধ এবং অস্থি আয়ুধ গুলিকে তারা প্রস্তরযুগের বিশেষত নবাশ্মীয় ও মধ্যাশ্মীয় যুগের বলে স্বীকার করেন; কিন্তু এঅঞ্চলে এগুলির অস্তিত্ব কেন তার কোন ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন না। আমরাও জানি প্রশ্নটি খুবই কঠিন, তাই এইসব পন্ডিত মানুষদেরই প্রয়োজন উন্নতর প্রত্নচর্চার মাধ্যমে তার উত্তর খুঁজে বের করা। দুখের বিষয় তিনি সেই চেষ্টা না করে একটা সহজ পদ্ধতিতে আমাদের চোখের সামনে জাজ্বল্যমান ঐ এগার-বারো শত প্রস্তর ও অস্থি আয়ুধগুলিকে নস্যাৎ করে আমাদের ভুল ভাঙতে চেয়েছেন। ভূ-তাত্ত্বিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সুন্দরবন অঞ্চল খৃঃপূঃ নয়শত বছরের প্রাচীন, তাই এখানে প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সম্ভবনা নেই। এবিষয়ে তিনি Ghosh and Majumdar, 1991 এবং Chakraborty, 1987 এর সাহায্য নিয়েছেন। আমরা জানি প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনায় ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এমনকি ইতিহাস পুরাণ এবং লোককথারও প্রয়োজন হয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে সমুদ্রতত্ত্ব, নদীতত্ত্ব, পরাগারেণুতত্ত্ব এবং ম্যানগ্রোভতত্ত্বেরও প্রয়োজন হতে পারে। সে যাই হোক, ভূ-তাত্ত্বিক ঐ থিওরি দিয়ে কি প্রত্নবস্তুগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে ? অথবা ঐ প্রত্নবস্তুগুলিকে কি খৃঃপূঃ দু-তিনশ বছরের বলা যাবে ? তাছাড়া যে দুই জন লেখকের সাক্ষ্য তিনি মেনেছেন সেই ঘোষ-মজুমদার এবং চক্রবর্তী মহাশয়েদের গ্রন্থগুলির নামধাম জানাননি। আমরা সেই নামধাম গুলি জানতে পারলে সুবিধা হত। বোড়াল, আটঘরা, হরিনারায়ণপুর দেউলপোতা, সাগরদ্বীপ, রাক্ষসখালি, তিলপী, গোবর্দ্ধণপুর, নেতিধোপানি, বিরিঝিবাড়ী, ভরতগড় প্রভৃতি অঞ্চলের কি কি নমুনা তাঁরা সংগ্রহ করেছেন এবং এসব অঞ্চলের মাটির কতফুটগভীরতা পর্যন্ত তাঁদের সমীক্ষার আওতায় এসেছে জানা যেত। GSI দক্ষিণ চব্বিশপরগনার উপর এজাতীয় কোন কাজ করেছে বলে জানা নেই। অপরদিকে আমরা Zoological Survey of India এবং Geological Survey of India কে সাক্ষ্য মানতে চাই যে সম্প্রতি সাতজেলিয়ায় পাওয়া গণ্ডারের অস্থি ফসিল,

গোবর্দ্ধনপুরে পাওয়া হরিণ, হস্তী, গণ্ডার ইত্যাদি জীবজন্তুর হাড়, দাঁত, শিং ইত্যাদি (য বা অর্দ্ধফসিলীভূত) গুলির প্রকৃত বয়স কত তা যেন তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানান। আমরা যতখানি জেনেছি তাতে বলা হয়েছে যে এগুলির বয়স এগার হাজার বৎসরের মধ্যে। আরও বলি গোবর্দ্ধনপুরের প্রত্নস্থানটির ২৫ ফুট নীচে অবস্থিত পাথরের মত কালো শক্তমাটিরও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। মাটির বয়স নির্ণয় করা শক্ত কাজ নয় — সেটুকু অন্ততঃ করা হোক। অস্থি দন্তাদি পরীক্ষা ও চিহ্নিত করণও শক্ত কাজ নয় — সরকারীভাবে সেটুকু তো করা যায়। আর সব চেয়ে বড় কাজ যেটি প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে সবাই করতে পারেন তাহল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অথবা ASI কে দিয়ে ঐ পরোক্ত স্থানের প্রত্নস্থল গুলির যেকোন একটিতে (বিশেষ করে সাগরের মন্দিরতলা, পাথরপ্রতিমার গোবর্দ্ধনপুর, জয়নগরের তিলপী, কুলপীর হরিনারায়ণপুর, বারুইপুরের আটঘরা ইত্যাদিতে পূর্ণাঙ্গ একটি বৈজ্ঞানিক প্রত্ন-উৎখনন করুন — তাহলে নিম্নতনস্তরে চন্দ্রকেতুগড়ের চেয়ে বেশী কিছু পাওয়া যায় কিনা হাতে কলমে প্রমাণ হবে — আমাদেরও অনাবশ্যক অন্য কথা বলতে হবে না, জানতে পারব কোন এককালে ব্যবহৃত নবাশ্মীয় বা মধ্যাশ্মীয় যুগের মানুষের হাতিয়ার এখানে কেন পাওয়া গেছে।

আর একটা কথা বলার আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে 'মাঝে মাঝে কিছু হাড়ের অস্ত্র বা কুঠার অথবা কখনো কখনো নব্য প্রস্তর হাতকুঠার এর আবিষ্কার তাঁদের ('এই অঞ্চলে কর্মরত কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক যাঁরা কিছু ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন এবং বিশ্বাস করেন চব্বিশপরগনা জেলাতেও প্রাচীন প্রস্তর ও নব্য প্রস্তর যুগীয় নিদর্শন থাকা সম্ভব') ধারণাকে আরও শক্তিশালী করে।" না, আমরা ভ্রান্ত ধারণাকে এমনি এমনি বিশ্বাস করি না। দেখা যাচ্ছে আপনারাই বলছেন এই প্রস্তরায়ুধগুলি নবাশ্মীয় বা মধ্যাশ্মীয় যুগের — আমরাও তাই-ই বলি। (এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী প্যারাগুলিতে এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে)। তাই অস্ত্রশস্ত্রগুলির অস্তিত্বইতো ঐ সময়কার প্রত্ননিদর্শন, আর সেকারণেই ঐ নিদর্শনগুলিকে ঐসব যুগের সভ্যতার প্রত্ন-নিদর্শনইতো বলব — তাতে আমাদের ধারণায় ভ্রান্তি কোথায়। প্রস্তর যুগের সভ্যতার উদ্ভব বা বিকাশ ঘটেছিল এ-দাবী আমরা করিনা — যদিও একথাটা আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের দাবী বলে দেখানো হয়েছে। আমরা আপানাদের কথাই বলি যে হুগলী সরস্বতীর (ভাগীরথীর নয়) পশ্চিমতীরে প্রস্তর যুগীয় সভ্যতা বিরাজ করত বলে আপনারা যা প্রমাণ করতে চান তাতে আমরা একমত। আর ঐ একই প্রকার হাত কুঠার ও অন্যান্য-একই প্রকার প্রস্তরায়ুধ দেউলপোতা, মন্দিরতলা, হরিনারায়ণপুর, গোবর্দ্ধনপুরে পাওয়া যাচ্ছে; সেকারণেই আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এখানে সে কালের মানুষের অবির্ভাব ঘটেছিল। আমরা বলতে চাই একটা নদী পেরিয়ে (নদীর পশ্চিম তীর থেকে) পূর্বতীর বরাবর আসা অবশ্যই সম্ভব (পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত)। তাই বলি এপারে এসে উপরোক্ত স্থানগুলিতে বর্ষা বাদে অন্য সময়ে সাময়িকভাবে হলেও তারা বাস করত (Seasonal) । বর্ষায় চলে যেত মূল বাসভূমে। শুধুতাই নয় বারুইপুরের নিকট দক্ষিণ গোবিন্দপুরে এবং হরিহরপুরে (আটঘরার কথা বাদ দিলাম) এরূপ প্রস্তরায়ুধ পাওয়া গেছে। মাদ্রাজে একটিমাত্র এরূপ প্রস্তর হাতকুঠার প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে প্রস্তরযুগের সভ্যতার তথ্য মেলে; আমাদের এখানে সে উদ্যোগ কই। সে কারণে আমরা মনে করি এপারো বারোশত ঐরূপ প্রত্নবস্তু

যেখানে পাওয়া গেছে সে নিদর্শনগুলি কেন যথেষ্ঠ নয়, কেনই বা তা অকিঞ্চিৎকর বলে বিবেচিত হবে। খনন কার্য এবং পর্যবেক্ষণই যেখানে হয়নি সেখানে এই প্রত্ন-নিদর্শনগুলিই তো আমাদের প্রাথমিক সূত্র।

আর চন্দ্রকেতুগড়ের নিম্নতন স্তরে প্রস্তরযুগের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে বলে ঐপ্রবন্ধে যে অনুমান করা হয়েছে তা কি বিজ্ঞান ভিত্তিক। চন্দ্রকেতুগড়ে হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, গোবর্দ্ধনপুর, মন্দিরতলা বা বারুইপুরের মত প্রস্তর প্রত্ন নিদর্শন তো পাওয়াই যায়নি, আর তার নিম্নতম স্তরও খোঁড়া হয়নি, তাহলে 'চন্দ্রকেতুগড়ে প্রস্তরযুগের নিদর্শন পাওয়া যাবে' এই আগাম অবৈজ্ঞানিক ভবিষ্যতবাণী কিভাবে একজন প্রত্নবিজ্ঞানী আলোচ্য প্রবন্ধে করলেন তা বোঝা যায় না। তিলপীতে প্রাথমিকভাবে যেসব প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে তা চন্দ্রকেতুগড়ের মতই সমৃদ্ধ, এমনকি তার চেয়ে প্রাচীনতর এবং উন্নততর নিদর্শন রয়েছে। পাকুড়তলা এবং মন্দিরতলা খুবই সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। এসব কথা নতুন নয় — কলকাতার প্রাক্তন এবং বর্তমান প্রত্নবিদ এবং ইতিহাসবিদ্‌গণ তা জ্ঞাত আছেন — তবুও ও পর্যন্ত সত্যকার কোন কাজ হয়নি এবং বৈজ্ঞানিক উৎখননও হয়নি। এইসব কারণেই বলছি ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব দিয়ে আমাদের ভুল ভাণ্ডাবার নামে প্রত্নবস্তু গুলির অস্তিত্বকে নস্যাৎ করা যাবে না; বরং ব্যাপক ও উন্নততর প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চা, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং বৈজ্ঞানিক প্রত্নউৎখননই একমাত্র পারে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলির ব্যাখ্যা করতে এবং একমাত্র প্রত্নতত্ত্ব দিয়েই তা সম্ভব; আর এই বিচার বিবেচনায় অবশ্যই ভূ-তাত্ত্বিক, নৃ-তাত্ত্বিক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের সাহায্য ও পরিবেশগত সাহায্য দরকার হবে। খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত নেগেটিভ মন্তব্য কোন কাজের কথা নয়। আমরা আবার বলছি মাননীয় Chakraborty বা অন্যজন কৃত (1987) ভূ-স্তর এর C-14 Test এর Samplling এবং আনুষঙ্গিক তথ্যে হয়ত অনেক ফাঁক আছে — আমরা তাঁদের গ্রন্থের নাম পেলে, এবিষয়ে সঠিক কথা বলতে পারব। এবিষয়ে মাননীয় প্রকাশ মাইতি এবং মাননীয় অতুলচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়দ্বয়ের প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এখানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে প্রস্তরযুগের বা তাম্র-প্রস্তর যুগের মানুষের সাময়িক ও পরিযায়ী অভিবাসন — মূলবাসভূমি থেকে অন্যত্র ঘটতে পারে এবং সে-সময় তারা তাদের সঙ্গে করে ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলি অবশ্যই আনতে পারে। সাময়িক আবাসগুলি প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হতে পারে, কিন্তু ফেলে যাওয়া প্রস্তর ও অস্থি হাতিয়ারগুলি পরবর্তী যুগে কোন ভাবে আবিষ্কৃত হয়ে তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে — তবে সময়ের হেরফের নিশ্চয় আছে। এ-বিষয়ে Archaeology of Eastern India — Sengupta & Panja, 2002 (CAST) গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

গ) গঙ্গারিডি সভ্যতা ঃ

ঋগ্বেদীয় যুগ থেকে দক্ষিণ উপকূলবর্তী এই অঞ্চলটির অস্তিত্ব রয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যকে এ অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে কিছুটা পরোক্ষে । নদী গঙ্গার পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গে তার মোহনার সভ্যতার কথা জানা হতে থাকে। গোমুখ হিমবাহ থেকে হিমবাহ বা হিমালয় পর্বত ভেদ করে একটি নদী ছিল এই দেশের সাগর পর্যন্ত। হিমালয় — হরিদ্বার - শিবক্ষেত্র। নদী গঙ্গার উৎপত্তি শিবের জটা থেকে - গঙ্গা পবিত্র নদী — এসব কল্পনা মানুষের মনে এসেছিল আর্য সমাগমে। Aborigin মানুষেরা তার আগেই এখানে এসেছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। কালক্রমে

কপিলমুনির সময় থেকেই আর্যবসতি। এখন গঙ্গার এই মোহনা অঞ্চল পাতাল বা রসাতল নামে খ্যাত। রামায়ণে সেকথা বলা হল। মহাভারতের যুগে গঙ্গা-মোহনায় পুন্ড্ররাজ বাসুদেব কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করলেন এবং সাগর সঙ্গমে যুধিষ্ঠিরের পুণ্যস্নান এবং রাজসূয় যজ্ঞের সময় ভীমসেন কর্তৃক সমুদ্রতীরবর্তী এই অঞ্চলের রাজাদের বশীভূত করার কথা মহাভারতে পাই। এরপর মেগাস্থিনিসের লেখায় গঙ্গারিডিদের কথা আসে। টলেমি, প্লিনী, ডিওডোরাস, পেরিপ্লাস গ্রন্থকারদের লেখায় গঙ্গারিডি, গঙ্গা এবং গঙ্গাবন্দর ও রাজধানীর কথা পাই। গঙ্গারিডি এক সুসভ্য যোদ্ধা জাতির রাজ্য ছিল – তারা তৎকালীন প্রাসীর সৈন্যদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেবার জন্য তৈরী হয়ে গঙ্গানদীর পরপারে অপেক্ষা করছিল – সেকথা শুনে আলেকজাণ্ডার আর বিপাশা নদী অতিক্রম করে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হননি। গ্রীক ও রোমান কবি সাহিত্যিকরা এই গঙ্গারিডি যোদ্ধাদের অনেক কাহিনী লিখে গেছেন। খৃঃপূঃ ৪র্থ থেকে খৃষ্টীয় ২য়–৩য় শতক পর্যন্ত গঙ্গারিডি সভ্যতার কথা জানা যায় (এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'গঙ্গারিডি, আলোচনা ও পর্যালোচনা' – নরোত্তম হালদার, দ্রষ্টব্য)।

শেষ কয়েকটি কথা ঃ

উদ্ধারীকৃত প্রস্তরায়ুধগুলি উৎখনিত প্রত্নস্থল থেকে পাওয়া না যাওয়ার ফলে প্রথাগত প্রত্নতত্ত্ব শিক্ষকদের কাছে প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ হয় এই বলে যে এই প্রত্নহাতিয়ার গুলির প্রাপ্তি স্থলের Context কি! কিন্তু এইভাবে এড়িয়ে না গিয়ে অন্তত Context এর কথাটা বাদ দিয়েও করণীয় কিছু আছে। ব্যাপারটা যখন Burning Question এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এরূপ Context হীন প্রত্নায়ুধ টেরাকোটা পুতুল, পটারী, মুদ্রা, প্রস্তরাভাস্কর্য নিয়ে নিদর্শনগত বা আকৃতিগত সাদৃশ্য নিয়ে তুলনা মূলক আলোচনা করেন বা Dating করার চেষ্টা করেন প্রস্তারায়ুধের ক্ষেত্রেও তো তা করা যায়। আকৃতিগত, ব্যবহারগত, প্রয়োজনগত, তৎকালীন অভ্যাসগত, প্রস্তরের প্রাপ্তিস্থানগত, শিল্প কারীগরী গত এবং প্রস্তরের প্রকারও প্রকৃতিগত তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। তাহলে আর 'ভাসমান - শিলার' মত হাস্যকর ব্যাখ্যার অবতারণা করতে হয় না – আমরাও বুঝি সত্যিকারের কিছু প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু দুঃখের কথা সে আগ্রহ এবং ধৈর্য কারো নেই। সত্যকে জানতে চান না তাঁরা। সত্যকে অস্বীকার করতেই ব্যস্ত।

জানিনা, আরও কতদিন সত্যকে এড়িয়ে তাঁরা বিতর্কের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চাইবেন। অথচ আশ্চর্যের কথা পৃথিবীর প্রায় সব সংগ্রহশালায় এইসব Context বিহীন প্রত্নবস্তু রাখা হয়। এগুলিকে তো তাহলে রাখারও দরকার নেই এমনকি সংগ্রহ করারও দরকার নেই। আমার তো মনে হয় আজকের যুগে ঐ বস্তাপচা পুরানো ধারণাটাকেই পাল্টানো একান্তভাবে দরকার।

সেকারণেই বলব, প্রত্নসম্পদ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিই যে এঅঞ্চলের প্রত্নসম্পদ রক্ষা তথা ইতিহাসের উপাদান রক্ষার একমাত্র উপায়, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রত্নসম্পদ রক্ষার উপায় নিয়েও সবার কাছে 'সচেতনতা' আশা করছি।

— ০ —

আসন্ন প্রকাশ – 'জোনাকী' / পাথরপ্রতিমা

গ্রন্থপঞ্জী ও প্রবন্ধাদি

বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) – নীহার রঞ্জন রায়
বাঙলাদেশের ইতিহাস ১ম খণ্ড – রমেশচন্দ্র মজুমদার
বাঙ্গলার ইতিহাস – রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন – অতুল সুর
ভারতবর্ষের ইতিহাস – রোমিলা থাপার
ভারতবর্ষের ইতিহাস – আন্তোনভা, বোনগার্দলেভিন, কতোভস্কি
দি পেরিপ্লাস অফ্ দি ইরিথ্রিয়ান সী – অনুঃ সুবিদ চট্টোপাধ্যায়
প্রাচীন ভারত – সুকুমারী ভট্টাচার্য
যশোহর খুলনার ইতিহাস – সতীশচন্দ্র মিত্র
প্রাচীন ভারত – অনুবাদঃ যোগিন্দ্রনাথ সমাদ্দার
সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও তার সমস্যা – অতুল সুর
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাবলী – রাজ্যপুস্তক পর্ষদ
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী – রাজ্যপুস্তক পর্ষদ
ইতিহাস অনুসন্ধান–বিভিন্ন সংখ্যা – পঃবঃ ইতিহাস সংসদ
প্রত্নতত্ত্বে বিজ্ঞানের প্রয়োগ – অমলেন্দু ব্যানার্জী
পূজাপার্বণের উৎস কথা – পল্লব সেনগুপ্ত
বাঘ ও সংস্কৃতি – সম্পাঃ সনৎকুমার মিত্র
লোককথা – দিব্যজ্যোতি মজুমদার
অতীতের হাতছানি – এম.এ. জব্বার
বালান্দা চন্দ্রকেতু ইতিকথা – দিলীপকুমার মৈতে
পুরাবৃত্ত – রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ
হিন্দুদের দেবদেবী – হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
ঋগ্বেদ – অনুঃ রমেশচন্দ্র দত্ত
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র – অনুঃ রাধা গোবিন্দ বসাক
পঞ্চোপাসনা – জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পালপূর্বযুগের বংশানুচরিত – দীনেশচন্দ্র সরকার
পালসেন যুগের বংশানুচরিত – দীনেশচন্দ্র সরকার
শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ – দীনেশচন্দ্র সরকার
নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল ও প্রত্ন উৎখনন – সুধীন দে
প্রাচীন মুদ্রা – রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলার ভাস্কর্য – কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য – নীহার ঘোষ
প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী – কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত
উচ্চশিল্প বনাম লোকশিল্প – ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বাংলার মন্দির শিল্প – অসীম মুখোপাধ্যায়
প্রাগৈতিহাসিক বাংলা – পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
২৪ পঃ প্রত্নতাত্ত্বিক সম্মেলন, বারুইপুর ১৯৮৩ স্মরণিকা – সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা, বারুইপুর
গঙ্গারিডি ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ – নরোত্তম হালদার
দক্ষিণ চব্বিশপরগনার অতীত (১ম ও ২য় খণ্ড) – কালিদাস দত্ত, সম্পাঃ ভট্টাচার্য ও মজুমদার
কলকাতার পুরাকথা – সম্পাদক, দেবাশিষ বসু
বঙ্গ, বাঙ্গলা ও ভারত – ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
অরণ্যছায়ার দুর্গে – পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
সাংখ্য পরিচয় – হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
বঙ্গভূমিকা – সুকুমার সেন
দঃ২৪ পঃ আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ – কৃষ্ণকালী মণ্ডল
দঃ২৪ পঃ বিস্মৃত অধ্যায় – কৃষ্ণকালী মণ্ডল
দঃ ২৪ পঃ লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তি ভাবনা – কৃষ্ণকালী মণ্ডল
দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল – কৃষ্ণকালী মণ্ডল
চব্বিশ পরগণা প্রত্ন-ইতিহাস সম্মেলন - ২০০২,বারুইপুর – সম্পাদনা, কৃষ্ণকালী মণ্ডল
স্থানিক ইতিহাস – সোনারপুর মহাবিদ্যালয়
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শৈবতীর্থ – ধূর্জটি নস্কর
দঃ ২৪ পঃ কথ্যভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ – বিমলেন্দু হালদার

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি — বিনয় ঘোষ
গঙ্গা পথের ইতিকথা — অশোক কুমার বসু
পশ্চিমবঙ্গ ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংখ্যা ১৪০৬. — পঃবঃ তথ্য দপ্তর
বৃহৎ বঙ্গ — দীনেশ চন্দ্র সেন
কলকাতার সেকাল ও একাল — হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
উঃ, দঃ ২৪ পঃ ও সুন্দরবন — কমল চৌধুরী
বৃহৎ তন্ত্রসার — বসুমতী
মহিষাসুর মর্দিনী দুর্গা — স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
বেহালা জনপদের ইতিহাস — সুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আদিগঙ্গা প্রত্ন পরিক্রমা — নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
আদিগঙ্গার তীরে — প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী
মদনপালা — সম্পাদনা, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী
সেবায়তন ও ভারত সভ্যতা — শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মহিষাসুর মর্দিনীর সন্ধানে (শারদীয় দেশ, ১৯৮৩) — ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য — ....

Development of Hindu Iconography -- J.N. Banerjee
Elements of Hindu Iconography -- G.N. Rao
Indian Buddhist Iconography -- B.T. Bhattacharjee
Jain Iconography -- B.C. Bhattacharjee
The Sakti Cult & Tara -- Ed. D.C. Sarkar
The Inscriptions of Bengal -- III -- N.G. Majumdar
Corpus of Bengal Inscriptions -- Mukherjee & Maity
Lothal -- A.S.I
Statistical A/c of Bengal - 24 Pgs. -- W.W. Hunter
Bengal District Gazetters -24 Pgs. -- S.S.O Malley
24 Pgs. Dist Gazetters -- W.B Govt.
Terracottas from Tamralipta -- P.K. Mondal
South Asian Studies -- Chakraborty Etc.
Coins -- P.L. Gupta
The Rock Shelters of Patina -- A. Banerjee
Pratna Samiksha 1--8 -- Archaeology Dept, W.B.
Archaeology of Eastern India -- Sengupta & Panja
The Bengal Temples -- B.K. Dutta
Encyclopedia of Indian Archaeology -- A. Ghosh
Epigraphia Indica. Difft. Vols. -- ASI
I.A.R -- difft. vols. -- 1956 - 1967 -- ASI
Indian palaeography -- A.H Dani
Temples of Midnapur -- G Santra
Chandraketugarh -- Enamul Haque
Talamana or Iconometry -- ASI
Survival of the prehistoric Civilisation of the Indus valley -- ASI
Variety of the Vishnu Image -- ASI
The Classical Age -- Ed. R.C. Majumdar
Archaeology of Coastal Bengal -- G. Sengupta
NBPW - A Typical Marker of Maurya Cultural Expansion -- Asok Dutta
Introduction to Indian Art -- B.K. Dutta
A Town in the Rural Melieu - Baruipur, WB (01-02) -- ASI
Late Mediaeval Temples of Bengal -- David J. MC Cutchion
Early Terracottas. -- WB Archaeology Deptt.
East Indian Bronzes -- Ed. S.K. Mitra
Asoka D.R. Bhandarkar